উপন্যাস

তৃতীয় পুরুষ

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচিপত্র

ভূমিকা........2
প্রথম পরিচ্ছেদ........4
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ........14
তৃতীয় পরিচ্ছেদ........25
চতুর্থ পরিচ্ছেদ........41
পঞ্চম পরিচ্ছেদ........59
যষ্ঠ পরিচ্ছেদ........74
সপ্তম পরিচ্ছেদ........93
অষ্টম পরিচ্ছেদ........121
নবম পরিচ্ছেদ........145
দশম পরিচ্ছেদ........159
একাদশ পরিচ্ছেদ........168
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ........182
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ........192
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ........214
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ........235
ষোড়শ পরিচ্ছেদ........254
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ........268
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ........286
উনবিংশ পরিচ্ছেদ........301
বিংশ পরিচ্ছেদ........318
একবিংশ পরিচ্ছেদ........348
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ........362
ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ........373
চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ........382
পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ........394

www.bengaliebook.com

ভূমিকা

কাজল-এর প্রথম পর্ব প্রকাশিত হয়েছিল উনিশশো সত্তর-এর জুলাই মাসে। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি। শুরু করেছিলাম আরো অনেক আগে, যখন একাদশ শ্রেণীর ছাত্র। ত্রিশ কী বত্রিশ পাতা লিখে ফেলে রেখেছিলাম। এম.এ. পড়বার সময় সাহিত্যিক মনোজ বসুর প্রেরণায় গরমের ছুটিতে মাত্র দু মাসে লেখাঁটি শেষ করি।

তারপর সাতাশ বছর কেটেছে। এই দীর্ঘ আড়াই দশকেরও বেশি সময়ে অনেক চিঠি পেয়েছি, সভা-সমিতিতে বহু মানুষ জিজ্ঞাসা করেছেন–তারপরে কাজলের কী হল? সে কি ফিরে গেল নিশ্চিন্দিপুরে? কী পেশা গ্রহণ করল সে? কে কে তার জীবনে এল এবং গেল?

এসব প্রশ্নের উত্তর দেবার একটা দায় অনুভব করেছি। তাই কাজলের এ দ্বিতীয় পর্ব। আমার জীবন, আমার উপলব্ধির প্রতিফলন কাজল। আমার বর্তমান বয়েস পর্যন্ত কাজলকে এনে বই শেষ করলাম। এর পরে কী হবে তা তো আর আমি জানি না।

প্রথম পর্বের ভূমিকা মা লিখেছিলেন। অনেক পাঠক বলেন ভূমিকাটি না কি মূল উপন্যাসের চেয়েও ভালো হয়েছিল। মা নেই, চলে গিয়েছেন গতবছর। আমার লেখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কি বইটি পড়লেন? কেমন লাগল তার?

এই পর্বও সাধুভাষায় লিখলাম। ভাল কি মন্দ করলাম জানি না, কিন্তু চলিত বাংলায় লিখলে পূর্বের তিনটি উপন্যাসের সঙ্গে মেজাজের মিল হত না। দীর্ঘ ছ বছর লাগল এই বই লিখতে। শুরু করবার পর এসে গিয়েছিল বিভূতিভূষণ জন্মশতবর্ষ। প্রায় তিনবছর কিছুই লিখিনি।

www.bengaliebook.com

গল্প জমাবার প্রলোভনে লুব্ধ হইনি, প্রকৃত জীবনকে মর্যাদা দিয়েছি। তবে লেখক লেখেন বটে, কিন্তু গ্রন্থ আসলে পাঠকদের। শেষ বিচারও তাদেরই।

কৃতজ্ঞতা মিত্র ও ঘোষ-এর সবার প্রতি। তাঁরা আজীবন আমার ওপর স্নেহবর্ষণের প্রতিশ্রুতিতে আরব্ধ।

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

www.bengaliebook.com

প্রথম পরিচ্ছেদ

হেমন্তের পড়ন্ত হলুদ রৌদ্র বেলা যাইবার সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব মায়াময় হইয়া উঠিলে চিরকালের অভ্যাসমতো কাজল একটা খাতা বা বই হাতে বাহির হইয়া পড়ে। জীবনে এমন কিছু শিক্ষা আছে যাহা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুমহাশয়রা দান করিতে পারেন না, অথচ যাহার উপর নির্ভর করিয়াই মানুষের জীবন আবর্তিত হয়। প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য হইতে কাজল সেই একান্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করিতেছিল। সদ্যোজাত শিশুকে যেমন মাতৃস্তন্য পান করিবার কৌশল শিখাইয়া দিতে হয় না, আপন ক্ষুধার তাড়নায় এবং সহজাত প্রবৃত্তিবশত সে নিজেই জীবনদায়িনী পীযুষধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়—তেমনি কাজলের হৃদয়ের একেবারে গভীরে যে বিপুল ক্ষুধা জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহারই নিবারণের জন্য সে ব্যগ্র দুই হাতে প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে বাঁচিবার উপাদান সংগ্রহ করিয়া লইতেছিল।

তার সহজাত প্রবৃত্তির দিকটা আসিয়াছিল বাবার কাছ হইতে। বাহিরে যতই আলো থাক, বন্ধ ঘরে সে আলো প্রবেশ করে না। বাবা তাহার মনের জানালাগুলি নিজের হাতে খুলিয়া দিয়া গিয়াছে।

বয়েস বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কাজল লক্ষ করিল অশৈশব লালিত সহজ বিশ্বাসগুলি একে একে বিদায় লইতেছে। দেবমূর্তি দেখিলে অভ্যাসবশত এখনও দুই হাত প্রণামের ভঙ্গিতে কপালের দিকে ওঠে বটে, কিন্তু তাহার সহিত বিশ্বাস ও প্রাণের যোগ থাকে না। মানুষের সারল্য এবং ভালো দিকের ওপর যে গভীর আস্থা ছিল, দুনিয়ার রকমসকম দেখিয়া তাহাও অনেকখানি ক্ষয় পাইয়াছে। বস্তুত এখন তাহার মনে হয় পৃথিবীর বেশির ভাগ লোক জীবনের গূঢ় রহস্য জানিবার জন্য বা সততার পরীক্ষা দিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া বসিয়া নাই, তাহারা বাঁচিয়া আছে জীবনযাপনের বেলায় মোটারকম

লাভ করিয়া সুখে কাল কাটাইবার জন্য। কেহ অন্যরকম কিছু করিলে তাহারা অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকে।

প্রকৃতির অনাদ্যন্ত প্রসারের মধ্যে এই হীনতা নাই। সেখানে সব কিছুই বড়ো মাপের। আকাঙ্ক্ষা, বিস্ময়, আনন্দ এবং বেদনা যত বড়ো মাপেরই হোক, প্রকৃতির বিস্তারের ভিতব তাহা বেশ খাপ খাইয়া যায়। বোধহয় এই কারণেই তীব্র হর্ষ বা বেদনার মুহূর্তে মানুষ উধ্বমুখে আকাশের অসীমতার দিকে তাকায়। বোধহয় এইজন্যই কাজল জীবনের গঢ় প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজিবার জন্য বই হাতে মাঠের দিকে চলিয়া যাইবার অভাস করিয়াছিল।

কিছুই তুচ্ছ নয়, কিছুই ফেলিয়া দিবার মতো নয়। গ্রামের পথে চলিয়া যাইতে যাইতে বাশঝাড়ের পাশে কুড়াইয়া পাওয়া একটা পাখির পালক—তাই যেন কী অমূল্য সম্পদ। বহুদিন পরে পুরানো ডায়েরির পাতার ভাজ হইতে অকস্মাৎ বাহির হইয়া পালকটা মনোরাজ্যে কী ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত করে। কবেকার বিস্মৃত প্রথম যৌবনের আনন্দমাখা দিনের স্পর্শ এখনও উহার গায়ে লাগিয়া আছে। কী হইয়াছিল সেদিন? কেমন করিয়া সুর্য উঠিয়াছিল? দক্ষিণ হইতে বহিয়া আসা সুরভিত বাতাস কোন্ স্বপ্নরাজ্যের সন্ধান দিয়াছিল?

সমস্তটা মনে পড়ে না। পাখিটাও মরিয়া গিয়াছে হয়তো কবেই। তবু ফেলিয়া দেওয়া যায় না। রেলওয়ে স্টেশনের সামনে হইতে পরবর্তী মহকুমা শহরের দিকে যে পাকা সড়ক চলিয়া গিয়াছে তাহা ধরিয়া মাইলখানেক হটিলেই পথের দুইধারে ছোট ছোট সুন্দর গ্রাম পড়িতে থাকে। রঙ্গপুর, সাইবনা-ভারি মিষ্টি নাম গ্রামগুলির। এই সড়ক ধরিয়া মাইল তিনেক যাইবার পর বাঁদিকে নামিয়া গেলে একটা বিশাল বিলের প্রান্তে রাস্তা শেষ হইয়া যায়। গতবৎসর বসন্তকালে আমের বউল দেখিবার জন্য বাহির হইয়া কাজল জায়গাটা আবিষ্কার করিয়াছে। সেই প্রথম দিনটার কথা সে কখনও ভুলিবে না। পাকা

www.bengaliebook.com

সড়ক হইতে নামিয়া প্রথমে চাষিদের কয়েকটি বাড়ি-খড়ের চাল, গোবর দিয়া উঠান নিকানো। শালিক চড়ইয়ের দল মাটিতে ছড়ানো শস্যের দানা খুঁটিয়া খাইতেছে। উঠানের প্রান্তে মাচার উপর শসা, কুমড়া বা লাউয়ের লতা বাড়িয়া উঠিয়াছে। বাতাসে রৌদ্রদগ্ধ মাটির গন্ধ। সব মিলাইয়া চারদিকে কেমন একটা শান্তির ছবি। বাড়ি কয়খানা ছাড়াইলেই একটা বেশ বড়ো আমবাগান। সবগুলি গাছেই অসম্ভব বউল আসিয়াছে, পাতা দেখা যায় না। আশ্চর্য গভীর সুবাসে বসন্ত-অপরাহের বাতাস মদির হইয়া আছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের লাইনস রিট ইন আর্লি সামার মনে পড়াইয়া দেয়। কবিরা ঠিকই বলেন, এইরূপ গন্ধে মাতাল হইয়া মৌমাছিরা ফুলের উপর ঘুমাইয়া পড়িতে পারে বটে।

ওই বসন্তের রৌদ্র, ওই প্রস্ফুটিত আম্রমুকুলের সৌরভ আরও যেন কত কী কথা মনে আনিয়া দিয়াছিল। কবেকার হারাইয়া যাওয়া হাসিকান্না এবং জীবনযাপনের ইতিহাস–এই জন্মের কয়েকটা বৎসর মাত্র নয়, অতীত ও বর্তমানের সীমারেখার ঊর্ধ্বে কোন নিত্য আনন্দের রাজ্যে যে শাশ্বত জীবনপ্রবাহ চিরবহমান, সেদিনের আমের বউলের মাদকতাময় গন্ধ সেই দৈবী জীবনের স্পর্শ এক খণ্ডমুহূর্তের জন্য বহন করিয়া আনিয়াছিল।

তার পর হইতে কাজল মাঝে মাঝে এখানে বেড়াইতে আসে। নির্জন স্থান আরও আছে, কিন্তু দিগন্তপ্রসারী বিলের ধারে পিটুলি ফলের গাছের নিচে তাহার প্রিয় জায়গাটিতে বসিলেই চোখে কে যেন স্বপ্নের তুলি বুলাইয়া দেয়। অন্য স্থানে সহসা এমন হয় না। জায়গাটার গুণ আছে মানিতেই হইবে।

বিলের ধারে পৌঁছাইতে বৈকাল সাড়ে তিনটা বাজি গেল। এ বৎসর প্রায় কালীপূজা পর্যন্ত বেশ ভালোরকম বৃষ্টি হইয়াছে। ফলে অন্যান্য বৎসবেব মতো হেমন্তের শেষে বিল শুকাইয়া যায় নাই, এখানে-ওখানে জল বাধিয়া আছে। পিটুলি গাছের তলায় যেখানে সে বসে তাহার কাছেই হাঁটুসমান জল ও কাদার মধ্যে দাঁড়াইয়া একটা লোক লম্বামতো অর্ধমগ্ন কী জিনিস লইয়া

www.bengaliebook.com

ভযানক ধস্তাধস্তি করিতেছে। ব্যাপার কী দেখিবার জন্য কাজল তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

রহস্যময় প্রচেষ্টায় সাময়িক ক্ষান্তি দিয়া লোকটা সোজা হইয়া কোমরে জড়ানো গামছা খুলিয়া কপালের ঘাম মুছিতে লাগিল। কাজল বলিল—কী করছ্ছা ভাই? ওটা কি জলের মধ্যে?

লোকটা মুখ তুলিয়া কাজলকে দেখিল—এবং কিছুমাল বিস্মিত হইল না। কাজল কে, কোথা হইতে আসিয়া এই মাঠের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে, সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র ঔৎসুক্য প্রকাশ না করিয়া এমন সহজ স্বরে কথা বলিতে আরম্ভ করিল যে, শুনিলে মনে হইতে পারে গত একঘণ্টা ধরিয়া সে কাজলের সহিত তাহার সমস্যার বিষয়ে গভীর আলোচনা করিতেছে।

–আর বলেন কেন দাদাবাবু! রোজই তো সাবধান করি, করি না? তবু এমন বজ্জাতি করলে ঠাণ্ডা মানুষের মাথায় রক্ত ওঠে কিনা আপনিই বলেন? বলি, পয়সা দিয়া কেনা জিনিস তো-নাকি মাগনার? আপনার কাছে আর মিথ্যে বলি কেন, গণেশ ছুতোর,এখনও তিন গণ্ডা টাকা পাবে এর দরুন। পইপই করে বারণ করি রোজ, রোজ তবু সেই একই কাণ্ড!

কাজল মাথা চুলকাইয়া বলিল—কিন্তু জলের মধ্যে ওটা কী?

-নৌকো দাদাবাবু, নৌকো। বিলের ভেতর মাছ ধরে যাঁ দু-পয়সা পাই তাতে কষ্টেস্রেষ্টে সংসার চলে, আর গরমেন্টের রাস্তার ধারে নতুন গাঁয়ের ছেলেগুলো রোজ করবে কি, নৌকোখানা ডুবিয়ে রেখে যাবে! একবার ধরতে পারলে ঠেঙিয়ে বেন্দাবন দেখিয়ে দেব

কোমরে গামছা জড়াইয়া লোকটা আবার কিছুক্ষণের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় জলমগ্ন নৌকাটি সোজা করিয়া ভাসাইয়া তুলিল। জিনিসটাকে নৌকা বলিলেও চলে, ডিঙি বলিলেও মিথ্যা বলা হয় না। পাড়ে রাখা হোট হাতজাল, দুই-তিনটা মেটে কলসী আর একখানা দাঁড় গুছাইয়া লইয়া লোকটা নৌকায় গিয়া উঠিল। দাঁড়ের ধাক্কায় সে পাড় হইতে দূরে সরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় কাজল বলিল–আমি উঠব তোমার নৌকোয়? নেবে আমায়?

লোকটার শরীরে কৌতূহল বলিয়া জিনিস নাই। কাজল কে, কেনই বা সে নৌকায় সঙ্গী হইতে চাহিতেছে এসব কালক্ষেপকারী অকারণ প্রশ্ন না তুলিয়া সে সহজ গলায় বলিল–উঠবেন? উঠে পড়ুন তাহলে-

-উলটে যাবে না তো?

গণেশ ছুতাবের তৈয়ারি এই অপূর্ব শিল্পকীর্তি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করাতে লোকটা কিঞ্চিৎ চটিয়া গেল। বলিল–ডুবে যাবে জানলে কী উঠতে বলতাম?

আর বাক্যব্যয় না করিয়া কাজল সন্তর্পণে নৌকায় উঠিয়া পড়িল। নৌকা বিপজ্জনকভাবে দুইদিকে কয়েকবার দুলিয়া আবার সমান হইল বটে, কিন্তু কাজল দেখিল গৌরবার্থে নৌকা বলিয়া প্রচারিত এই সংকীর্ণ ডিঙিতে দাঁড়াইয়া থাকা সম্ভব নয়। সে সাবধানে উবু হইয়া বসিয়া দুইদিকের কানার কাঠ চাপিয়া ধরিল। লোকটা তাহা দেখিয়া বলিল–কী, ভয় করছে বুঝি?

কাজল হাসিয়া বলিল–না, ভয় করবে কেন? তবে অভ্যেস নেই তো, দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না!

তারপর জলের দিকে তাকাইয়া বলিল—অবশ্য পড়ে গেলেই বা কী? এখানে জল বোধহয় এক কোমরও হবে না, তাই না? আমি শীতকালে এসে শুকনো মাঠ দেখে গিয়েছি।

—জল কম, কিন্তু কাদা বেশি। পড়লে থকথকে কাদায় গেঁথে যাবে বুক অবধি। তাছাড়া এ বিল বড়ো খারাপ জায়গা, এখানে জলের নিচে কালামনিষ আছে—

কাজল অবাক হইয়া বলিল-কালামনিষ আবার কী?

-তা জানিনে। তাকে তো কেউ দেখতে পায় না। কেবল জলে পড়ে গেলে, কিংবা নৌকো থেকে পা ঝুলিয়ে বসলে কালামনিষ সাঁই করে জলের নিচে টেনে নেয়।

কাজল বলিল-বিলের এটুকু জল তো আর ক-দিনের মধ্যেই শুকিয়ে যাবে, তখন কালামনিষকে দেখতে পাওয়া যাবে না?

লোকটা একবার চোখে কাজলের দিকে তাকাইল, তারপর বলিল—না, জল শুকোনোর আগেই কালামনিষ মাটির তলায় চলে যায়। একবচ্ছর মাটির নিচে ঘুমোবার পর নতুন বর্ষার জল পেলেই তার ঘুম ভাঙে। সেজন্য প্রথম বর্ষার সময়টা বড্ড খারাপ দাদাবাবু কালামনিষের পেটে তখন দারুণ খিদে, বছরভোর খায়নি কিনা। নির্জন বিলের মধ্যে একা পেলেই হল, সে মানুষকে আর ফিরতে হচ্ছে না।

-তোমার পরিচিত কাউকে কখনও কালামনিষ ধরেনি?

—ধরেনি আবার! এই তো তিনবছর আগেকার কথা, আষাঢ়ের শেষ, বুঝলেন? চার-পাঁচদিন ধরে উপুরঝান্ত বিষ্টি হচ্ছে, দুপুরবেলা মেঘে সন্ধের মতো অন্ধকার। আর কী বাজ পড়া! গড়ম গুড়ম আওয়াজে কানে তালা লেগে যায়!

শোঁ শো করে ভেজা বাতাস বইছে সারাদিন। এর মধ্যে দুপুরে কাঁচালঙ্কা আর পেঁয়াজ দিয়ে পান্তাভাত খেয়ে আমাদের গ্রামের নবীন হালদারের ছেলে হারাধন খ্যাপলা জাল আর পোলো নিয়ে বিলে গেল মাছ ধরতে। তার ঠাকুরমা বারণ করেছিল-হারু, এই দুজোগে বেরুস না মানিক আমার! তা দাদাবাবু, হারাধনকে তখন কালে ধরেছে, সে ভালো কথা কানে তুলবে কেন? তারপর দুপুর যায়, বিকেল যায়, হারাধন আর ফেরে না। তার ঠাকুরমা কান্নাকাটি শুরু করাতে গ্রামের লোকজন দল বেঁধে খুঁজতে বেরিয়ে বিলের ওপারে হারাধনের দেহ দেখতে পায়। কাদাজলের ভেতর মুখ-গুজড়ে পড়ে ছিল, পোলোটা পাশে পড়ে, কিন্তু খ্যাপলা জালখানা আর পাওয়া যায়নি।

–বেঁচে ছিল?

-না দাদাবাবু, মরে কাঠ। শরীলে কোনো দাগ নেই, ঘা নেই-শুধু এমনি এমনি প্রাণটা বেরিয়ে গিয়েছে–

কাজল বলিল–সাপেও তো কামড়ে থাকতে পারে?

-সাপে কামড়ালে শরীলে তার দাগ থাকবে তো? তাছাড়া সাপে কাটলে মানুষ সঙ্গে সঙ্গে মরে যায় না। তেমন হলে গামছার বাঁধন দিয়ে বাড়ি পৌঁছে যেত হারাধন।

শরীরটা যখন খায় না, তাহলে খামোকা কালামনিষ মানুষ ধরে কেন? তার পেটই বা ভরে কীভাবে?

লোকটা দাঁড় টানা বন্ধ করিয়া বলিল–কালামনিষ মাংস খায় না, রক্ত খায়। হারাধনের দেহটা ফ্যাকাসে মেরে গিয়েছিল।

বেলাশেষের আকাশ দিগন্ত প্রসারী বিলের ওপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। বহুদূরে একটি গ্রামের সীমারেখা দেখা যায়। প্রান্তরের উপর আসন্ন সন্ধ্যায় হাল্কা কুয়াশা জমা হইতেছে। কোথা হইতে একটা পাখি ডাকিয়া উঠিল—ট্রি-টি-ট্রি-

হারাধন সম্ভবত বজ্রাহত হইয়া মারা পড়িয়াছিল, ঝড়বৃষ্টির সময় খোলা মাঠে জলের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিলে যা হয়। কিন্তু এই সরল মানুষটিকে বিজ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়াইয়া লাভ নাই। ইহার সরল জীবনযাত্রা, সামান্য দুই-একটা অপ্রাকৃতে বিশ্বাস ইহার জীবনকে সরস ও অর্থপূর্ণ করিয়াছে। যুগান্তের চর্চায় সঞ্চিত সেই জীবনদৃষ্টিকে আধুনিক বিজ্ঞানের আঘাতে ধ্বংস করিয়া তাহার বদলে কোন্ নতুন মূল্যবোধ সে ইহার হাতে তুলিয়া দিবে? না, কালামনিষই ভালো!

মুখে বিশ্বাস, ভয় এবং সম্ভ্রম একসঙ্গে ফুটাইবার চেষ্টা করিতে করিতে কাজল বলিল—সত্যি, এ ঘটনা শোনবার পরে আর অবিশ্বাস থাকে না বটে। তুমি অনেক কিছু দেখেছে, না? আমি মাঝে মাঝে এসে তোমার গল্প শুনে যাব।

প্রাজ্ঞতার অভিমানে লোকটি একখানা বিড়ি ধরাইল।

বিলের প্রায় অপর প্রান্তে জল শেষ হইয়া চাষের ক্ষেত শুরু হইয়াছে। সংকীর্ণ একটি নালা দিয়া বিলের জল বাহির হইয়া চাষের জমিতে পড়িবার ব্যবস্থা করা আছে। নালার মুখে বেতের একটি বাক্সমতো বসানো, জল তাহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। লোকটি জলের মধ্যে হাত দিয়া ঘোট আর মাঝারি আকারের কয়েকটি মাছ সেই বাক্সের ভিতর হইতে বাহির করিয়া মেটে কলসীতে পুরিল।

আবার এপারে ফেরা। বিলের ধারে ধারে অগভীর জলকাদার মধ্যে লম্বা লম্বা ঘাস জন্মাইয়াছে। অনেক দূরে মাঠের উপর দিয়া সাদারঙের কয়েকটা গরু

www.bengaliebook.com

সন্ধ্যার আভাস পাইয়া বাড়ির দিকে ফিরিতেছে। জলের উপর দাঁড়ের ছপছপ শব্দ। পশ্চিম আকাশে মেঘের স্তূপে যেন অগ্নিকাণ্ডের প্রতিচ্ছবি পড়িয়াছে। কাজলের মনে হইল—When barred clouds bloom the soft-dying day এখানে সময়ের আলাদা কোন মূল্য নাই, মহাকাল এখানে মানুষের নির্মিত মানযন্ত্র দ্বারা কৃত্রিমভাবে খণ্ডিত নয়। আকাশের নিচে শুইয়া থাকা এই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে, এই বিলের প্রসারে, দূরের ওই আরছা-দেখিতে-পাওয়া গ্রামে দ্রুতগতিতে ধাবমান কাল লেনও প্রভাব ফেলিতে পারে নাই। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া শান্তভাবে দিন আসে যায়, বিলের ধারে জলজ ঘাসের সারি বাড়িয়া ওঠে—আবার ঋতুর অন্তে শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়িয়া যায়। নদী দিপরিবর্তন করে, উদ্ধত রাজচক্রবর্তীর বিজয়স্বপ্ন শরতের মেঘের মতো কোথাও কিছুমাত্র চিহ্ন না রাখিয়া মিলাইয়া যায়কেবল সরল, পরিশ্রমশীল সাধারণ মানুষের কালজয়ী জীবনপ্রবাহ সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করিয়া শাশ্বতধারায় বহিতে থাকে। সাক্ষী থাকে কেবল আকাশের নক্ষত্রেরা।

বিলের এপারে আসিয়া নামিতে নামিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। কাজল জিজ্ঞাসা করিল--তোমার নাম কী ভাই? সেটাই তো জানা হল না—

লোকটি বলিল—আমার নাম কানাই। কানাই জেলে বললে, এখানে সবাই চিনবে।

-আমি কিন্তু সময় পেলেই আসব তোমার কাছে। গল্প শুনব।

কানাই জেলে গল্প বলিতে পারে বটে, কিন্তু ব্যক্তিগত সংলাপ খুব বেশিক্ষণ চালাইবার ব্যাপারে তাহার পারদর্শিতা নাই। সে সংক্ষেপে বলিল—আসবেন।

কাজল পেছন ফিরিয়া কয়েক পা চলিয়া আসিয়াছে, কানাই জেলে পিছন হইতে ডাকিল দাদাবাবু, ও দাদাবাবু!

কাজল তাকাইয়া দেখিল কানাই কী একটা হাতে লইয়া তাহার দিকে আগাইয়া আসিতেছে। সে বলিল—কী হয়েছে কানাই? কিছু বলবে?

তাহার হাতে কচুপাতায় জড়ানো একখানি আন্দাজ দেড়পোয়া ওজনের শালমাছ দিয়া কানাই বলিল-নিয়ে যান, রান্না করে খাবেন-

সরল মানুষটির আর কিছু নাই। প্রথম পরিচয়ের নিদর্শনস্বরুপ তাই সে তাহার সারাদিনের পরিশ্রমের কিছু অংশ কাজলকে দিল।

www.bengaliebook.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অপুর বইগুলি বিক্রি হইতেছে মন্দ না। সব বইয়ের একাধিক সংস্করণ হইয়া গিয়াছে, দু-একখানার তো পঞ্চম মুদ্রণ চলিতেছে। মোট বিক্রয়ের দিক হইতে দেখিলে অবশ্য এমন কিছু একটা হৈ-হৈ ব্যাপার নয়—কারণ বাজার-চলতি অনেক সস্তা নাটক-নভেল বা গোয়েন্দাকাহিনী ইহা অপেক্ষা বেশি বিক্রি হইয়া থাকে কিন্তু নতুন একজন লেখকের আত্মপ্রকাশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে এমন বাজার পাওয়া একটু অদ্ভুত ব্যাপার বইকি। পৃথিবীর মহৎ উপন্যাসগুলির পটভূমি কাজল পড়িয়া দেখিয়াছে—অজস্র প্রকাশক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইবার পর কোনও ক্ষুদ্র সংস্থা অনাদরে ছাপিয়াছে। লেখকের জীবদ্দশাতে হয়তো প্রথম সংস্করণই শেষ হয় নাই। পঞ্চাশ বৎসর পরে সেই বই লইয়া সবাব কী মাতামাতি। কিন্তু সমস্তটা যাহার সাধনার ফল, সেই লেখক ততদিনে দারিদ্র্যে ভুগিয়া অনাহারে কষ্ট পাইয়া মারা পড়িয়াছে। তখন আর তাহার স্মৃতিতে প্রতিবছর সভা করিলে বা রাস্তার মোড়ে একশত ফিট উচ্চ স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিলে সে বেচারার কী লাভ? কাজল হারম্যান মেলভিল-এর জীবনী পড়িয়া দেখিয়াছে, মেলভিলের ঠিক এরূপ হইয়াছিল। মবি ডিক মেলভিলের জীবৎকালে মাত্র তিন-চারশত কপি ক্রিয় হয়, চরম দারিদ্র্য এবং কষ্টের ভিতর লেখক মারা যান। সরকারের সৎকার সমিতি আসিয়া তার দেহ সমাধিস্থ করিবার ব্যবস্থা করে। অনেকদিন পরে যখন সবাই মবি ডিক-কে পৃথিবীর দশটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের মধ্যে অন্যতম বলিয়া মত দিল, প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ কপি বই বিক্রি হইতে লাগিল, তখন মেলভিলের সমাধিতে মালা দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া ভক্তেরা আবিষ্কার করিল—সমাধিটাই খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না! কবর দিবার সময়ে সরকারি লোকেরা তো আর ভাবে নাই যে, একদিন এই ভিখারিটা বিখ্যাত লোক হইবে! তাহারা মেলভিলের নামটা পর্যন্ত সমাধিস্তরে লিখিয়া রাখে নাই।

তুলনামূলক দিক দিয়া পাঠকেরা অপুর রচনাকে প্রথম হইতেই সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল। কৃত্রিমতার স্পর্শহীন সরল ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং জীবন ও বিশ্বের সহজ ভালোবাসার প্রকাশ সহৃদয় পাঠকদের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছিল। অপুর অকস্মাৎ মৃত্যু তাহাদের সহানুভূতিকে স্পর্শ করিল। রচনার স্বকীয় গুণ থাকা সত্ত্বেও যে মনোযোগ পাইতে একযুগ সময় লাগিত, মৃত্যুর প্রশান্ত মহিমা এক বৎসরের মধ্যেই বইগুলিকে সেই পরিচিতি দান করিল।

বইগুলি সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রয়োজনে কাজলকে মাঝে মাঝেই কলেজ স্ট্রীটে প্রকাশকদের কাছে যাইতে হয়। সেদিন বাবার বইয়ের নতুন এডিশন সম্বন্ধে কথাবার্তা বলিয়া কাজল প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিং-এ পুরাতন বইয়ের বাজারে বই দেখিতে গেল। বেশির ভাগই বাজে বই, কিন্তু ধৈর্য ধরিয়া খুজিতে পারিলে দু-একখানা ভালো বই বাহির হইয়া পড়ে। তবে সস্তায় সওদা করিবার উপায় নাই, দোকানীরা বিশেষ শিক্ষিত না হইলেও কোন বইয়ের কী দাম হইতে পারে তাহা বেশ ভালোই জানে।

একটা দোকানে এডগার ওয়ালেস এবং ওয়েস্টার্ন কিছু বইয়ের ফাঁকে কাজল জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটা বই দেখিতে পাইয়া টানিয়া বাহির করিল। বইখানা রবার্ট এস. বল্ নামে কোনও লেখকের রচিত। আঠারোশ নিরানব্বই সালে লন্ডনে ছাপা। এ বইয়ের এখন আর খুব মূল্য নাই, কারণ গত চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছরে বিজ্ঞানের জগতে কত নতুন তথ্য আসিয়াছে, কত বৈপ্লবিক পরিবর্তন জানা ছিল না, আরও কত কী ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত ছিল। তবু বইখানার প্রতি কাজল কেমন একটা আকর্ষণ অনুভব করিল। বৈজ্ঞানিক তথ্যের জন্য নহে, বইটির সহিত জড়িত রহস্যের বোধের জন্য। দোকানীকে জিজ্ঞাসা করিল—এটার দাম কত ভাই?

দোকানী অভিজ্ঞ ব্যক্তি, সম্ভবত কাজলের জন্মের আগে হইতে পুরাতন বই কেনাবেচা করিতেছে। সে কাজলের মুখের দিকে তাকাইয়া তাহার আগ্রহের

www.bengaliebook.com

পরিমাণ আন্দাজ করিবার চেষ্টা করিল, তারপর গম্ভীরভাবে বলিল–ওখানা দেড়টাকা-

কাজল একটু অবাক হইল। এ বিষয়ের উপর নতুন বই-ই তোত দু-টাকা আড়াই টাকায় পাওয়া যায়। লোকটা এমন সৃষ্টিছাড়া দাম হাঁকিতেছে কেন? সে বলিল–এত? বারো আনা দেব?

দোকানদার উদাস ভঙ্গিতে সংস্কৃত কলেজের দিকে তাকাইয়া দেশলাইয়ের কাঠি দিযা কান চুলকাইতে লাগিল।

কাজল ভয়ানক অপমানিত বোধ করিল। কিন্তু বইয়েব লোভ বড়ো লোভ, সে মুখে সপ্রতিভোর ভাব ফুটাইয়া বলিল–আচ্ছা, না হয় একটাকাই পুরো দিচ্ছি–

দোকানদার পৃথিবীর কোনো ভাষায় কথা বলিতে জানে না। বর্তমানে সে চোখ বুজিযা তর্জনী এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে কাঠিটাকে কানের ফুটায় কুকুর কব্যি ঘুবাইতেছে। তাহার মুখে জগৎনিরপেক্ষ স্বগীয় তন্ময়তা প্রকাশিত।

পাঁচসিকা দাম উঠিবার পর দোকানী আর দার্শনিক নিবাসক্তি বজায় রাখিতে সাহস পাইল না। বেশি টানাটানিতে দড়ি ছিড়িয়া গেলেই বিপদ। সবাইকেই সংসার চালাইতে হয়।

বিছানায় শুইয়া অনেক রাত্রি অবধি কাজল বইটা পড়িল। ধূমকেতু, নক্ষত্র এবং সৌরজগৎ সম্বন্ধে খুব মামুলি প্রাথমিক তথ্য–এখনকার ক্লাস সেভেন-এইটের ছেলেরাও এসব জানে। প্রথম প্রকাশিত হইবার সময় এই বইটাই লোকে হয়তো কত আগ্রহের সহিত পড়িয়াছে। কিন্তু লেখকের ভাষা এবং মানসিকতা কাজলের ভালো লাগিল। সহজ অথচ কাব্যিক প্রকাশভঙ্গির

মাধ্যমে পাঠককে ব্রহ্মাণ্ডের বিশালতার মুখোমুখি দাঁড় করানো হইয়াছে। তথ্যের সঠিকত্ব বড়ো কথা, তাহা অপেক্ষাও বড় কথা হৃদয়ের গভীরে সঠিক প্রশ্নগুলি জাগাইয়া ভোলা।

রাত দেড়টা পর্যন্ত পড়িবার পরও ঘুম আসিল না। একটা সিগারেট খাইলে বেশ হইত। কাজল বই রাখিয়া মশারির বাহিরে আসিয়া বুক-শেলফের পিছনের গোপন স্থান হইতে সিগারেট আর দেশলাই বাহির করিয়া ছাদে চলিয়া গেল। বাড়িতে সে সচরাচর সিগারেট খায় না, কিন্তু অসময়ের ভাণ্ডার হিসাবে বইয়ের তাকের পিছনে ধূমপানের সরঞ্জাম রাখা থাকে। মাঝে মাঝে কাজে লাগিয়া যায়। সিগারেট ধরাইয়া কাজল পাঁচিলে হেলান দিয়া দাঁড়াইল।

সুরপতি মারা যাইবার পর হৈমন্তী বাপের বাড়ির কাহে এই হোট একতলা বাড়িটা বানাইয়াহে। মা ও ছেলের অনাড়ম্বর সংসার চলিতেহে মন্দ নয়।

কালপুরুষ-মণ্ডলী পূব আকাশ বহিয়া অনেকদূর উঠিয়া আসিয়াছে। সমস্ত শহরের নিদ্রামগ্ন নৈশ প্রহরে অতিপরিচিত দৃশ্যেরও যেন অর্থ বদলাইয়া যায়। যে শহর আগামীকাল সকালেই আবার নিত্যদিনের বাঁধা কর্মসূচির মধ্যে জাগিয়া উঠিয়া ভয়ানক বেগে চলিতে থাকিবে, রাত্রির নির্জনতা তাহারই উপর রূপকথার স্পর্শ বুলাইয়া দিয়াছে।

পরিবেশে শীতের আমেজ থাকিলেও আকাশ বেশ পরিষ্কার, কুয়াশার চিহ্নমাত্র নাই। কাজল জানে আরহাওয়া ভালো থাকিলে আকাশের উত্তর-পশ্চিম কোণে আরছাভাবে অ্যান্ড্রোমিডা নীহারিকা দেখিতে পাওয়া যায়, যদিও তাহা বৎসরের এই সময়ে কিনা সে কথা সে মনে করিতে পারিল না। উত্তর-পশ্চিম কোণের সন্ধান করিতে করিতে একটু বাদে দিগন্তের কিছু উপরে হালকা একখণ্ড মেঘের মতো কী চোখে পড়িল। ওই কি অ্যান্ড্রোমিডা? বাইশ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত ছায়াপথের সর্বাপেক্ষা নিকটস্থ প্রতিবেশী? যদি

www.bengaliebook.com

তাহাই হয়, তাহা হইলে এই মুহূর্তে সে ওই নীহারিকা হইতে বিচ্ছুরিত যে আলো দেখিতেছে, বিশ লক্ষ বৎসর পূর্বে সে আলো অসীম মহাবিশ্বের পথে যাত্রা শুরু করিয়াছিল। পৃথিবীতে পিথেক্যানথুপাস অর্ধবানরেরা তখন সবেমাত্র দুই পায়ে সোজা হইয়া দাঁড়ানো অভ্যাস করিতেছে। যাবতীয় ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতিসহ সমগ্র মানবজাতিটাই সুদূর ভবিষ্যতের ক্রোড়ে শায়িত। তাহার পর দুই-তিনটা হিমযুগ গেল, কত সমুদ্র শুকাইয়া গেল, কত পর্বত মাথা তুলিয়া উঠিল। কত অরণ্য মাটি চাপা পড়িয়া কয়লায় পরিণত হইল, পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র কতবার দিকপরিবর্তন করিল- বিপুল কালব্যবধানে অবস্থিত এইসব উত্থানপতনের মধ্য দিয়া এই আলোকরশ্মি মহাকাশপথে বাইশ লক্ষ বছর ধরিয়া ক্রমাগত পৃথিবীর নিকটবর্তী হইতেছিল।

আশ্চর্য অনুভূতিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল। কী বিশাল এই গ্রহজগৎ, এই নাক্ষত্রিক বিশ্ব, এই জীবন। অর্থ ও প্রাচুর্যের প্রয়োজন নাই, সাধারণ গৃহস্থের মতো কেবলমাত্র বাঁচিয়া থাকাটাই একটা সুন্দর অভিজ্ঞতা। কিন্তু মন শক্ত করিতে হইবে, পৃথিবীর তাবৎ প্রলোভনকে উপেক্ষা করিতে শিখিতে হইবে। ঐহিক কামনা লইয়া এই আনন্দের ভেজে যোগ দিবার অধিকার লাভ করা যাইবে না।

বিশ্বের একদিক হইতে অন্যদিক পর্যন্ত আনন্দের তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে। ক্ষুদ্রতা নাই, বন্দীত্ব নাই–এই বিপুল প্রসারে সৌন্দর্যময় মুক্তির অনুভূতি প্রতিমুহূর্তে স্পন্দিত হইতেছে।

সেদিন প্রায় সমস্ত রাত্রি তাহার ঘুম আসিল না।

শীতের মাঝামাঝি কাজল কলেজের বন্ধুবান্ধবের সহিত কলিকাতা হইতে মাইল ত্রিশেক দূরের একটা বাগানবাড়িতে বনভোজন করিতে গেল। প্রভাত

www.bengaliebook.com

তাহার সহিত রিপনে পড়ে, ছেলেটি ভালো-ইংরাজি কবিতা পড়িতে খুব ভালোবাসে, থাকে পটুয়াটোলা লেনে। সেও বনভোজনে যাইবে। কাজলকে ডাকিয়া সে বলিল-অমিতাভ, পিকনিকের আগের দিন রাত্তিরে তুমি বরং আমার বাড়িতে এসে থাকো, নইলে অত সকালে কি তুমি এসে উঠতে পারবে? ভোবেলাই তো রওনা দিতে হবে–

কাজল রাজি হইয়া আগের রাত্রে প্রভাতের বাড়ি চলিয়া আসিল। বাড়ির মানুষেরা খুব ভালো, বিশেষ করিয়া প্রভাতের বাবা কাজলের সহিত সমবয়েসী বন্ধুর মতো ব্যবহার করিলেন।

একতলার কোণের দিকে প্রভাতের ঘর। এইখানে সে পড়াশুনা করে এবং ঘুমায়। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া দুইবন্ধু খাটে আধশোয়া হইয়া গল্প শুরু করিল। প্রভাতের বাড়ির অন্যরা দোতলায় থাকেন, কাজেই আড্ডায় বাধা পড়িবার ভয় নাই।

প্রভাত বলিল-সিগারেট খাবে? যাই বলো, সিগারেট না হলে আড্ডা জমে না-

–এখানে খাবো? কেউ আসবে না তো?

-দূর। রাত্তিরে আর কেউ নামবে না। তাছাড়া সিঁড়ির মুখের দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসেছি। এই নাও, ধরাও-

দুইজনে সিগারেট ধরাইয়া কোলে একটি করিয়া বালিশ লইয়া বসিল।

প্রভাত বলিল–অনেকদিন থেকেই তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ভাবি, সুযোগ হয়ে ওঠে না। আমাদের ছেলেমানুষির বয়েস কিন্তু ফুরিয়ে এল, ভবিষ্যতে কী করবে কিছু ভেবেছো?

www.bengaliebook.com

ভবিষ্যতের কথা কাজল কিছু ভাবে নাই। জীবনের যে দিকটায় আলো পড়ে, যে দিকটা জ্ঞানে, বিস্ময়ে এবং আনন্দে উজ্জ্বল, সেই দিকটাকেই সে বড়ো করিয়া দেখিয়াছে। জীবনের অবশ্যম্ভাবী সংগ্রামের বিষয়ে সে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নাই। সে বলিল–তুমি কি প্রফেশনের কথা বলছো?

–কিছুটা বটে। মানুষকে তো একটা বৃত্তি অবলম্বন করতেই হয়। কেউ কেউ যে কোনো বৃত্তিতেই নিজেকে বেশ খাপ খাইয়ে নিতে পারে, কিন্তু তুমি বোধহয় তা পারবে না। এখন না ভাবলে পরে কষ্ট পাবে-

কাজল বলিল–তুমি যাকে বৃত্তি বলছে তার একটাও আমার কাছে অনারেল বলে মনে হয়। দেখ আমার জীবনটা আমার নিজের, যে ভাবে ভালো লাগে সেভাবে বাঁচার অধিকার আমার থাকা উচিত, তাই না?

প্রভাত সিগারেটে একটা টান দিয়া বলিল–তোমার কীভাবে বাঁচতে ভালো লাগে?

-আমি বিশুদ্ধ, নির্মল আনন্দ লাভের জন্য বাঁচতে চাই।

–এটা তুমি কিছু নতুন কথা বললে না। আনন্দ হল একধরনের সুখানুভূতি, জীবমাত্রেই সেজন্য বাঁচে।

-সেটা অ্যানিমাল কমফর্ট, আমি সে ধরনের ফিজিক্যাল প্লেজাবের কথা বলছি না। আমি বলছি ইনটেলেকচুয়াল প্লেজারেব কথা–

প্রভাত হাসিয়া বলিল-তুমি একটা হামবাগ, নিজেকেই নিজে ইনটেলেকচুয়াল বলে আঁক করছো?

কাজল লজ্জা পাইয়া বলিল–তুমি বুঝলে না। আমি মোটেও নিজেকে পণ্ডিত বা ওইরকম কিছু বলছি না। আমি বলছি, এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড আর জীবন সম্বন্ধে আমার মনে কতগুলো স্বাভাবিক প্রশ্ন আছে-সেগুলো সম্বন্ধে ভাবতে বা তাদের উত্তর খুঁজতে আমার ভালো লাগে। এটা হচ্ছে joy of pure learning, প্রফেশনের সঙ্গে এর সম্বন্ধ নেই। তাছাড়া নীরস নলেজ-এর কথা বাদ দাও, বিশ্বের অদ্ভুত সৌন্দর্যের দিকটা ভেবে দেখেছো? কে জানে মৃত্যুর পরে আর চেতনা থাকে কিনা, আবার জন্ম হয় কিনা। আমি যতটা সম্ভব এই জন্মেই দেখে যেতে চাই। দিস মে বি মাই অনলি অপরচুনিটি–

–না খেয়ে?

কাজল অন্য জগতে ছিল। বিস্মিত হইয়া বলিল–আঁ?

–বলছি, সেই জ্ঞান এবং সৌন্দর্য আহরণের কাজটা কি না খেয়ে খালি পেটে করবে? সাবসিসটেন্সের দিকটাও তো ভাবা চাই।

কাজল রাগিয়া বলিল–তুমি বড়ো আনরোম্যান্টিক। বাস্তবের বিরাট বাধা তো আছেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও কি পৃথিবীতে বড় কাজ হয়নি? তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে

-আমি তো এতক্ষণ সেই কথাই বলছি। সেই প্রস্তুত হর কাজটা তোমার কতদূর এগিয়েছে?

কাজল কোনদিকেই কিছুমাত্র অগ্রসর হয় নাই। সে কেবল পড়াশুনা করিয়াছে এবং মাঠে বেড়াইতে গিয়া গাছের নিচে বসিয়া বই পড়িয়াছে। পৃথিবীর সঙ্গে তার পরিচয় পুথির পাতার ভিতর দিয়া।

কাজলকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া প্রভাত হাসিতে হাসিতে বলিল–back to square ‘A’, কেমন? না অমিতাভ, যাই করতে চাও, তার জন্য জীবনটাকে একটু ছকে নেওয়া দরকার। নইলে তোমার মতো ট্যালেন্টেড ছেলে পরে কষ্ট পাবে।

কাজল কোণঠাসা হইয়া বলিল-তুমি কী ঠিক করেছে?

–আমি? আমার সব ঠিক করা আছে। এম.এ. পাশ করে আমি কলেজে পড়ার।

কাজল বলিল–আমি যা হতে চাই তা কী করে হওয়া যায় জানি নে। তুমি অরেল স্টাইনের জীবনী পড়েছে প্রভাত? ইউরোপ থেকে পিকিং অবধি প্রাচীন যুগে যে সিল রুট ছিল, যে পথে মার্কো পোলো তার বিখ্যাত ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, সেই হারানো সিল বুট নতুন করে খুঁজে বের করার জন্য অরেল স্টাইন প্রায় সারাটা জীবন ব্যয় করেছিলেন। ভাবো তো, মধ্য এশিয়ার সেই গোবি, তাকলামাকান মরুভূমি–পৃথিবীর ছাদ পামির, উত্তর মঙ্গোলিয়ার নিবিড় অরণ্য, কোথাও দিদিশাহীন মরুপ্রান্তরে দুরন্ত বালির ঝড়, কোথাও হাত-পা জমে-যাওয়া কনকনে শীত! সিল রুটের খোজে খোলা প্রান্তরে তাঁবু খাঁটিয়ে থাকা, রাত্তিরে তাঁবুর বাইরে অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে পাইপ খাওয়া-ওঃ! অমন পরিষ্কার আরহাওয়ায় কত নক্ষত্র দেখা যায় জানো? আমি ওইরকম জীবন চাই।

–স্কলার জিপসি হতে চাও? ম্যাথু আর্নল্ডের স্কলার জিপসি–যে জীবনের গভীর রহস্য খোঁজবার জন্য নিজের সমাজ-সংসার ফেলে উধাও হয়ে গিয়েছিল-

-হ্যাঁ, ঠিক বলেছো। স্কলার জিপসি আমার খুব প্রিয় কবিতা। অমন জীবন পেলে আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়

দুই বন্ধুতে গল্প করিয়া প্রায় সারারাত কাটাইয়া দিল। আলোচনা করিতে করিতে প্রভাত ক্রমে স্বীকার করিল তাহারও যে অ্যাভেঞ্চারের স্বপ্ন নাই এমন নয়। বস্তুত একবার সে ভাবিয়াছিল ক্যাপটেন কুক যে পথে সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন সেই পথে নৌকা লইয়া ভ্রমণে বাহির হইবে। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার আগেই সে একটা খাতায় অভিযানের খসড়া পর্যন্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। গঙ্গার মোহনা দিয়া বঙ্গোপসাগর, তারপর পোর্ট ব্লেয়ার হইয়া রেঙ্গুন। সেখান হইতে জাভা, বোর্নিও এবং সুমাত্রা ছুঁইয়া নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া। ইহার পর উত্তরে ওশিয়ানিয়ার অজস্র ছোট ছোট দ্বীপ, নারিকেলশ্রেণী বেষ্টিত হলুদ তীবভূমি—পথে অবশ্য আঙ্কোর ভাট দেখিয়া লইতে হইবে। সব পরিকল্পনা করা আছে। কিন্তু আর তিনবছর পর তাহার বাবা চাকুরি হইতে অবসর লইবেন। ছোট বোনের বিবাহ এখনও হয় নাই। দিদির বিবাহের দেনার জন্য বাড়ির দলিল মহাজনের নিকট বন্ধক আছে, সেখানা ছাড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আগামী চার বছরের মধ্যেই সংসারের যাবতীয় ভার তাহাকে লইতে হইবে। এ অবস্থায় পলিনেশিয়াব চন্দ্রালোকবিধৌত দ্বীপভূমির স্বপ্ন না দেখাই ভালো।

কাজল উৎসাহে বিছানায় উঠিয়া বসিল, কেন? এতই কি অসম্ভব? বেশ তো, প্রভাত বোনের বিবাহ দিক, বাড়িখানা মহাজনের হাত হইতে ফিরাইয়া আনুক—ততদিন চাকুরি করিলে ক্ষতি নাই। কত সময়ই বা লাগিবে? পাঁচবছর বড়ো জোর-তখনও তাহারা এমন কিছু বৃদ্ধ হইয়া পড়িবে না। ত্রিশও হইবে না বয়েস। বরং দায়িত্ব মিটাইয়া বাহির হওয়াই ভালো। অভিযান সারিয়া ফিরিতে বছরদেড়েক লাগিবে, তখন তাহারা বিখ্যাত হইয়া পড়িবে, চাকুরি পাওয়ার অসুবিধা থাকিবে না।

www.bengaliebook.com

দুইজনেই তরুণ, সম্মুখে অনন্ত জীবনের ইশারা। প্রভাতও বেশিক্ষণ নিজের বাস্তববাদী চরিত্র বজায় রাখিতে পারি না। দুইবন্ধুতে অভিযানের বিভিন্ন দিক আলোচনা করিতে করিতে সকাল হইয়া গেল।

www.bengaliebook.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পিকনিক করিতে গিয়া কাজল এমন একটি অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হইল যাহা তাহার জীবনে এই প্রথম। মানবমনের এক বিশিষ্ট অনুভূতির সঙ্গে আজ পর্যন্ত তাহার পরিচয় ছিল না, মধ্য পৌষের এক পড়ন্ত অপরাহ্নে সেই আশ্চর্য সুন্দর অনুভূতির ব্যঞ্জনা তাহার হৃদয়ের তীতে জাগিয়া উঠিল।

শেয়ালদহ হইতে ট্রেন ধরিতে হইবে, সকাল সাড়ে-সাতটার মধ্যে সকলের সেখানে একত্র হইবার কথা। একটি ছোট দল রান্নার ঠাকুর এবং অন্যান্য তৈজসপত্রাদি লইয়া আগের দিন চলিয়া গিয়াছে। তাহারা রান্নার কাজ আরম্ভ করিয়া দিবে। পৌঁছাইয়াই চা-টোস্ট-ডিম তৈয়ারি পাওয়া যাইবে আশা করা যায়।

জামাকাপড় পরিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া প্রভাত বলিল—আজ একটা মজার ব্যাপার হবে। নরেন্দ্রর পিসতুতো বোন আমাদের সঙ্গে পিকনিকে যাচ্ছে-

—আমাদের সঙ্গে? সে কী! আর কোনোও মেয়ে যাচ্ছে নাকি?

-নাঃ।

কাজল একটু অবাক হইয়া বলিল—তাহলে একা নরেনের বোন ছেলেদের সঙ্গে যাবে?

-হ্যাঁ হে, মিশনারী কলেজে পড়া মেয়ে। দেরাদুন না সিমলা কোথায় যেন থাকে, ছুটিতে বেড়াতে এসেছে। বাঙালি, মধ্যবিত্ত ঘরের ললিত-লবঙ্গলতা নয়, ছেলেদের ভয় পায় না।

কাজল কথা ঘুরাইবার জন্য বলিল—না হয় যাচ্ছেই, তাতে কী হয়েছে?

www.bengaliebook.com

—কী হয়েছে একটু পরেই বুঝতে পারবে।

তারপর অর্থপূর্ণ হাসিয়া বলিল—একেবারে অগ্নিশিখা, জানো? দুতিনদিন আগে পিকনিকের ব্যাপারে কথা বলতে নরেনের বাড়ি গিয়ে দেখে এলাম। আজ ছেলেমহলে একেবারে হৈ-হৈ পড়ে যাবে

কাজলের একটু কৌতূহল হইলেও সে অন্য কথা পাড়িয়া তখনকার মতো প্রসঙ্গটা চাপা দিল। বলিল—এসো, দু-প্যাকেট সিগারেট কিনে নেওয়া যাক। যেখানে যাচ্ছি সেখানে কাছাকাছি সিগারেট কিনতে পাওয়া যাবে কিনা কে জানে—

গ্লোব নার্সারির সামনে দলটার জড়ো হইবার কথা। কাজল ও প্রভাত নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া দেখিল তখনও আর কেহই পৌঁছায় নাই। তাহারা একটা করিয়া সিগারেট ধরাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গোপাল আসিল, তাহার একটু বাদেই জগন্ময় ও শরদিন্দু। এক এক করিয়া প্রায় সবাই আসিয়া গেল, ট্রেন ছাড়িতে আর মিনিটদশেক দেরি। কিন্তু নরেন্দ্র আর তাহার মিশনারী কলেজে পড়া পিসতুতো বোন কই? কাজল আড়চোখে একবার প্রভাতের দিকে তাকাইল। প্রভাতও একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। পুরা দলটাকে পিকনিকের জায়গায় পৌঁছাইয়া দেওয়ার ভার তাহারই উপর। সে স্টেশনের বড়ো ঘড়িটার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—ওহে, তোমরা সব গিয়ে ট্রেনে উঠে পড়। আমি আর অমিতাভ পাঁচমিনিট দেখে চলে আসছি—জায়গা রেখে আমাদের জন্য।

বন্ধুরা প্ল্যাটফর্মের দিকে চলিয়া গেলে প্রভাত বলিল—নরেনের বোনের যে যাবার কথা আছে সেটা আমি ছাড়া কেউ জানে না এলে খুব মজা হত। কেন

www.bengaliebook.com

যে দেরি করছে–বলিতে বলিতেই প্রভাত সামনে তাকাইয়া কনুই দিয়া কাজলকে ঠেলা দিল। কাজল বলিল–কী?

-ওই যে, এসে গিয়েছে।

স্টেশনের সামনে স্টেটসম্যানের ভ্যান হইতে খবরের কাগজ নামানো ইতেছে। তাহার পাশ দিয়া নরেন্দ্র এবং একটি মেয়ে আসিতেছে বটে। তাহাদের দেখিতে পাইয়া নরেন্দ্র হাত নাড়িল। কাছে আগাইয়া আসিতে প্রভাত বলিল– ব্যাপার কী, এত দেরি? আমরা তো আর মিনিট দুই দেখে চলে যাচ্ছিলাম। চল, চল–

ট্রাম না পাইয়া অবশেষে একটি ট্যাকসি ধরিয়া নরেন্দ্র কীভাবে কোনোমতে আসিয়া পোহাইয়াছে সেকথা শুনিতে শুনিতে সবাই প্ল্যাটফর্মে ঢুকিল।

কাজল কয়েকবার লুকাইয়া মেয়েটির দিকে তাকাইয়া দেখিল। তাহার মতোই প্রভাতও কখনও মেয়েদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে নাই, ফলে আদবশতঃ সে নরেন্দ্রর বোনকে উর্বশী বা ক্লিওপেট্রাব সমকক্ষ হিসাবে বর্ণনা করিয়াছিল। অতটা না হইলেও মেয়েটি দেখিতে বেশ ভালো। শান্ত মুখশ্রী, সাধারণ বাঙালি মেয়েদের তুলনায় একটু লম্বা, চাপাফুল রঙের শিফনের শাড়িতে তাহাকে দেখাইতেছে মন্দ না।

কামরায় উঠিয়া বসিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন ছাড়িয়া দিল। দলের অন্যরা নরেনের বোনকে দেখিয়া অবাক, তাহারা পূর্বে এ বিষয়ে কিছু জানিত না। নরেন সবার সঙ্গে মেয়েটির পরিচয় করাইয়া দিল-এ হচ্ছে আমার বোন অপালা। দেরাদুনে থাকে, ছুটিতে বেড়াতে এসেছে। ভাবলাম ওকেও আমাদের সঙ্গে নিয়ে আসি। বোস অপালা, একটু জায়গা করে নে–

সকলে মহাব্যস্ত হইয়া প্রায় পাঁচজনের বসিবার স্থান করিয়া দিল।

শান্টিং ইয়ার্ডের মাকড়সার জালের মতো রেললাইনের জটিলতা ছাড়াইয়া গাড়ি ধীরে ধীরে গতিসঞ্চয় করিতেছে। শীতের সকালের নিরুত্তাপ রৌদ্র কুয়াশার মধ্য দিয়া ক্রমে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। কাজলকে কলেজ করিবার জন্য রোজই রেলগাড়ি চড়িতে হয়, কিন্তু আজ কোনও কাজের তাড়া নাই–এখনি কোথাও পৌঁছাইয়া ভয়ানক বেগে পড়াশুনা বা অন্য কাজ শুরু করিয়া দিতে হইবে না। তাহার মনে হঠাৎ খুব আনন্দ হইল, প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব করিয়া আজ কেমন একটা দিন কাটানো যাইবে! ভালোমন্দ খাওয়াও হইবে!

নির্দিষ্ট স্টেশনে নামিয়া বাগানবাড়িটা মাইলখানেক দূরে। সবাই গান গাহিতে গাহিতে হাঁটিয়া চলিল। জায়গাটাকে প্রায় গ্রাম বলা যাইতে পারে, বসতি বিশেষ নাই। স্টেশনের ধারে দু-একটা চায়ের দোকান, একটা হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারি (বৃদ্ধ ডাক্তারবাবু বুক পর্যন্ত দাড়ি লইয়া রোগীর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন), মুদিখানা–তার পরেই যেন জনপদ ফুরাইয়া গেল। চন্দনী রঙের মিহি ধুলায় পূর্ণ পথের দুইপাশে রাংচিতা আর ভেরেণ্ডা গাছের জঙ্গল। কাছে-দূরে কয়েকটি বড়ো চটকা গাছ প্রশান্ত গাম্ভীর্যের সহিত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

বাগানবাড়িটি বেশ বড়ো, অন্ততঃ সাত-আট বিঘা জমি পাঁচিল দিয়া ঘেবা। তাহাতে আম-জামকাঁঠাল প্রভৃতি পরিচিত গাছ ছাড়াও অজানা বহু গাছেব সমারোহ। ফটক দিয়া ঢুকিয়াই ডানদিকে একটি একতলা বাড়ি। গোটাচারেক ঘর, বারান্দা ইত্যাদি। পিছনে পাতকুয়া আছে। বাগানের অপর প্রান্তে বাঁধানো ঘাটসমেত ছোট পুকুর। আগের দিন যাহাবা চলিয়া আসিয়াছে তাহারা বারান্দায় বসিয়া নিজেদের মধ্যে কথা বলিতেছিল, শহরাগত দলটি পৌঁছাইতেই চেঁচামেচি করিয়া অভ্যর্থনা কবিল। হরিনাথ, যাহার মামার

www.bengaliebook.com

বাগানবাড়ি, সে বলিল–এসো প্রভাত, এতক্ষণ আমাদের আড্ডাই জমছে না– পিকনিক করতে এসে কি আর এমন তিন-চারজন বসে কথা বলতে ভালো লাগে?

প্রভাত বলিল-বেশ তো বসে আড্ডা দিচ্ছিলে বাপু, কেন বাজে কথা বলো!

–আমরা মোটেও আড্ডা দিচ্ছিলাম না, আমরা মনের দুঃখ কাটানোর জন্য কড়াইশুটি খাচ্ছিলাম

–সেরেছে! কিছু বাকি রেখেছ তো? কপির তরকারিতে কী দেবে?

রসিকতা করিয়া কী একটা উত্তর দিতে গিয়া হরিনাথ অপালাকে দেখিতে পাইয়া থতমত খাইয়া গেল।

নরেন বলিল–সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, আমার বোন অপালা-পিসিমার মেয়ে। বাইরে থাকে। ওকেও নিয়ে এলাম-

বারবার সে তো বেশ করেছে, খুব ভালো করেছে বলিতে বলিতে হরিনাথ কেমন তোতলা মতো হইয়া গেল। রথীন অভিভূত হইয়া সাত-আটবার নমস্কার করিল। পরমেশ খামোকাই শার্টের স্কুল টানিয়া হাঁটুর দিকে নামাইতে লাগিল।

একটা বড়ো দল বনভোজন করিতে গেলে যেমন হয়, চা-জলখাবার খাইবার পর সকলে পছন্দমতো ছোট ছোট দলে ভাগ হইয়া এখানে-ওখানে ছড়াইয়া পড়িল। কাজল কোনদিনই হাল্কা কথাবার্তায় যোগ দিতে পারে না, আজও সে কিছুটা একা হইয়া বাগানের মধ্যে আপনমনে ঘুরিতে লাগিল। শীতের দুপুরের একটা নিজস্ব রুপ আছে। রোদে তেমন তেজ নাই, গাছের পাতার ফাঁক দিয়া রোদ আসিয়া মাটির উপরে আলোছায়ার আলপনা তৈয়ারি করিয়াছে।

www.bengaliebook.com

কোথাও কোন শব্দ নাই কেবল একটা কী পাখি যেন ডাকিয়া ডাকিয়া স্তব্ধ দুপুবকে আরও নির্জন করিয়া তুলিতেছে। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে রোদের রঙ বদলায়, পরিবেশে যেন স্বপ্নের মোহাঞ্জন মাখাইয়া দেয়। কল্পনার রাজ্যে দূরত্ব বলিয়া কিছু নাই–বাংলাদেশের আমবাগান আর পলিনেশিয়ার মার্কুয়েসাস্ আইল্যান্ডের অরণ্য একই ভূমিতে অবস্থিত। একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া বসিয়া সুদূরের কল্পনায় মগ্ন হইয়া যাইতে বেশ লাগে। কী প্রয়োজন বেশি বন্ধুবান্ধবের? কী প্রয়োজন অকারণ কোলাহলের? নিজের মনের গভীরে ডুব দিতে শিখিলে বহিরঙ্গ আনন্দ বাহুল্য মাত্র।

বেলা আড়াইটা নাগাদ খাইতে বসা হইল। বাগানের গাছ হইতে কলাপাতা কাটিয়া সবাই ঘাসের উপর বসিয়া গেল। মুখোমুখি দুই সারি, কাজলের ঠিক সামনে অপালা বসিয়াছে। জামরুল গাছের পাতার মধ্য দিয়া বোদ আসিয়া তাহার গায়ে পড়িয়াছে। কাজলের হঠাৎই কেন যেন মেয়েটির মুখের দিকে বারবার তাকাইয়া দেখিতে ইচ্ছা করিল। সুন্দরী মেয়ে তো সে কলিকাতায় পথে-ঘাটে কতই দেখিয়াছে। এই মেয়েটি হইতে বেশি সুন্দরী মেয়েও যে সে দেখে নাই এমন নয়–তবু অপালার শাড়ির রঙ, বিশেষ একভাবে তাকাইবার ভঙ্গি, ঋজু শরীর ঘিরিযা সংযত প্রাণময়তা-সব মিলাইয়া একটি মধুর ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করিয়াছে। একবার সে দেখিল অপালা কপির তরকারি দিয়া ভাত মাখিতেছে, সরু সুন্দর গঠনেব আঙুলগুলি। অনামিকায় একটি গোল্ডস্টোন সেট করা আংটি। পরক্ষণেই সে লজ্জা পাইয়া চোখ নামাইয়া লইল। ছিঃ, মেয়েটি দেখিতে পাইলে কী ভাবিবে!

ভাস্কর দলের মধ্যে একটু যণ্ডামতো, সে চেঁচাইয়া বলিল–ওহে নিখিল, এ কী বকম দেওয়া হচ্ছে তোমাদের? মাংসটা আর একবার এদিকে ঘোরাও, আমাকে একটা ভালো আর মোটা দেখে হাড় দাও দেখি–

প্রভাত বলিল–নিখিল, ওকে ভালো দেখে মাংসেব টুকরো কয়েকটা দাও, হাড় দিয়ে কী হবে?

-না হাড় একটা চাই-জাস্ট টু স্যাটিসফাই মাই মিট টুথ–

পরমেশ বলিল–আমাকে আরও হাঁড়িখানেক ভাত দাও তত ভাই-

হরিনাথ পংক্তির একেবারে শেষে পা লম্বা করিয়া কনুইয়ে ভর দিয়া আধশোয়া হইয়া ছিল, মাংস পরিবেশন করিতে গিয়া নিখিল তাহাকে বলিল–এ আবার কী রকম খেতে বসা? সোজা হয়ে বসো-

হরিনাথ রাজকীয় ভঙ্গিতে হাত নাড়িয়া বলিল–ডোন্ট বদার, সার্ভ জানো, প্রাচীনকালে রোমান সম্রাটরা এইভাবে শুয়ে শুয়ে খেতেন।

এদিক-ওদিক তাকাইয়া নিখিল অনুচ্চস্বরে বলিল-তাই নাকি? তা হবে। কিন্তু রোমান সম্রাটদের অন্ততঃ পাঞ্জাবির তলা দিয়ে পাজামার দড়ি বেরিয়ে ঝুলত না!

তড়াক করিয়া সোজা হইয়া হরিনাথ এক হাত দিয়া লজ্জাকর ত্রুটিটা সংশোধনের চেষ্টা করিতে লাগিল। অটোম্যান সাম্রাজ্যের সম্মিলিত সৈন্যদল রাজ্যের সীমানায় হানা দিয়াছে সংবাদ পাইলেও ভোজনরত রোমান সম্রাট বোধহয় এতটা চমকাইতেন না। এইভাবে হৈ-হুল্লোড়ের মধ্য দিয়া আহারপর্ব শেষ হইল।

পুকুরঘাটে সুপারিগাছের দীর্ঘ ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। খাওয়ার পর কাজল বাঁধানো ঘাটে বসিয়া একটা সিগারেট ধরাইল। বন্ধুরা গুরুভোজনের অন্তে বারান্দায় পাতা শতরঞ্চির উপর শুইয়া খোশগল্প জুড়িয়া দিয়াছে। এদিকটা একেবারেই নির্জন। কাজল চোখ বুঁজিয়া শুনিতে লাগিল লঘুস্পর্শ বাতাস

গাছের পাতায় উদাস ঝিরঝির শব্দ তুলিয়াছে। সুপারিগাছের গায়ে একটা কাঠঠোকরা বহুক্ষণ ধরিয়া ঠক্-র-র আওয়াজ করিতেছে। শান্ত দ্বিপ্রহরের কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শব্দ আছে, আলাদা করিয়া তাহাদের খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। এমন কী সবগুলি কান দিয়া শুনিতে পাওয়া যায় এমন শব্দও নয়-কিন্তু পরস্পর মিশিয়া তাহারা চমৎকার আরহ তৈয়ারি করে, কাজল সিগারেট টানিতে টানিতে সেই আমেজটা উপভোগ করিতেছিল।

অকস্মাৎ তাহার মনে হইল ঘাটের উপর সে আর একা নয়, কে যেন কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার আসিবার কোন শব্দ সে পায় নাই, কিন্তু মানুষের কাছে মানুষ আসিয়া দাঁড়াইলে ইন্দ্রিয়াতীত এক অনুভূতি দ্বারা তাহা বুঝিতে পারা যায়।

আস্তে করিয়া চোখ খুলিতেই প্রথমে নজরে পড়িল রুপালি পাড় বসানো চাঁপাফুল রঙের শাড়ির নিচের দিকটা।

সে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অপালা তাহার দিকে বিস্ময় ও কৌতুক মিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। সে অপ্রস্তুত হইয়া বলিল–আপনি কতক্ষণ–মানে, আমি একটু-বসুন না–

অপালা বলিল–আপনি কি রোজই দুপুরে ধ্যান করেন নাকি?

কাজল লজ্জিতমুখে বলিল-না না, ওসব কিছু নয়। আসলে শীতের দুপুরবেলায় একটু আলসেমি করতে ইচ্ছে করে, তাই চোখ বুজে ছিলাম তারপর একটু ইতস্তত করিয়া যোগ করিল–এ রকম নির্জন জায়গায় দুপুরবেলা নানারকম আরছা শব্দ হয়, জানেন? চোখ বুজে থাকলে শোনা যায়–নিতান্ত ঘনিষ্ঠ দু-একজন বন্ধু ছাড়া কাজল নিজের মনের কথা এভাবে কাহাকেও বলে

। কিন্তু সদ্য পরিচিত এই মেয়েটিকে দেখিয়া হঠাৎ তাহার মনে হইল ইহাকে সব কথা বলা যাইতে পারে। কেন মনে হইল তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না! বলিয়াই তাহার কেমন লজ্জা করিতে লাগিল, বিব্রতভাব কাটাইবার জন্য সে বলিল—বসুন না, দাঁড়িয়েই থাকবেন বুঝি?

পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া কাজল ঘাটের একটা অংশ ঝাড়িয়া দিল। স্মিত হাসি অপালা বসিল, বলিল—আপনিও বসুন।

সম্মানজনক দূরত্ব রাখিয়া কাজল বসিল।

—আমি কিন্তু আপনার পরিচয় জানতে পেরেছি।

কাজল একটু অবাক হইয়া বলিল—আমার? কী পরিচয়?

-আপনি বিখ্যাত সাহিত্যিক অপূর্বকুমার রায়ের ছেলে, তাই না?

কাজল হাসিয়া বলিল—ওটা তোত আমার বাবার পরিচয়। তা যাই হোক, আপনি বুঝি আমার বাবার বই পড়েছেন?

অপালা মুখ নিচু করিয়া বলিল—সবচেয়ে লজ্জার কথা কি জানেন, আমি এখনও ভালো বাংলা পড়তে পারি না। বাবা সরকারি কাজ করেন তো, আমি ছোটবেলা থেকে বাইরে বাইরেই মানুষ হয়েছি। গত চার-পাঁচবছর ধরে বাবা বাড়িতে আলাদা করে বাংলা শেখাচ্ছেন, এখন অনেকটা রপ্ত হয়ে এসেছে—আর বছর দুইয়ের মধ্যেই নিজেকে পুরোপুরি বাঙালি বলতে পারব বলে বিশ্বাস রাখি।

www.bengaliebook.com

তারপর একটু থামিয়া বলিল–বাবা খুব বই পড়েন। সম্প্রতি বাবা অর্ডার দিয়ে কলকাতা থেকে আপনার বাবার সব বই আনিয়েছেন। ছুটিতে এখানে আসার কদিন আগে রাত্তিরে খাবার টেবিলে বসে বলছিলেন বাংলা ভাষায় এমন বই যে লেখা হয়েছে জানতাম না। সাহিত্যের দুর্ভাগ্য এমন লেখক অসময়ে চলে গেলেন।

কাজল চুপ করিয়া রহিল। বাবার কথা উঠিলে সে অন্যমনস্ক হইয়া যায়। তাহার জীবনে ধর্মীয় ঈশ্বরের ছবি মুছিয়া গিয়ে সেখানে বাবার মূর্তি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। ইষ্টনাম উচ্চারিত হইতে শুনিলে ভক্ত যেমন আবিষ্ট হইয়া পড়ে তাহারও তাই হয়।

-আমি আপনাকে কষ্ট দিলাম, না?

কাজল চমকাইয়া বলিল-না, তা নয়। বাবার মৃত্যুর কথা কেউ উল্লেখ করলে আমি প্রচলিত অর্থে দুঃখ পাই না। কারণ অনেক জীবিত মানুষের চেয়ে বাবা আমার কাছে অনেক বেশি করে জীবিত। অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম কেন জানেন? বাবাকে আমি দেবতার আসনে বসিয়েছি। সনাতন ধর্ম যাকে দেবতা বলে তা নয়–আমার জীবনদেবতা, আমার জীবনদর্শনের উৎস। ক্রীশ্চান পাদ্রীরা আচমকা ঈশ্বরের নাম উচ্চারিত হতে শুনলে চমকে ওঠে, আমারও ওই ধরনের একটা রি-অ্যাকশন হয় আর কী-

--বাবার মতো আপনিও খুব প্রকৃতি ভালোবাসেন, তাই না?

-প্রকৃতিকে ভালোবাসার কোনও আলাদা অর্থ নেই। যা কিছু বিশ্বে রয়েছে বা ঘটছে, সবই প্রকৃতির অঙ্গ। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে আমরা যাই করি না কেন, সেটা নিজেদের মতো করে প্রকৃতিকে ভালোবসেই করছি। তবে যদি

বিশেষ অর্থে বলেন, যেমন গাছপালা, মাঠ বা আলোবাতাসকে ভালোবাসা- সে অর্থেও আমি নিশ্চয় প্রকৃতিকে ভালোবাসি। আপনিও বুঝি তাই?

অপলা বলিল–আমার কোনও বন্ধু নেই, জানেন? এক জায়গায় কখনও বেশিদিন থাকিনি তো, বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার সুযোগই হয়নি। একা একা পাহাড়ে, জঙ্গলে, সমুদ্রের ধারে বেড়াতাম। বিশেষ করে প্রকৃতিকে ভালোবাসার অর্থ আমিও জানি না, বাইরে থেকে কখনও দেখিনি বলে।

কথা শুনিতে শুনিতে কাজল বিস্মিত চোখে অপালার দিকে তাকাইতেছিল। নারীদের সম্পর্কে কাজলের মোটামুটি ধারণা ছিল যে, তাহারা সচরাচর রান্নাবান্না এবং শিশুপালন করে, প্রায়শই দক্ষতার সহিত ঝগড়া করে এবং শাড়ি ও গহনা পাইলে সন্তুষ্ট থাকে। পুরুষের সঙ্গে সাহিত্য ও দর্শন লইয়া স্বাভাবিকভাবে কথা বলিতে পারে এমন মেয়ে সে আগে দেখে নাই। অপালা বলিলআপনিও বুঝি লেখেন?

-সে রকম কিছু নয়। লিখতে ইচ্ছে করে খুব–অনেক যেন বলবার কথা আছে বলেও মনে হয় মাঝে মাঝে–কিন্তু লিখলেই বন্ধুরা বলে আমার লেখা নাকি বাবার মতো হয়ে যায়।

-সত্যিই কি তাই?

–হতে পারে। আমার জন্মের সময়ে মা মারা গিয়েছিলেন, তাকে আমি দেখিনি। প্রথমে কিছুদিন মামাবাড়িতে, তারপর সমস্ত ছোটবেলাটা আমি বাবার কাছে মানুষ। যে সময়ে মানুষের প্রকৃত ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে যায়। বাবা আমাকে কখনও বকতেন না, তিক্ত শাসন করতেন না–কিন্তু তার আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব সেই অবোধ শিশুবয়েসেই আমাকে স্পর্শ করেছিল। এ ধরণের প্রভাব

থেকে মুক্ত হওয়া কঠিন। হয়তো আমার অজান্তেই আমার লেখায় বাবার ছাপ এসে যায়–

হাঁটুর উপর থুতনি রাখিয়া অপালা জলের দিকে তাকাইয়া কাজলের কথা শুনিতেছিল। পুকুরের জলে অপরাহ্নের ছায়া গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। সুপারি গাছের কাঠিন্যের কাছে সাময়িক হার মানিয়া কাঠঠোকরাটা বিশ্রামরত। জলের দিকে চাহিয়াই মৃদুস্বরে অপালা বলিল–একটা কথা বলব? কিছু মনে করবেন না তো? না থাক, আপনি রাগ করবেন–

কাজল বলিল–বা রে, রাগ করব কেন? আপনি তো আর আমাকে বকবেন না–

-আমি কিন্তু একটু বকতেই যাচ্ছিলাম-

কাজলের কৌতূহল হইল, কী বলিবে এই প্রায়-অপরিচিত মেয়েটি? কয়েকঘণ্টার পরিচয়ে একজন আর একজনকে রাগ করিবার মতো কী বলিতে পারে? সে বলিল-রাগ করব না, বিশ্বাস করুন–

-আমার এভাবে কথা বলার কোনও অধিকার নেই, তবু বলছি-বাবাকে আপনি খুব শ্রদ্ধা করেন বটে, কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করার সময়ে তার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করুন। সত্যি হয়তো আপনার অনেক কিছু বলবার আছে, পৃথিবীকে অনেক কিছু দেবার আছে, dont let yourself be possessed

কাজলের প্রথমে একটু বাগ হইল। তাহার বাবার সহিত তার সম্পর্ক অনুভূতির একটা প্রগাঢ়তম স্তরে প্রতিষ্ঠিত, অন্য কেহ তাহা বুঝিতে পারিবে বলিয়া সে বিশ্বাস করে না। এবং সেই পবিত্র সম্পর্কের বিষয়ে কাহারও সমালোচনা সহ্য করাও তাহার পক্ষে কষ্টকর। কিন্তু কথা শেষ করিয়া অপালা তাহার দিকে

সোজা তাকাইয়া আছে, সেই সরল অথচ গভীর দুই চোখের দিকে নজর পড়িতেই কাজল অপালার অকপট ঐকান্তিকতার সবটুকু একসঙ্গে দেখিতে পাইল।

কাজল অপালার কথার কোনও উত্তর দিল না। সামনে তাকাইয়া দেখিল পুকুরের জলে ঝিরঝিরে ঢেউ উঠিয়াছে, বিক্ষুব্ধ জলতলে গাছের প্রতিচ্ছবি শত শত খণ্ডে ভাঙিয়া যাইতেছে। বিকালবেলার একটা সুন্দর গন্ধ আছে। সারাদিন রৌদ্রে তপ্ত হইবার পর দিনশেষে ছায়ার স্পর্শে বন্য লতাপাতা একধরনের শান্তিমাখা সুঘ্রাণ বিতরণ করে। বাতাসে সেই গন্ধ ভাসিয়া আসিল। অপালা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল–চলুন যাই–চা খাবেন না? আপনার বন্ধুরা তো সব চা খেয়ে তবে রওনা দেবে। আর হ্যাঁ, আপনার ঠিকানাটা দিন তো–আমি আপনাকে চিঠি দেব।

কাজল অবাক হইয়া বলিল–চিঠি দেবেন? ঠিকানা?

-হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে? ও, আমাদের বয়সি ছেলেমেয়েদের পরস্পরকে চিঠি লিখতে নেই, তাই না? সমাজে নিন্দে হয়? আপনি দিন ঠিকানা–আমি বাংলাদেশে মানুষ হইনি, ও ধরনের অকারণ সংস্কার আমার নেই। বাবাও খুব উদার, তিনি জানতে পারলেও আমার স্বাধীনতায় বাধা দেবেন না।

কাজল একটু ইতস্তত করিয়া বলিল–আমার নোটবই আর কলম বন্ধুদের কাছে রেখে এসেছি। চলুন, দিয়ে দেব-

বাগানবাড়ির বারান্দায় ফিবিবার প্রস্তুতি হিসাবে জিনিসপত্র গোছানো হইতেছে। ঠাকুর উনানের পাশে উবু হইয়া বসিয়া চা হুঁকিতেছে। কাজলকে দেখিয়া হরিনাথ বলিল–এই যে, ছিলে কোথায়? চা খাবে তো? নাও, এবার

www.bengaliebook.com

বেরিয়ে পড়তে হবে। ট্রেনের একঘণ্টা বাকি। এ গাড়ি মিস করলে কলকাতা পৌঁছতে রাত দশটা-

ধুলায় ভরা পথ দিয়া স্টেশনে আসা। সকালের দৃশ্যটাই যেন আবার উল্টা দিক হইতে বহিয়া যাইতেছে। পূব হইতে পশ্চিমের দিকে উড়িয়া যাইতেছে পাখির দল, দিনের শেষে মাঠ হইতে বিদায় লইয়াছে ক্লান্ত কৃষক। কত তাড়াতাড়ি একটা দিন নিঃশেষে ফুরাইয়া গেল! ছোটবেলায় এমন ছিল না- তখন এক একটা দিন যেন জগতের সবটুকু সময় দিয়া গঠিত ছিল। একটা বছর সম্পূর্ণ কাটিবার পর গতবছরের কথা আরছাভাবে মনে পড়িত। বয়েস বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সময় কাটিবার বেগও বাড়িয়াছে।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে কাজল অপালাকে বলিলআপনার মধ্যেও বেশ কবিত্ব আছে, নইলে কলাবাগানের ধারে গিয়ে বসে ছিলেন কেন?

অপালা অবাক হইয়া বলিল–কী করে জানলেন? আমি তো একা বসে ছিলাম-

–কথাটা ঠিক কিনা?

-বসে ছিলাম সেটা ঠিক, কবিত্বের ব্যাপারটা আপনার মনগড়া। আপনি ওদিকে গিয়ে আমাকে দেখতে পেয়েছিলেন, না?

–না।

–তবে?

কাজল হাসিয়া বলিল—আপনার সমস্ত শাড়িতে চোরকাটা লেগে আছে। বাগানে ওই জায়গা ছাড়া আর কোথাও চোরকাটা নেই আমি দেখেছি। আর না বসলে শুধু পায়ের দিকে লাগত, সমস্ত কাপড়ে লাগত না। এ থেকেই অনুমান করলাম।

—আপনি বুঝি খুব ডিটেকটিভ বই পড়েন? গল্পের গোয়েন্দারা জুতোর তলায় সুরকির দাগ আর বেড়াবার ছড়ির ডগা দেখে সব বলে দিতে পারে—

কাজল বলিল—এটুকুর জন্য ডিটেকটিভ বই পড়তে হয় না, এমনিই বলা যায়। তবে হ্যাঁ, পড়ি বইকি-শার্লক হোমসের গল্প আমার খুব প্রিয়।

—চেস্টারটনের লেখা পড়েছেন? ফাদার ব্রাউন স্টোরিজ?

কাজল লজ্জিতমুখে বলিলনাঃ, খুব প্রশংসা শুনেছি-

-পড়ে দেখবেন, খুব ভালো লাগবে। আপনি, এমনিতে কী ধরনের বই পড়তে ভালোবাসেন, বলুন তো দেখি—আমার সঙ্গে মেলে কিনা—

সমস্ত ট্রেনযাত্রার সময়টা তাহারা গল্প করিয়া কাটাইল। বিশেষ কোনও বিষয়ে আলোচনা নহে, মনে আনন্দ থাকিলে এই বয়েসটায় অকারণেই উচ্ছল হইয়া ওঠা যায়।

নোটবুক হইতে কাগজ ছিড়িয়া কাজল অপালাকে তাহার ঠিকানা লিখিয়া দিল। শেয়ালদা হইতেই পরস্পরের নিকট বিদায় লইয়া যে যাহাব বাড়ি চলিয়া গেল। কেবল কাজল জীবনে এই প্রথম বাড়ি ফিরিবার জন্য কোনও তাড়া অনুভব করিল না। হ্যারিসন রোড ধরিয়া সে অকারণেই আঁটিয়া কলেজ স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত গিয়া আবার শেয়ালদায় ফিরিয়া আসিল। সবই ঠিক আছে

সেই অবিরাম জনস্রোত, বিদ্যুৎবাতির সমারোহ, কলিকাতা শহরটা। কেবল তাহার মধ্যে অকস্মাৎ যেন কী একটা পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সেদিন কী কারণে ছুটি ছিল, সকালে বাহির হইবার তাড়া নাই। কাজল পড়িবাব ঘরে চৌকির উপর আধশোয়া হইয়া খবরের কাগজে চোখ বুলাইতেছিল। সে এমন অনেক লোক দেখিয়াছে যাহারা সকালে উঠিয়া কোনরকমে দাঁতটা মাজিয়া লইয়া হিংস্রভাবে খবরের কাগজকে আক্রমণ করে এবং প্রাণপণে পড়িতে পড়িতে দুইঘণ্টার মধ্যে এমন কী বেহালার পাচনের বিজ্ঞাপন পর্যন্ত নিঃশেষে চিবাইয়া ফেলে। কিন্তু সে নিজে খবরের কাগজ পড়িতে বিশেষ ভালোবাসে না। সমস্ত পাতাগুলি জুড়িয়া কেবল যুদ্ধের খবর, নয়তো আজেবাজে হেঁদো গল্প—আর রাজ্যের বিজ্ঞাপন। এসব খবরের প্রয়োজন নাই এমন কথা সে বলে না, কিন্তু ইহা অপেক্ষাও মহত্তর ঘটনা কোথাও ঘটিতেছে না সে কথাও বিশ্বাস করা কঠিন। ভালো খাওয়া ভালো পরার প্রয়োজনের বাহিরে যে অতিরিক্ত কর্মোৎসাহ মানুষকে একদিন পশুত্বের স্তর হইতে টানিয়া উঠাইয়াছিল, সে সম্বন্ধে সংবাদ কোথায়? এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীতে মানুষ কি কেবল যুদ্ধ করিতেছে? কেবল ক্ষমতালাভের চক্রান্ত করিতেছে? কেহ কি গোলাপফুলের নতুন প্রজাতি সৃষ্টির জন্য গবেষণা করিতেছে না? কোনও অখ্যাত, দরিদ্র মানুষ কি গত একবৎসরে কোথাও মহৎ উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গ করে নাই? জ্যোতির্বিজ্ঞানের কোনও নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয় নাই? একঘেয়ে খবর পড়িয়া মানুষ কী যে আনন্দ পায়। কাজলের তো বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছে।

এই সময়েই বাহিরের দরজায় কড়া নড়িয়া উঠিল।

দরজা খুলিয়া কাজল দেখিল ধুতি আর শার্ট পরা চোখে চশমা বছর ত্রিশ বয়েসের এক ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া আছেন। হাতে কয়েকখানা বই এবং একটি চামড়ায় বাঁধানো মোটা খাতা। চেহারায় পরিশীলিত বুদ্ধির ছাপ।

কাজল জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কাকে চাইছেন? ভদ্রলোক মার্জিত গলায় বলিলেন-এইটে কি সাহিত্যিক অপূর্বকুমার রায়ের বাড়ি?

কাজলের বুকের মধ্যে হঠাৎ কেমন করিয়া উঠিল। কতদিন পরে আবার কেহ বাবার নাম করিয়া বাড়ির খোঁজ করিতেছে। বহুদিন পরে এমনটা হইল।

-আজ্ঞে হ্যাঁ। কী দরকার যদি-

-দরকার সে অর্থে কিছুই না। আমি ওঁর লেখার একজন ভক্ত, পাবলিশারের কাছ থেকে ঠিকানা জোগাড় করে একবার ওঁর স্ত্রী আর ছেলের সঙ্গে কথা বলতে এলাম। শুধু শ্রদ্ধা নিবেদন ছাড়া আমার আর কোনও উদ্দেশ্য নেই। একবার কি-

কাজল ভদ্রলোককে আনিয়া নিজের পড়িবার ঘরে বসাইল। ভদ্রলোক চারিদিকে তাকাইয়া দেয়ালে টাঙানো অপুর বড়ো ছবিখানা কিছুক্ষণ দেখিলেন, তারপর বলিলেন-একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, কিছু মনে করবেন না। ভুল হলে মার্জনা করবেন। আচ্ছা, আপনি কি অপূর্ববাবুর ছেলে?

কাজল হাসিয়া ঘাড় হেলাইয়া জানাইল-হ্যাঁ।

—আমি ঠিকই ধরেছি তাহলে। আপনার বাবার সঙ্গে আপনার চেহারার খুব মিল রয়েছে, জানেন? আমার দেখেই মনে হয়েছিল—আপনার মাও তো এখানে আপনার সঙ্গেই থাকেন, তাই না? ওঁকে একবার প্রণাম করে যাব-

-হ্যাঁ, নিশ্চয়। মা স্নান করছেন, আপনি বসুন। চা খাবেন তো?

-তা চা একটু হলে মন্দ হয় না

ভদ্রলোকের চা-পানের মাঝপথে হৈমন্তী আসিয়া ঘরে ঢুকিল। ভদ্রলোক সম্ভ্রমে, ব্যস্ততায় তটস্থ হইয়া খটাখট শব্দে পেয়ালা-পিরিচ টেবিলের উপর রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন– আমার নাম জগদীশ চৌধুরী, কলকাতায় ভবানীপুরে থাকি। কলেজে পড়ার সময় থেকেই অপূর্বকুমাব রায়ের লেখা আমার খুব ভালো লাগে। ওঁর সব বই-ই আমি বহুবার করে পড়েছি। আপনাদের সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে আমার অনেকদিনের। তাই ভাবলাম–

হৈমন্তী বলিল–খুব ভালো করেছেন, ওঁকে যারা ভালোবাসেন তারা সবাই আমার আত্মীয়। বসুন না–

জগদীশ চৌধুরী অগ্রসর হইয়া হৈমন্তীর পায়ের ধুলা লইয়া বলিল–আপনি আমার মাতৃতুল্য, আমাকে তুমি বলবেন। আমার পরম দুর্ভাগ্য, স্বয়ং লেখককে দেখতে পেলাম না। আমি ওঁকে কত শ্রদ্ধা করি তা বলে বোঝাতে পারব না–যদি আজ ওঁর পায়ের ধুলো নিতে পারতাম তাহলে আমার জীবন ধন্য হত–

চেয়ারে বসিয়া বাকি চা-টুকু শেষ করিয়া জগদীশ বলিল–হিসেব করে দেখেছি, যখন প্রথম এর বই পড়ি তখনও উনি জীবিত। সে সময়ে চলে এলেও দেখাটা হত। আসলে তখন আমি সবে কলেজে ঢুকেছি, নিতান্ত লাজুক–এতবড় লেখকের বাড়ি এসে কী ভাবে কথা বলব তাই জানতাম না। পরে বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে যখন একটু বুদ্ধি হল, তখন বুঝতে পারলাম কী অমূল্য সুযোগ হাত ফসকে গেছে–

তারপর উৎসাহে উজ্জ্বল মুখ হৈমন্তীর দিকে তুলিয়া বলিল–আমার কি মনে হয় জানেন? আমার মনে হয় অপূর্বকুমার রায়ের মতো লেখক শুধু বাংলাভাষায় কেন, পৃথিবীর সাহিত্যে বহু শতাব্দীতে একজনই আসে।

www.bengaliebook.com

গাছপালা আর প্রকৃতির বর্ণনা তো অনেকের লেখাতেই পাওয়া যায়কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে এমন একাত্ম হয়ে যাওয়া কিংবা প্রকৃতিকে সচেতন চরিত্র হিসেবে কল্পনা করা-এ আমরা একমাত্র কবি কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ছাড়া-

অপরিসীম আবেগে জগদীশ আরও আধঘণ্টা অনেক কিছু বলিয়া গেল। শেষে বলিল-আমি অপূর্ববাবুর অমর স্মৃতির উদ্দেশে একখানা কবিতা লিখেছি। একটু শোনাবো?

হৈমন্তী বলিল—বেশ তো, শোনান না-

জগদীশ চামড়ায় বাঁধানো খাতাটা খুলিয়া পড়িতে লাগিল—চলিয়া গিয়াছে হে কবি, যদিও কবেই অমর ধামে—আমার হৃদয়তন্ত্রী তবু যে বাজিছে তোমার নামে।

কবিতাপাঠ শেষ করিয়া জগদীশ জিজ্ঞাসা করিল-কেমন হয়েছে? ভালো?

হৈমন্তী মাথা নিচু করিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল। কাজলের চোখেও জল আসিয়া গিয়াছিল। অবাক হইয়া দু-জনের দিকে তাকাইয়া অপ্রস্তুত জগদীশ বলিল—এ হে! আপনাদের মনে খামোকা দুঃখ দিলাম, আমাকে মাপ করবেন

আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া হৈমন্তী বলিল-না না বাবা, তোমার কোনও দোষ নেই। খুব সুন্দর হয়েছে তোমার কবিতা-সেজন্যই তো চোখে জল এলো। বোসো, তোমাকে কিছু খেতে দিই—

জগদীশ ব্যস্ত হইয়া বলিল—আমি কিছু খাব না মাসিমা, আপনি উঠবেন না।

www.bengaliebook.com

–তা কি হয় বাবা? মায়েব কাছে এসেছে, বাড়িতে যা আছে তাই দেব। বোসো তুমি–

হৈমন্তী খাবার আনিতে গেলে জগদীশ মিনিটখানেক লজ্জিতমুখে বসিয়া রহিল, তারপর কাজলের দিকে তাকাইয়া বলিল–আমারই বোঝা উচিত ছিল, এ ব্যাপারে আপনাদের একটা

সেন্টিমেন্ট থাকা খুব স্বাভাবিক। বিনা ভূমিকায় কবিতাটা অমনভাবে পড়া উচিত হয়নি–

কাজল বলিল-ও ব্যাপারে আপনি আর কিছু ভাববেন না। বাবাকে আপনিও ভালোবাসেন বলেই না কবিতা লিখেছেন–এ আমাদের গৌরবের বিষয়।

হৈমন্তী একটা রেকাবিতে চিড়েভাজা আর নারকেলকোবা আনিযা জগদীশের সামনে টেবিলেব উপর রাখিয়া বলিল–সত্যিই বাড়িতে যা ছিল দিলাম। খাও বাবা–

খাইতে খাইতে জগদীশ বলিল–আমি আর একটা কথাও আপনাদের জানাতে এসেছিলাম মাসিমা। অপূর্ববাবুব লেখা ভালোবাসি এমন ক-জন মিলে আমরা একটা গোষ্ঠী তৈবি করতে চলেছি। কলকাতায় বিভিন্ন জায়গায় এই গোষ্ঠীর অনুষ্ঠান হবে। উদ্বোধনের দিন আমবা কিন্তু আপনাকে নিয়ে যাবে। যাবেন তো মাসিমা?

জগদীশ বিদায় লইবার পর মা ও ছেলে অনেকক্ষণ বসিয়া কথা বলিল। অপুকে লইযা কলিকাতায় দল গড়িয়া উঠিতেছে, তাহারা অপুর স্মৃতিসভা করিবে ইহাতে তো আনন্দিত হওয়া উচিত, কিন্তু দুইজনের কেবল কান্না পাইতেছে কেন? কাজল বলিল–বাবা বেঁচে থাকলে খুব খুশি হত, বুঝলে মা?

www.bengaliebook.com

কেউ বাবাকে ভালো বললে বা লেখার প্রশংসা করলে বাবা একেবারে ছেলেমানুষের মতো আনন্দ পেত। তুমি জানো না, একবার আমাদের কলকাতার ভাড়াবাড়িতে এক ভদ্রলোক এলেন। আমি তখন খুব ছোট, মুড়ি খেয়ে ঘরময় ছড়িয়ে মেঝে নোংরা করে রেখেছি। বাবার তখন সবে প্রথম বইখানা বেরিয়েছে। ভদ্রলোক বাবাব বই পড়ে মুগ্ধ, খবর দিতে এসেছেন বিকেলে বিভাবরী পত্রিকার সম্পাদক আসবেন বাবার সঙ্গে দেখা করতে। আমাকে বাবা বকলেন ঘর নোংরা করে রাখার জন্য—আসলে কিন্তু বাবাও আমার সঙ্গে মুড়ি খাচ্ছিলেন, অতিথির সামনে লজ্জায় পড়ে বকেছিলেন। আমার খুব দুঃখ হয়েছিল, আগে তো কখনও বাবার কাছে বকুনি খাইনি। সে লোকটা চলে যাবার পর আমার অভিমান হয়েছে বুঝতে পেরে বাবা আমাকে কত করে আদর করে দিলেন। যাই হোক, যে কথা বলছিলাম—সেদিন বাবার মুখে যে খুশির আলো দেখেছিলাম তা কোনোদিনই ভুলবো না মা। অহংকার বা উদ্ধত গর্ব নয়—বাবা সে ধ জানতেনই না। বাচ্চা ছেলেকে তার আঁকা ছবি বা তার গাওয়া গান সুন্দর হয়েছে বললে সে যেমন সরল আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—বাবাকে তেমনি হতে দেখেছিলাম।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল-আর আজ বাবাকে নিয়ে সভা হতে চলেছে। সেদিন প্রকাশকের দোকানে দাঁড়িয়ে আছি, একজন লোক বাবার বই কিনতে এসে কি বললো জানো মা? লোকটা বললো—অপূর্ববাবুর বই পড়লে আর অন্য উপন্যাস হাতে নিতে ইচ্ছে করে না। ওঁর যা যা বই আছে আমাকে দিন তো মশাই—

হঠাৎ কাজল হৈমন্তীর দিকে তাকাইয়া ব্যগ্রস্বরে বলিল—মা, তুমি বাবার একটা জীবনী লেখো কেন? তোমার চাইতে ভালো করে আর কে পারবে? আমি বলছি মা, এখনও কিছুই হয়নি, এই তো সবে শুরু—বাবার নাম নিয়ে

পৃথিবীর লোক পুজো করবে একদিন, তুমি দেখে নিয়ো। তখন তোমার লেখা বই পড়ে সবাই বাবার কথা জানতে পারবে। লেখো না মা?

কলিকাতার মতো মালতীনগরেও কাজলের একটা বন্ধুর দল আছে। ইহাদের মধ্যে শিবদাস নামে একটি ছেলে একদিন কাজলকে বলিল—আমরা অকারণে জীবনটা ব্যয় করছি তা বুঝতে পারছিস কাজল?

বন্ধুর দলের ভবরঞ্জন ক্লাস এইটে একটি মেয়েকে বাড়িতে পড়ায়। তাহার বাবার বন্ধুর মেয়ে। গতকাল ভবরঞ্জন সিকের পাঞ্জাবি পরিয়া পড়াইতে গিয়াছিল-ছাত্রী নাকি বলিয়াছে, মাস্টারমশাই, এই জামাটাতে আপনাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। এই কথার কি গূঢ় অর্থ হইতে পারে তাহা লইয়া এতক্ষণ তুমুল তর্ক চলিতেছিল। একপাশে স্বয়ং ভবরঞ্জন ঘাসের উপর চিৎ হইয়া ধরাশায়ী মহারথীর ন্যায় পড়িয়া ছিল এবং বন্ধুদের বাক্যস্রোতের ফাঁকে ফাঁকে যতিচিহ্নের মতো উদাস দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছিল। এই রঙিন আরহাওয়ার মধ্যে শিবদাসের কঠিন দার্শনিক প্রশ্নজাল গানের আসরে মোহমুদগরের শ্লোকের মতো সবাইকে ভয়ানক চমকাইয়া দিল।

কাজল বলিল—তুই কী বলতে চাইছিস?

-আমি বলতে চাইছি যে, এই আড্ডা দেওয়া, মেয়েদের নিয়ে আলোচনা আর নাটক নভেল পড়ে আমরা বৃথা সময় কাটিয়ে দিচ্ছি। একটা কাজের কাজ কিছু করা উচিত। এরপর বুড়ো হয়ে গেলে আর অনুশোচনা ছাড়া কিছু করার থাকবে না—

বার্ধক্যের কথা ভাবিয়া কেহ যে খুব একটা ভয় পাইল এমন নহে। যৌবন সময়টাই এমন, যখন কেবল জীবনের আশাব্যঞ্জক দিকটি চোখে পড়ে।

www.bengaliebook.com

কোনো কিছু যে ফুরাইয়া যাইবার সম্ভাবনাও আছে সেটা চট করিয়া মনে আসে না।

অভয় জিজ্ঞাসা করিল–তোর মাথায় কোনো প্ল্যান আছে?

শিবদাস বলিল–আছে।

–কি?

–আমরা গরিব ঘরের ছেলেমেয়েদের জন্য নাইট স্কুল খুলতে পারি। এই আমাদের শহরেই কত ছেলেমেয়ে ইস্কুলে যায় না, তাদের বাবা-মায়ের ছেলেপুলেকে পড়াশুনো শেখাবার পয়সা নেই। আমরা বন্ধুরা মিলে তাদের লেখাপড়া শেখাতে পারি

কথাটা সবারই মনে ধরিল। বিকালে আড্ডা না দিয়া পড়াইলে মন্দ কি? সবাই মিলিয়া দেশের কাজও করা হইবে, আবার পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে গল্পগুজবও করা যাইবে।

কাজল বলিল–কাজটা ভালো। কিন্তু এর ইনিশিয়েটিভ কে নেবে?

শিবদাস বলিল–আমি নেবো। তুমি এবং অন্যরাও নেবে। আরে, এ কাজ শুরু করতে কী আর এমন হাতিঘোড়া লাগবে? আমরা সবাই দু-টাকা করে চাঁদা দিলেই একগাদা ধারাপাত, ফার্স্টবুক আর খাতা-পেনসিল হয়ে যাবে। ইস্কুলের ছেলেদের কাছে পুরোনো বইপত্রও কিছু চেয়ে নেবো

সুভাষ বলিল–আর ব্ল্যাকবোর্ড? পুরোনো ব্ল্যাকবোর্ড তো আর চেয়ে আনা যায় না!

ম্যাকবোর্ড এখন কি হবে? শুরুতে ওসবের দরকার নেই। তোমরা শুধু বল প্রত্যেকে সপ্তাহে দু-দিন করে সন্ধেবেলা এমদান করতে রাজি কিনা?

সকলেই রাজি। অভয় বলিল—কিন্তু জায়গা কোথায়? পড়াবো কোনখানে?

এটি জরুরি সমস্যা বটে। সেদিন বিতর্ক করিয়া কোনো সমাধান খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। দিনপাঁচেক বাদে শিবদাস সান্ধ্যআড্ডায় ঘোষণা করিল—ওহে, নাইটস্কুলের জায়গা পাওয়া গিয়াছে

অভয় বলিল—খুব ভালো কথা, কোথায়?

—সরকারদের বাড়ির বারান্দায়। দোমহলা বাড়ি, লোকজন সব ভেতরে থাকে। সদর বাড়ির বারান্দায় কেবল বুড়ো রামযদু সরকার, নেড়ার বাবা আর কানাই চাটুজ্যে—এরা মিলে দাবার আড্ডা বসায়। তা সে আসর বসে রাত্তির ন-টায়, চলে দেড়টা দুটো অবধি। আমরা স্কুল করবো সন্ধে ছটা থেকে সাড়ে-সাত কি আটটা পর্যন্ত। কাজেই তাদের অসুবিধে হবার কথা নয়। রামযদু সরকারকে বলে-কয়ে রাজি করিয়েছি। সামনের মাসের পয়লা তারিখ থেকে স্কুল চালু করে দাও-

খাতাপত্র ধারাপাত ইত্যাদির ব্যবস্থা হইয়া গেল এবং অচিরেই সরকারবাড়ির বারান্দায় নিয়মিত নাইটস্কুল বসিতে লাগিল।

প্রথম দিন একটি ছোটমতো সভা করিয়া স্কুলের উদ্বোধন হইল। রামদু সরকারের বাড়ি, কাজেই তাঁহাকে সভাপতি করা হইল। আর আসিলেন স্থানীয় বিদ্যালয়ের হেডপণ্ডিত। দু-একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকও আসিলেন। ছেলেরা আরও অনেককে বলিয়াছিল, কিন্তু প্রায় সবাই একটা না একটা কাজ দেখাইয়া এড়াইয়া গেলেন। হেডপণ্ডিত বলিলেন—বিদ্যাদান অতি পুণ্যকর্ম।

তিনি স্বয়ং এই পথে বিগত পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরিয়া পুণ্যার্জন করিয়া আসিতেছেন। ছেলেরা যে গতানুগতিক প্রমোদে মত্ত না হইয়া দেশের মানুষকে শিক্ষাদানের ব্রত লইয়াছে, ইহাতে তিনি আনন্দিত বোধ করিতেছেন। ইস্কুলটি টিকিয়া থাকুক—ঈশ্বরের কাছে তাঁর এই প্রার্থনা।

রামযদু সরকার জীবনে জনসভায় কিছু বলেন নাই। তিনি বলিলেন—ছেলেগুলিকে তিনি চেনেন, ইহারা সবাই খুব ভালো। কাজেই যে কাজ তাহারা করিতে চলিয়াছে তাহাও যে ভালো তাহাতে তাহার সন্দেহ নাই। তবে রাত্রিতে তাহাদের দাবার আচ্ছাটি বিশ বৎসরেরছেলেরা আড়ার সময় হইবার পূর্বেই যেন বারান্দা ছাড়িয়া দেয়।

সমবেত জনসাধারণকে হরি ময়রার দোকানের সিঙাড়া আর অমৃতি খাওয়াইয়া সভার সমাপ্তি হইল।

কাজল ও তাহার বন্ধুরা শহরের নিম্নবিত্ত অধিবাসীদের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া ইস্কুলের কথা প্রচার করিয়া আসিয়াছিল। প্রথমদিন জনা দশ-বারো ছাত্র-ছাত্রী পড়িতে আসিল। ইহাদের মধ্যে কেহ বর্ণপরিচয়হীন, কেহবা শহরের ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে পড়ে, গৃহশিক্ষক রাখিবার সঙ্গতি নাই বলিয়া নাইটস্কুলে পড়া দেখিয়া লইতে আসে।

প্রতি সপ্তাহেই দুই-একজন করিয়া ছাত্র বাড়িতে লাগিল। কাজল হিসাব করিয়া দেখিল এই হারে ছাত্রসংখ্যা বাড়িতে থাকিলে মাস দুয়েকের মধ্যে সরকারদের বারান্দায় আর কুলাইবে না। আচ্ছা, প্রয়োজন হইলে বরং তাহাদের বাড়ির বাহিরের ঘরে স্কুলের একটা ব্রাঞ্চ খোলা যাইবে।

একমাস সগৌরবে স্কুল চলিল।

www.bengaliebook.com

একদিন সন্ধ্যাবেলা সবে স্কুল বসিয়াছে, কাজল ছাত্রদের কী একটা টস দিয়া একটু পায়চারি করিবে বলিয়া বারান্দা হইতে নামিয়াছে, এমন সময় একজন লোক আসিয়া তাহাকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল।

লোকটির চেহারা বিশাল, প্রথম দেখিলে মনে হয় একসঙ্গে বুঝি চার-পাচজন মানুষকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। পরনে খাটো ও মোটা ধুতি, গায়ে খাকি রঙের ফতুয়া জাতীয় জামা। হাতপাগুলি মোটা শারে গুড়ির মতো। আঙুল দেখিলে মনে হয় যেন একহড়া মর্তমান কলা ঝুলিয়া আহে। মুখে প্রচুর দাড়িগোঁফের জঙ্গল।

লোকটি আবার কাজলকে হাতজোড় করিয়া নমস্কার করি।

কাজল জিজ্ঞাসা করিল-কি চাই ভাই তোমার?

লোকটা ভাঙা ভাঙা হেঁড়ে গলায় বলিল-শুনলাম শহরে লিখাপড়া জানা খোকাবাবুরা ইস্কুল খুলেছে-গরিব আর বুঢ়া লোকেদের পড়া শিখাবে বলে, এইটা কি সেই ইস্কুল?

কাজল একটু অবাক হইল। এসব খোজে এই লোকটার কী প্রয়োজন? সে বলিল-হা, এটাই। তুমি কিছু বলবে?

লোকটা বিনয়ে ঘাড় নিচু করিয়া মৃদুস্বরে (সিংহের পক্ষে তাহার গর্জনকে যতটা মৃদু করা সম্ভব) বলিল—হাঁ বাবু। আমি লেখাপড়া শিখবো।

কাজল বিস্মিত হইয়া লোকটার দিকে তাকাইয়া রহিল। বলে কী! ইহার বয়েস দেখিয়া যতদূর মনে হয়, পঞ্চান্নর কম হইবে না। কথার টানে বোঝা যায় বাঙালিও নয়। তাহার উপর এই মনোহর আকৃতি! ইহাকে পড়াইতে রীতিমত বুকের পাটা দরকার। ছাত্র অবাধ্যতা করিলে পাড়াসুদ্ধ লোক ঠেকাইতে

www.bengaliebook.com

পারিবে কিনা সন্দেহ। সর্বনাশ! লোকটির এরুপ ভয়ানক দুর্বুদ্ধি হইল কেন? আরও কত কাজ তো করিতে পারিত?

কাজল একবার সেঁক গিলিযা বলিল–লেখাপড়া শিখবে? ইয়ে–সে তো খুব আনন্দের কথা। তবে হয়েছে কী–মানে, তোমার আবার একটু বয়েস হয়ে গিয়েছে মনে হচ্ছে কিনা–এই বয়েসে কী–

লোকটা কাজলের দুই হাত ধরিয়া মিনতির স্বরে বলিল–খোখাবাবু, আমি বিনতি করছিআমাকে পড়াও। বেশি না, থোড়া শিখলেই হবে। ভগওয়ান তোমার মঙ্গল করবেন।

কাজলের অদ্ভুত লাগিল। লোকটির বিশাল, কুদর্শন ও বৃঢ় প্রচ্ছদের অন্তরালে একটি সরল এবং কোমল অন্তঃকরণ যেন উঁকি দিতেছে। সে জিজ্ঞাসা করিল–তোমার নাম কী? কোথায় থাকো?

-বাবু, আমার নাম সিংহাসন, বাড়ি চম্পারণ জিলা। এখানে আমি ইস্টেশনে কুলিব কাম করি-থাকি বুড়য়া সিংয়ের বস্তিতে। একা। বাড়ির সবাই থাকে দেশের গ্রামে। আমাকে পড়াও বাবু, আমি ধেয়ানসে পঢ়বে-

কাজল ফাঁপরে পড়িল। অজ্ঞানতিমিরে নিমজ্জিতকে আলোকশিখা দেখাইবার জন্য স্কুল খুলিয়াছে, এখন এই বিদ্যোৎসাহী প্রৌঢ় ছাত্রকে বিমুখ করে কী করিয়া? অথচ ইহার আকার-প্রকার দেখিয়া মনে হয় কাজলের, জীবদ্দশায় বর্ণপরিচয় শেষ হইয়া উঠিবে না।

সে বলিল–আচ্ছা, সে হবে এখন। তুমি এসে এইখানে বোসো আগে, তোমার সঙ্গে একটু আলাপ করি

সিংহাসন বারান্দার একপ্রান্তে সসঙ্কোচে বসিল। কাজল চেয়ারে এবং সিংহাসন মাটিতে বসিয়াছে, তাহা সত্ত্বেও সিংহাসনেব মাথা প্রায় তাহার মাথার কাছে উঠিয়া আসিয়াছে। জোয়ান বটে লোকটা।

কাজল বলিল—তুমি হঠাৎ লেখাপড়া শিখতে চাও কেন?

কিছুক্ষণ কী ভাবিয়া শেষে সিংহাসন বলিল—আপনার কাছে শরম করে আর কী হবে? বলেই ফেলি। আমার দুই শাদি বাবু—পহলা অওরতের বাচ্চাকাচ্চা হল না। তখন আমি করলো কী, এটা একটু খারাপ কাম হয়েছিল—আমি আর একটা শাদি করলো। দুসরা বিবির একটাই লেড়কা, তার বয়েস এখন পহ সাল। হেলেটাকে বাবু আমি বুকে করে মানুষ করলাম, বপন থেকে যা চাইলে তাই দিলাম—কিন্তু মহার পাজি লৌভাদের সঙ্গে মিশে ছেলেটা বিগড়ে গেল। দুমাস আগে মুলুক গিয়েছিলাম। একদিন হেলে আমার সঙ্গে ঝগড়া করে বলল-তোকে বাপ বলতে শরম হয়। তুই তো অপড় কুলি আছিস, ফালতু আদমি! ভাবুন খোখাবাবু, আমার নিজের লেড়কা আমাকে অপড় আর কুলি বলে গালি দিল। গুসসা করে আমি মুলুক থেকে চলে এসেছি। এখন আমি লিখাপড়া শিখে নিজের হাসে ছেলেকে একটা চিঠি লিখতে চাই। উফ্! আমার লিখা চিঠি পেলে ছেলে কেমন অবাক হয়ে যাবে ভাবুন তো বাবু! তখন সে আর আমাকে ফালতু আমি বলতে সাহস পাবে না—

কাজলের অবশ্য মনে হইল সিংহাসন অপেক্ষা তাহার ছেলেরই শিক্ষার প্রয়োজন বেশি এবং সিংহাসন নিজে বিদ্যার্জনের উদ্যোগ না করিয়া উক্ত পুত্রের দুইপাটি দাঁত ভাঙিয়া দিলে শিক্ষাটা সম্পূর্ণ হইত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে এই ভয়ালদর্শন অথচ নিরীহ ও সরল মানুষটির প্রতি কেমন একটা আকর্ষণ অনুভব করিল। সে বলিল-আচ্ছা, আমি তোমাকে পড়াবো। কাল সন্ধেবেলা স্লেট আর পেনসিল নিয়ে চলে আসবে-

সিংহাসন যথার্থ খুশি হইয়া বলিল–রামজী আপনার মঙ্গল করুন। বেশি না বাবু, সির্ফ একটা চিঠি লিখবার মতো শিখালেই হবে–

–তোমাকে কিন্তু বাংলা শিখতে হবে, আমি হিন্দি জানি না

-ঠিক আছে বাবু। মহল্লায় বাঙালি মাষ্টরবাবু আছে। ছেলে তাকে দিয়ে পড়িয়ে লিবে। সে আরও ভালো হবে, আমার দেশে কোনো হিন্দুস্তানী বাংলা লিখতে জানে না

পরের দিন হইতে সিংহাসন নিয়মিত স্কুলে আসিতে আরম্ভ করিল। তাহার অধ্যবসায় দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। পুরা দুইঘণ্টা সে একটুও নড়ে না, বসিয়া বসিয়া স্লেটের ক-খ-এর উপর দাগা বুলায়। প্রথমদিকে তাহার অল্পবয়স্ক সহাধ্যায়ীরা ব্যাপার দেখিয়া হাসি চাপিতে পারে নাই। তাহাদের হাসি ও কোলাহলে পড়াশুনার অসুবিধা হয় বলিয়া আজকাল সিংহাসন স্কুলে একঠোঙা সস্তা লজেন্স লইয়া আসে। ছেলেপুলেরা গোলমাল শুরু করিলেই সিংহাসন দরাজ হাতে লজেন্স বিতরণ করিতে থাকে। কোলাহল অচিরেই থামিয়া যায়।

সিংহাসন এক হাঁটু পাতিয়া এবং এক হাঁটু তুলিয়া অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসে। সামনে মাটির উপর স্লেট রাখিয়া অবিচলিত ধৈর্যের সঙ্গে বর্ণমালা লেখা অভ্যাস করে। কখনও বা বর্ণপরিচয়ের পাতা খুলিয়া অক্ষরগুলির উপর মোটা মোটা আঙুল রাখিয়া ভারি গলায় পড়িতে থাকে–কো, ক্ষো, গো–

কিন্তু সবার সবকিছু হইবার নহে। কেবলমাত্র আগ্রহ থাকিলেই কেহ ইচ্ছামত শিক্ষালাভ করিতে পারে না–সেক্ষেত্রে প্রবণতার প্রশ্ন আছে। কিছুদিন যাইবাব পর কাজল বুঝিতে পারিল লেখাপড়া জিনিসটা সিংহাসনের হইবার নহে। কিন্তু বেচারার এমন আকুলতা–তাহাকে মুখেব উপর নিষ্ঠুর সত্য কথাটা

www.bengaliebook.com

বলিতে বাধে। বিশেষ করিয়া লজেন্স বিতরণের মাধ্যমে তরুণ সহপাঠীদের নিকট সিংহাসন যেরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে তাহাতে সে বিদায় লইলে ইস্কুল টিকিবে কিনা সন্দেহ। বরং যেমন চলিতেছে চলুক। মন্দ কী, ইহাতে কাহারও ক্ষতি নাই। লোকটি নেশাভাঙ না করিয়া অন্তত একটা ভালো জিনিস লইয়া আছে।

একদিন কাজল সিংহাসনের বাড়ি দেখিতে গেল।

রেলওয়ে স্টেশনের পাশ দিয়া ফিডার বোড় বাহির হইয়া জেলাশহরে যাইবার বড়ো রাস্তায় মিশিয়াছে। ফিডার রোডের ধারে বুড়য়া সিংয়ের বস্তি, সেখানে গিয়া,সিংহাসনের নাম করিতেই একজন তাহার ঘরটা দেখাইয়া দিল। সমস্ত বস্তিটা ছোট ছোট নিচু খোর চালের ঘর লইয়া প্রস্তুত, তাহারই একটায় সিংহাসন থাকে।

ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া নাম ধরিয়া ডাকিতেই সিংহাসন বাহির হইয়া কাজলকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল।

–খোখাবাবু আপনি! কী ব্যাপার খোখাবাবু?

–কিছু না সিংহাসন, এমনি, তোমার বাড়ি আসতে ইচ্ছে ছিল, চলে এলাম।

সিংহাসন খুশিতে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল। ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া সে কাজলকে একটা জলচৌকির উপর বসিতে দিল। বস্তির মধ্যে হইলেও ঘরখানি বেশ পরিষ্কার। একদিকে একটি দড়ির চারপাই, তাহার উপর একটি চাদর ও বালিশ–দুইটিই ফরসা করিয়া কাঁচা। ঘরের অপর প্রান্তে অনুচ্চ কাঠের বেদির উপরে সিরলিপ্ত রামসীতার পট। এককোণে ঝকঝকে করিয়া মাজা একটি পেতলের ঘটি ও কয়েকটি থালাবাসন।

কাজল বলিল–বাঃ, বেশ ঘর তোমার। বেশ পরিষ্কার করে রেখেছো

–আমি নোংরা দেখতে পারে না খোখাবাবু। বাইরেটা যার নোংরা, তার ভেতরটা সাফা হোয়। উ বাত ছোড়ো, কী খাবে বোলো–

-আমি কিছু খাবো না সিংহাসন, তুমি ব্যস্ত হোয়ো না–

সিংহাসন সে কথা শুনিবার পাত্র নহে। ব্রাহ্মণ অতিথি, অন্য কিছু খাইতে আপত্তি করিবে ভাবিয়া পাড়ার একটা ছেলেকে দিয়া খাঁটি গরুর দুধ আনাইয়া নতুন মাটির ভাঁড়ে করিয়া খাইতে দিল। বলিল–আমি গরিব লোক, আজ এই দিলাম। এবার দেশে গেলে তোমার জন্য পেঁড়া নিয়ে আসবো-আমাদের দেহাতে খুব আচ্ছা পেঁড়া তৈরি হয়–

দুগ্ধপান করিতে কবিতে কাজল বলিল–তুমি রাত্তিরে কী খাবে সিংহাসন?

সিংহাসন একগাল হাসিয়া বলিল-আমি আর কী খাবে? সেরভর আটা দিয়ে ছ-খানা রোটি বানাবো, করেলার ভাজি করবো আর রহড়ের দাল-এই খাবো।

কাজল অবাক হইয়া বলিল–একসের আটায় ছ-খানা রুটি! বলো কী?

–হাঁ বাবু। বাঙালি রোটি না-হামাদের বেহারী রোটি, বহুৎ মোটা আর পয়দাওয়ালা। পাতলা বাঙালি রোটি খেলে হামার পেট ভরে না।

সিংহাসন অবিচল ধৈর্যের সঙ্গে পড়াশুনা চালাইতে লাগিল। দুই-তিনমাস কাটিয়া গেল, এখনও সে ক-খ লিখিতে শিখিল না। কিন্তু তাহার নিষ্ঠা দেখিয়া কাজলের আশঙ্কা হইল, একদিন হয়তো বা সে সত্যই লেখাপড়া শিখিয়া ফেলিবে।

www.bengaliebook.com

অকস্মাৎ একদিন সিংহাসন পড়িতে আসিল না।

ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত, কারণ অসহ্য গরম বা ঝমঝম বৃষ্টি কোনোটাই এতদিন সিংহাসনকে ঠেকাইতে পারে নাই। বগলে স্লেট-পেন্সিল লইয়া সে নির্দিষ্ট সময়ে স্কুলে আসিয়া হাজির হয়। প্রথমদিন কাজল ভাবিল বোধহয় তাহার অসুখ করিয়াছে। কিন্তু পরপর দুই তিনদিন তাহার অনুপস্থিতির পর কাজল চিন্তিত হইয়া পড়িল। কী হইল মানুষটার? একবার খোঁজ করা দরকার।

সেদিন সন্ধ্যায় স্কুলে কাজলের ক্লাস ছিল না, হাঁটিতে হাঁটিতে সে বুড়য়া সিংয়ের বস্তিতে গিয়া হাজির হইল। হ্যাঁ, ওই তো নিজের ঘরের সামনে হাঁটুর উপর থুতনি রাখিয়া সিংহাসন বসিয়া আছে-তাহার গায়ে লাল কুর্তা, লাইসেন্সওয়ালা কুলিদের ইউনিফর্ম। কাছে গিয়া সে বলিল–কী সিংহাসন, পড়তে যাচ্ছ না যে?

সিংহাসন ঘোলাটে লাল চোখে একবার কাজলের দিকে তাকাইয়া আবার পূর্ববৎ বসিয়া রহিল। তাহার দৃষ্টি দেখিয়া মনে হইল না সে কাজলকে চিনিয়াছে।

এ আবার কী কাণ্ড! লোকটা নেশা করিয়াছে নাকি? কিন্তু এ কয়দিনে সে যতটা বুঝিয়াছে তাহাতে সিংহাসন নেশা করিবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। তবে?

আরও দুই-একবার ডাকাডাকি করিয়াও কাজল সাড়া পাইল না।

–বাবুজি!

www.bengaliebook.com

কাজল দেখিল, বস্তিরই একজন প্রৌঢ় হিন্দুস্থানী অধিবাসী তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। লোটা বলিল-বাবুজি, আপনি আমার সঙ্গে এদিকে আসুন–

ব্যাপার কিছু বুঝিতে না পারিয়া কাজল তাহার সঙ্গে একটু দূরে গিয়া দাঁড়াইল।

-বাবুজি, আপনি কী সিংহাসনের কাছে এসেছেন?

–হ্যাঁ। কী হয়েছে ওর? কথা বলছে না কেন?

প্রৌঢ় লোকটি মাথা নিচু করিয়া বলিল–সিংহাসনের দেশ থেকে খবর এসেছে। চেচক হয়ে ওর ছেলেটা মারা গিয়েছে। আজ চারদিন ওইরকম বসে আছে বাবুজি, খাচ্ছে না, শুচ্ছে না–

কাজলের বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি দিয়া আঘাত করিল। চেচক-মানে বসন্ত হইয়া সিংহাসনের ছেলে মারা গিয়াছে! বেচারা সিংহাসন, প্রৌঢ় বয়েসের সন্তান-এ ধাক্কা সামলাইয়া ওঠা কঠিন হইবে। সে দূর হইতে তাকাইয়া দেখিল–সিংহাসন পাথরের মূর্তির মতো চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

কয়েকদিন পরে কাজল খবর পাইল দেশ হইতে লোক আসিয়া সিংহাসনকে বাড়িতে লইয়া গিয়াছে। আর হয়তো তাহার সহিত দেখা হইবে না।

চম্পারণ জেলার অশিক্ষিত হিন্দুস্থানী কুলি। কিন্তু তাহার সারল্য এবং গভীর নিষ্ঠা কাজলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। অকারণ সৎ মানুষ ভাগ্যের হাতে এইরূপ নিষ্ঠুর শাস্তি পায় কেন? শোকগ্রস্ত সিংহাসনের কথা ভাবিয়া তাহার ভারি দুঃখ হইল।

www.bengaliebook.com

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কাজলের মনের মধ্যে একটা বিচিত্র অস্থিরতা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছিল।

কিছুই করা হইতেছে না, অথচ অমোঘ গতিতে সময় কাটিয়া যাইতেছে। এক-একদিন বিছানায় শুইয়া অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করিবার পরেও ঘুম আসে না। বালিশে কান পাতিলে নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ ধ্বক ধ্বক করিয়া জানাইয়া দেয়–সময চলিয়া যাইতেছে। সারাদিনের কর্মব্যস্ততা আর কোলাহলের ভিতর সে নিজের মুখোমুখি হইবার সুযোগ পায় না, কিন্তু রাত্রিবেলা দিনের সমস্ত কাজ ফুরাইয়া আসিলে নৈশ স্তব্ধতার একান্ত মুহূর্তগুলিতে তাহার মনে হয় জীবনে অনেক কিছু করিবার আছে, জীবন-মৃত্যু-অস্তিত্বের যে কুয়াশাচ্ছন্ন উত্তরহীন প্রশ্নের জগৎ–সেখানে আগ্রহের মশাল জ্বালিয়া ভ্রমণের প্রয়োজন আছে। দেরি হইয়া যাইতেছে, অথচ কীভাবে অগ্রসর হইতে হয় তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

একদিন কলেজের এক বন্ধুর কথায় তাহার মনে খুব আঘাত লাগিল।

প্রাণতোষ ছেলেটাকে কাজলের কোনোদিনই বিশেষ পছন্দ হইত না। এক ধরনের মানুষ আছে যাহারা পৃথিবীর সবকিছুর বিরোধিতা করিযা আনন্দ পায়। প্রাণতোষ সেই ধরনের লোক। সে সোচ্চারে নিজের মত জাহির করিয়া থাকে, তাহার মতামত কাহাকেও আঘাত কবিতেছে কিনা সে বিষয়ে তাহার কোনো পরোয়া নাই। বিখ্যাত ব্যক্তিদের মহাপুরুষত্ব সম্বন্ধে সে অকাতরে সন্দেহ প্রকাশ করে, সবার যে বিষয়ে স্বাভাবিক শ্রদ্ধা আছে সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ কটু কথা বলিয়া সে চমক সৃষ্টি করিয়া থাকে। প্রতিষ্ঠিত সমস্ত ধ্যানধারণাকে ভালোমন্দ নির্বিশেষে সে আঘাত করিতে উদ্যত, অনেকেই তাহাকে বীর ও সংস্কারক বলিয়া ভুল করে, কাজেই অপ্রিয়বাদী প্রাণতোষেরও একটি ভক্তের দল ছিল।

অফ পিরিয়ডে কাজল একদিন কমন রুমে বসিয়া বই পড়িতেছে, এমন সময় কোথা হইতে প্রাণতোষ আসিয়া উপস্থিত। এককোণে কাজলকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে প্রশ্ন করিল–কী অমিতাভ, ক্লাস নেই?

বই হইতে মুখ তুলিয়া কাজল বলিল–না, এস.বি. আজ আসেন নি-

-কী পড়ছে ওখানা? ক্লাসের বই?

কাজল প্রাণতোষকে বিলক্ষণ চেনে, কিন্তু মিথ্যা বলিয়াও লাভ নাই–সে হয়তো এখনই বইখানা দেখিতে চাহিবে। একটু ইতস্তত করিয়া সে বলিল-না, ক্লাসের বই নয়। বিংহ্যাম মাচু-পিছু আবিষ্কার করার পর যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন সেটা পড়ছি।

প্রাণতোষ মুখের একটা বিচিত্র ভঙ্গি করিয়া বলিল–মাচু-পিচ্চু আবার কী?

–স্প্যানিয়ার্ডদের তাড়া খেয়ে ইকারা পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছিল জানো তো? সেই যে-কর্টেজ আর পিজারোর ব্যাপার। তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। আন্ডিজের গোলকধাঁধার মধ্যে কোথায় তারা নতুন করে বসতি স্থাপন করেছিল এতদিন তা জানা ছিল না। বিংহ্যাম সাহেব এই শতাব্দীর প্রথম দিকে ইনকাদের সেই গোপন শহর খুঁজে বার করেন, সেই হল মাচু-পিছু।

প্রাণতোষ তাচ্ছিল্যের সুরে বলিল-তোমার খালি ওইসব পড়া! আরে কোথায় কোন সাহেব কী আবিষ্কার করেছে তা জেনে কী হবে বলতে পারো? আমাদের দেশেও তো পণ্ডিত রয়েছে, তাদের আবিষ্কারের মূল্য কী কম?

কাজল অবাক হইয়া বলিল–সে কথা কে বলেছে? তুমি কী বলতে চাও?

-তোমাকে সব সময় বিদেশী বইপত্র পড়তে দেখি। এটা একরকমের স্বজাতিবিরোধ।

কাজল রাগ করিতে গিয়াও হাসিয়া ফেলিল বলিল–প্রাণতোষ, আসলে তুমি তর্ক করতে ভালোবাসা, নইলে এক সামান্য কাবণে এত গুরুতর অভিযোগ করতে না

কাজলের হাসি দেখিয়া প্রাণতোষ চটিয়াছিল, তাছাড়া নিজেকে সে কঠোর যুক্তিবাদী মনে করিয়া থাকে। কাজেই সে রূঢ়স্বরে বলিল–আমি যে অর্থে কথাটা বলেছি তুমি ধরতে পারোনি। আসলে পরাধীন থেকে থেকে আমাদের ভেতরে সাহেবদের সবকিছু দেখে মুগ্ধ হবার একটা প্রবণতা দাঁড়িয়ে গিয়েছে। সাহেবদের বই ভালো, গবেষণা উঁচুদরের, তাদের পোশাক আশাক ভালো–আর আমাদের সমস্তই ফাঁকি-

–ইংরেজি বই পড়লে কী তাই প্রমাণিত হয়?

–সবসময় ইংরেজি বই পড়লে তাই মানে দাঁড়ায বটে। বাংলায় কী ভালো বই লেখা হয়নি? এটা দাসত্বসুলভ মনোভাবের প্রকাশ।

এবার কাজলও চটিল, সে বলিল–দেশের সাহিত্যের কথা বলছো? আমি তো দু-বকমই পড়ি। তুমি কী কী পড়েছো?

প্রাণতোষ থতমত খাইয়া গেল।

কাজল আবার বলিল–কৃষ্ণচরিত্র পড়েছ? প্রভাতবাবুর গল্প আর উপন্যাস? রবি ঠাকুরের কী পড়া আছে?

www.bengaliebook.com

প্রাণতোষ জেদের গলায় বলিল--রবীন্দ্রনাথ আমি অনেক পড়েছি-

-ওরকম বললে হবে না। আমি এঁদের বই প্রায় সবই বহুবার করে পড়েছি। কাজেই আমার অন্য বইও পড়বার অধিকার আছে।

কমনরুমে দুই-একজন করিয়া ছেলের ভিড় বাড়িতেছিল। তাহাদের মধ্যে প্রাণতোষের ভক্তরা কেহ কেহ রহিয়াছে। গরম আরহাওয়ার আভাস পাইয়া তাহারা অন্যদিকে তাকাইয়া থাকিবার ভান করিয়া তর্ক শুনিতে লাগিল। ভক্তদলের সামনে অপদস্থ হইবার আশঙ্কায় প্রাণতোষ মরীয়া হইয়া উঠিল। সে বলিল–কেবল বই পড়ার জন্যই বলছি না, তোমার রুচির মধ্যে একটা □□□□□□□□□ আছে, সেটা মানো তো?

কাজল বই মুড়িয়া রাখিয়া বলিল–কী রকম?

–মানুষের জীবনটা গোলাপফুল দিয়ে বানানো শয্যা নয়, এখানে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে হয়। সেই বাস্তবের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তুমি সারাদিন নক্ষত্রজগৎ আর পামীরের মালভূমি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করো–এটা এসকেপিজম নয়?

-কিন্তু এই বিশ্বের সবটাই তো ফিজিক্যালি বাস্তব, কাজেই তা নিয়ে ভাবনাচিন্তায় দোষ কোথায়?

প্রাণতোষ ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিল–তুমি বুঝবে না। যাদের কঠোর পরিশ্রম করে উদরান্নের সংস্থান করতে হয় তাদের কাছে ডাল-ভাতের জগৎটা অনেক বেশি বাস্তব। মহাশূন্যে কখানা নক্ষত্র জন্মালে কী মরলল, কিংবা আফ্রিকার জঙ্গলে কী কী প্রাণী পাওয়া যায় এসব খবরে তাদের প্রয়োজন নেই-

এখানে কাজল রাগের মাথায় একটা ভুল করিল, সে বলিল-দেখ প্রাণতোষ, বাস্তব জিনিসটার অনেক aspect আছে। অ্যাবসলিউট বাস্তব বলে তো কিছু হয় না। প্রতিদিনের ডালভাত-চচ্চড়ি খাওয়ার সাধারণ জীবনটা যেমন বাস্তব, তেমনি এই বিশাল জগতের দূরতম কোণে যা ঘটছে তাও আমার কাছে বাস্তব। তা নিয়ে চর্চায় কোনো অন্যায় আছে বলে মনে করি না-

প্রাণতোষ বলিল—আমি ঠিক সেই কথাটাই বলতে চাচ্ছি, তুমি আমার কথাটাই বললে। ওই জগৎটা তোমার কাছে বাস্তব, কিন্তু পৃথিবীর কোটি কোটি সাধাবণ মানুষের কাছে নিতান্ত অলীক। হয়েছে কী অমিতাভ, আমি একথা বলছি বলে রাগ কোরো না—সত্যের খাতিরে বলতেই হচ্ছে— ইউ হ্যাভ বীন বর্ন উইথ এ সিলভার স্পুন ইন মাউথ! কালকের খাবার কোথা থেকে আসবে এ চিন্তায় তোমাকে ছটফট করতে হয় না—কাজেই তোমার পক্ষে রঙিন কল্পনায় বিভোর থাকতে অসুবিধে নেই। তুমি হচ্ছ গিয়ে প্রিভিলেজড় শ্রেণীর লোক। তাছাড়া যেসব লোকের বই পড়ে পুলকিত হচ্ছে তাদের মতো কিছু করে দেখাতে পারলেও বুঝতাম। তাও তুমি পারবে না, কারণ প্রিভিলেজড় জীবনযাপন করে ইউ হ্যাভ গন সফ্‌ট্—

কাজলকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া প্রাণহোষের ভক্তেব দল ধরিয়া লইল কাজল তর্কযুদ্ধে হারিয়া গিয়াছে। তাহারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কাছে আসিয়া বসিল।

এ ধরনের আলোচনার উপর কাজল বিশেষ গুরুত্ব দিয়া থাকে। সারাদিন ধরিয়া তাহার মন বিষণ্ণ হইয়া রহিল। প্রাণতোষ কিছুটা তর্কের জন্যই তর্ক করিয়াছে, তাহার যুক্তিগুলি বেশিব ভাগই নড়বড়ে এবং তাহার ভিতর আক্রমণের ইচ্ছাই সুস্পষ্ট—তবু প্রাণতোষের কথার মধ্যে কিছু সাববত্তা আছে তাহা সে অনুভব করিতে পারিল। সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবন সম্বন্ধে প্রাণতোষ যাহা বলিয়াছে তাহা শোনা কথা মাত্র, দারিদ্র এবং সংগ্রাম কাহাকে

www.bengaliebook.com

বলে প্রাণতোষ তাহার কী জানে? তাহার বাবা এই কলিকাতা শহরে প্রথম যৌবনে কী ভয়ানক দারিদ্রের সহিত সংগ্রাম করিয়াছে। কোনোদিন খাইযাছে, কোনোদিন খাইতে পায় নাই। থাকিবার জায়গা ছিল না, পড়িবার খরচ ছিল না—তাহা সত্ত্বেও বাবা সুদূরের স্বপ্ন দেখিয়াছে, লেখক হইয়া উঠিয়াছে। আর প্রাণতোষ, ক্রিমিনাল কোর্টের বিখ্যাত উকিলের ছেলে—পাঞ্জাবি আর পাম্পশু পায়ে কলেজে আসিয়া কথায় কথায় সিগারেট খায়-শখের মানবদরদ দিয়া সে কী বুঝিবে সংগ্রাম কাহাকে বলে? কাজল বুঝিল সমস্ত তর্কটা প্রাণতোষের বুদ্ধির ব্যায়াম মাত্র। কিন্তু সংগ্রামের সহিত সুন্দরের সাধনায় যে কোনো বিরোধ নাই এ বিষয়ে তাহার বাবার উদাহরণটা সময়মতো মনে আসিল না। অবশ্য প্রাণতোষ নিশ্চয় একটা ভয়ানক উল্টা যুক্তি দেখাইত। ভালোই হইয়াছে বাবার কথাটা মাথায় আসে নাই। প্রাণতোষকে বিশ্বাস নাই, হয়তো একটা খারাপ কথা বলিয়া ফেলিত। বাবার সম্বন্ধে কোনো অসম্মানজনক কথা সে সহ্য করিতে পারিত না।

কিন্তু গত কয়েকদিন হইতে জীবনের সার্থকতার বিষয়ে সে নিজে যাহা ভাবিতেছে, বা প্রভাত পিকনিকের আগের দিন রাত্রে তাহাকে যে কথা বলিয়াছিল, প্রাণতোষ ঠিক সেখানে আর একবার আঘাত করিল। সে কেবলমাত্র বই পড়িতেছে আর স্বপ্ন দেখিতেছে। ইংরাজিতে যাহাকে আমচেয়ার ট্রাভেলার বলে সে তাহাতেই পরিণত হইতে চলিয়াছে নাকি? সে কী সত্যই গন সফট?

কথাটা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। তাহার বাবা প্রায় এই বয়েসে জীবনের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে নামিয়া পড়িয়াছে—কোথায় কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আর সে? সে স্তুপাকাব বইপত্র পড়িয়া অর্থহীন ইনফরমেশনের বোঝা মাথায় লইয়া ঘুরিতেছে। শুনিতে যতই খারাপ লাগুক, প্রাণতোষের কথা একেবারে যুক্তিহীন নহে।

কিন্তু সে যে জীবনের গভীর রহস্যানুভূতির দিকটা একেবারে উড়াইয়া দিতে পারে না। বর্তমান পৃথিবীটা যাহাদের আত্মত্যাগ এবং মহৎ ক্রিয়াকলাপের উপর দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের জীবনী পড়িতে তাহার ভালো লাগে। দূর সমুদ্রের বুকে চাদের আলো পড়িয়া যে স্বপ্নরাজ্যের জন্ম দেয়, নীল আকাশের বুকে উড়ন্ত দুগ্ধধবল শঙ্খচিলের কর্কশ ডাকে সে রাজ্যের আহ্বান তাহার মনের দরজায় আসিয়া কড়া নাড়ে। তাহার ঘুমের মধ্যে আফ্রিকার বিস্তীর্ণ প্রান্তর দৌড়াইয়া পাব হয় জিরাফের দল, নিস্পাদপ পেয়ারিতে আরক্ষ তৃণের গুচ্ছ কাপে নির্জন দ্বিপ্রহর ব্যাপিয়া বহমান বায়ুপ্রবাহে, আঙ্গাভা উপসাগবে ভাসমান হিমশৈলের উপর বিশ্রাম করে চিকনদেহ সীলমাছের ঝাক। আরও কত কী! এই মুহূর্তেই হয়তো ছায়াপথের অপর প্রান্তে দুইটি নক্ষত্রে সংঘর্ষ হইতেছে, কোনো অজানা গ্রহে অঙ্কুরিত হইতেছে নতুন প্রাণ। প্রাণতোষ যাহাই বলুক—এই অকারণ স্বপ্নদর্শিতাই— যাহা ডাল-ভাতের জীবনে কোনো কাজে আসে না—মানুষের সভ্যতাকে যুগে যুগে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিয়াছে।

সেদিন সকালে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া কাজলের মনে হইল—আজ দিনটা বেশ ভালো কাটিবে। কেন একথা মনে হইল তাহা সে বলিতে পারে না। কিন্তু বাড়ির সামনের নিমগাছে প্রভাতেব স্নিগ্ধ রৌদ্র, বাতাসের ঝরঝরে তাজা ভাব আর ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের বাহিরে অবস্থিত একটা বহস্যময় অনুভূতি তাহাকে জানাইয়া দিল—আজ একটি বিশেষ দিন। এগারোটায় জরুরি ক্লাস আছে বলিয়া আজ তাহাকে নটার মধ্যে বাহির হইতে হইবে। স্নান করিতে ঢুকিয়া আপনমনে সে তাহার প্রিয় একটি গান গাহিতেছিল—আজি দক্ষিণপবনে দোলা লাগিল মনে। সে লক্ষ করিয়া দেখিয়াছে, সকালবেলা কোনো একটা গানের সুর মনে আসিলে এবং কয়েকবার গুনগুন করিলে সারাদিন সেটি মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। আজও তাহাই হইল, ট্রেনে যাইতে যাইতে, কলেজে ক্লাসের ভিতর এবং কমনরুমে সে সারাদিন ধরিয়া গানটা গাহিল। কমনরুমে

www.bengaliebook.com

পাশে বসিয়া প্রভাত গ্রিস ল সম্বন্ধে ভাষাতত্ত্বের নোট লিখিতেছিল, গান শুনিয়া সে আড়চোখে কাজলের দিকে তাকাইয়া অনুচ্চস্বরে বলিল-ব্যাপার কী?

গান থামাইয়া কাজল বলিল—কিসের কী ব্যাপার?

-খুশি যে আর ধরে না! গুনগুন গান চলেছে! একবার ঝেড়ে কাশা দেখি

—কী যা তা বলছো! এমনিই সকাল থেকে সুরটা—খুশির কী দেখলে?

প্রভাত সব বুঝি গোছের মুখভাব করিয়া বলিল-দেখ ভাই, আলল, ধূপের গন্ধ, প্রেম আর বাছুরের শিং-এ যদি ভেতরে থাকে তো ফুটে বেরুবেই। এ জিনিস গোপন করে রাখা যায় না—

কাজল রাগ করিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল। প্রভাত হাসিতে হাসিতে আবার ভাষাতত্ত্বের নোট লেখা শুরু করিল।

কিন্তু সকালের অহেতুক আনন্দ যে প্রতিশ্রুতি বহন করিয়া আনিয়াছিল, সন্ধ্যা অবধি তাহা বাস্তবে রূপায়িত হইবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। সাতটা নাগাদ বাড়ি ফিরিয়া কাজল ভাবিল যাই, একটু আড্ডা দিয়ে আসি। শিবদাস-অভয় ওদের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় না-

নাইটস্কুল উঠিয়া গিয়াছে। দাবার আসর বসিতে দেরি হইতেছিল, তাছাড়া বিদ্যালয়ের বালকেরা আলস্যবশত দুরে না গিয়া বারান্দার ধারেই যথেচ্ছ প্রাকৃতিক আহ্বানে সাড়া দিত। ফলে স্থানটিতে যে আরহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাকে ঠিক বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পরিমণ্ডল বলা যায়। রামযদু সরকার নিতান্ত বিরক্ত হইয়া একদিন জানাইয়া দিলেন—যথেষ্ট হইয়াছে, আর নয়। এবার তাহারা স্কুলের জন্য অন্য স্থান দেখিয়া লইতে পারে। ছেলেদের

www.bengaliebook.com

উৎসাহও কমিয়া আসিয়াছিল। কাজেই কয়েকমাস চলিবার পর স্কুল উঠিয়া গেল।

শহরের ঘিঞ্জি বসতি ছাড়াইয়া যে পথটি নদীর দিকে চলিয়া গেল, তাহারই ধারে একটি সুপ্রাচীন বটগাছ আছে। গাছটির বয়েস কম করিয়া শ-দেড়েক বছর হইবে, অনেকখানি জায়গা ঝুরি নামিয়া অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সন্ধ্যার পর কোনো কোনো দিন এইখানে কাজল এবং তাহার বন্ধুদের আসর বসে। গলা ছাড়িয়া গান গাহিবার বা কবিতা আবৃত্তি করিবার পক্ষে এমন জায়গা আর নাই। লুকাইয়া ধূমপান করিবার জন্যও আদর্শ জায়গা বটে।

পড়ার টেবিলে বই এবং খাতা পত্র রাখিয়া কাজল আডিডায় যাইবার জন্য বাড়ির বাহির হইতেছে, এমন সময় হৈমন্তী ডাকিয়া বলিল–কী রে, খাবার খেয়ে যাবিনে? এই তো এলি, আবার কোথায় বেরুচ্ছিস?

–এই একটু কাছেই যাবো। দরকার আছে। দেরি হবে না, ফিরে এসে পড়তে বসবো। তুমি বরং এ ঘরটায় একটু ধুনো দিয়ে রেখো, বড্ড মশা কামড়ায়–

–খেয়ে যাবিনে? হালুয়া করে রেখেছি, খাবি?

–রাত্তিরে খাবোখন, বুটির সঙ্গে দিয়ো। এখন খিদে নেই–

কী মনে পড়ায় হৈমন্তী বলিল–ভালো কথা, তোর একটা চিঠি এসেছে আজ দুপুরে। পড়ার টেবিলে টেবিলক্লথের তলায় চাপা দিয়ে রেখেছি। দেখিস

–কার চিঠি মা?

–তা কী জানি! খামের চিঠি-বন্ধুবান্ধব কারও হবে–

হৈমন্তী চলিয়া গেলে কাজল আবার নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল। তাহাকে কে চিঠি লিখিয়াছে? ছুটির সময় কলেজের বন্ধুবা পুরী, দার্জিলিং বা বৈদ্যনাথ ধাম বেড়াইতে গেলে সেখান হইতে চিঠি লেখে বটে, কিন্তু এখন তো কলেজ পুরাদমে চলিতেছে। চিঠি লিখিবার মতো পরিচিত অন্য কাহারও কথা তাহার মনে আসিল না।

টেবিলক্লথের নিচে হইতে চিঠি বাহির হইল। আকাশী নীল রঙের খাম, ছয় পয়সার ডাকটিকিট আঁটা। খামের উপর ইংরাজিতে তাহার নাম ও ঠিকানা লেখা আছে। কিন্তু হস্তাক্ষর পবিচিত নহে।

খাম খুলিতেই পালা এযাব মেলের কাগজে লেখা দুই-তিন পৃষ্ঠার চিঠি। পাতা উল্টাইযা চিঠির শেষে কাহার নাম রহিয়াছে দেখিতে গিয়া কাজল অবাক হইয়া গেল। এ কাহার নাম? সে ঠিক দেখিতেছে তো?

অপালা তাহাকে চিঠি লিখিয়াছে!

উঃ, ভাগ্যিস মা চিঠিটা খুলিয়া পড়ে নাই! মায়ের সহিত তাহার সম্পর্কের কোনো আড়াল গড়িয়া ওঠে নাই, অপরের চিঠি পড়িবাব ভদ্রসমাজে যে একটা নিষেধ আছে তাহা এখানে খাটে না। অনেক সময়েই তাহার ফিরিতে দেরি হইলে হৈমন্তী অসংকোচে তাহার চিঠি খুলিয়া পড়িয়া ফেলে। অবশ্য অপালা কী লিখিয়াছে সে জানে না, হয়তো হৈমন্তী এ চিঠি পড়িলে এমন কিছু আসে-যায় না—তবু কেমন একটা সংকোচের বোধ তাহাকে চাপিয়া ধরিল।

কাজলের আর বন্ধুদের সহিত গল্প করিতে যাইবার উৎসাহ ছিল না। অন্যদিন এইসময়ে বাড়ি থাকিতে হইলে সে হাঁপাইয়া ওঠে। আজ মনে হইল—আবার কে এখন বাহির হয়! রোজ রোজ আচ্ছা ভালো লাগে না। বরং বাড়িতে বসিয়া বার্কের কনসিলিয়েশন স্পীচটা শেষ করিয়া ফেলা যাইবে।

www.bengaliebook.com

পড়ার টেবিলে বসিয়া কাজল চিঠির ভাজ খুলিল, তারপর কী ভাবিয়া উঠিয়া গিয়া দরজাটা সন্তর্পণে বন্ধ করিয়া ছিটকিনি তুলিয়া দিল।

চিঠি পড়িতে শুরু করার সময়ে কাজলের মনে হইল একমিনিট আগে অবধি তাহার জীবন যেরকম ছিল, এই চিঠি পড়ার পর আর তাহা থাকিবে না–একেবারে বদল হইয়া যাইবে। কিছুদিন আগে পড়া কোন্ এক ইংরাজি উপন্যাসের নায়ক যেন বলনাচের আসরে পঞ্চদশী মেয়রের কন্যাকে দেখিয়া ভাবিয়াছিল- Life will never □□ □□□ □□□□ □□□□□! ঠিক তেমন।

অপালা লিখিয়াছে :

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনি হয়তো ভেবেছিলেন আমি এমনি ঝোকের মাথায় ঠিকানা নিয়েছি, কিন্তু কোনোদিনই চিঠি লিখবো না। প্রথম কারও সঙ্গে পরিচয় হলে অনেকেই আগ্রহ করে ঠিকানা নেয়, যোগাযোগ রাখার সদিচ্ছা সত্যিই থাকে, কিন্তু সময় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামান্য পরিচয়ের স্মৃতি ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসে, চিঠি লেখা আর হয়ে ওঠে না। আমার ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। ছোটবেলা থেকে মাতৃভাষার চর্চায় বঞ্চিত থাকার পর এখন নতুন উৎসাহে আমি প্রচুর বাংলা চিঠি লিখে থাকি। আমার হাতের লেখাটা বিশেষ খারাপ নয়, বলুন? আর আমার বয়েসী মেয়ের আপনার বয়েসী ছেলেকে চিঠি লেখার বিষয়ে বাঙালি সমাজে যে একটা নিষেধাজ্ঞা আছে, সেটাও আমার ক্ষেত্রে খাটে না তা তো আপনাকে সেদিন বলেইছি–কারণ আমি বাঙালি সমাজ বলতে যা বোঝায় তার ভেতরে মানুষ হইনি। একদিক দিয়ে তাতে আমার উপকারই হয়েছে। মাঝে-মধ্যে ছুটিতে যখন বাংলাদেশে যাই, দেখি বাংলার মেয়েরা নানান

www.bengaliebook.com

অকারণ এবং অসহ্য সামাজিক নিয়মের বাঁধনে আধমরা হয়ে বাঁধা পড়ে আছে। তাদের মনের প্রসার নেই, চোখে দীপ্তি নেই–দেখলে এত খারাপ লাগে যে কী বলবো! তাদের দোষ নেই, শত শত বছরের সংস্কার এবং নিষেধের বাধা কাটিয়ে ওঠা দারুণ শক্তিমানের পক্ষেই সম্ভব হয়ে ওঠে না, তারা হঠাৎ কী করে পেরে উঠবে? এইসব মেয়েদের জন্য বড়ো কষ্ট হয়, পৃথিবীটা যে আসলে কত বড়ো, কত সুন্দর তা ওরা জানতেই পারলো না।

গতবার ছুটিতে বাড়ি এসে বর্ধমান জেলার এক অজ পাড়াগায়ে বাবার দূর-সম্পর্কের এক পিসিমার কাছে কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে একটি মেয়ের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। ভারি সরল মেয়েটি, এমনিতে লেখাপড়া কিছু জানে না, কিন্তু স্বভাবে একটা সহজাত বুদ্ধির ছাপ আছে। তার মধ্যে ভদ্রতা, সেবা আর অতিথিপরায়ণতা যা দেখেছি তাতে অবাক হতে হয়েছে, শহরের অনেক তথাকথিত বড়োলোকের মেয়ের মধ্যে তেমন থাকে না। এই মেয়েটি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল–আচ্ছা দিদি, পাহাড় কেমন দেখতে? আমি অনেকক্ষণ ধরে তাকে বুঝিয়েছিলাম পাহাড় দেখতে কেমন, পাহাড়ে দাঁড়িয়ে সকালবেলা সূর্যোদয় দেখতে কেমন লাগে। আরও কত গল্প করেছিলাম। মেয়েটা বলেছিল–আমার খুব ইচ্ছে করে কোথাও বেড়াতে যাই, কিন্তু কে নিয়ে যাবে বলো? এই তো সামনের বছরই বোধহয় আমার বিয়ে হয়ে যাবে, বাবা খুব চেষ্টা করছেন। তারপর সারাজীবন ভাত রান্না, কাপড়কাঁচা ছেলে মানুষ করা–আর কোনোদিন বেরুতে পারব না–

আমার এত মায়া হল! ওকে কথা দিয়ে এসেছি এবার যখন ছুটিতে যাবো, তখন ওকে দু-এক মাসের জন্য আমার সঙ্গে নিয়ে আসবো। যদি অবশ্য ততদিনে ওর বিয়ে না হয়ে যায়। কিন্তু এ তো গেল একটা মেয়ের কথা,

বাংলাদেশে এমন হতভাগ্য মেয়ে হাজার হাজার আছে। তাদের কী হবে? সবাইকে তো আমি বেড়াতে নিয়ে আসতে পারবো না?

তাই একদিক দিয়ে নিজেকে খুব ভাগ্যবতী বলে মনে হয়।

আপনাকে চিঠি লেখার আর একটা কারণ-আপনার বাবার বইগুলি আমি পড়তে শুরু করেছি। কেমন লাগছে জানতে চাইবেন নিশ্চয়। শুধু একটা কথাই বলি, তার থেকে যতটা পারেন বুঝে নেবেন। কথাটা এই-–কেবলমাত্র অপূর্বকুমার রায়ের বই পড়বার জন্যই আমার বাংলা শেখা উচিত ছিল। একটু একটু করে পড়ছি, আর দেখছি উনি যেন ঠিক আমার মনের কথাটি বলছেন। গ্রামের শান্ত, সুন্দর পরিবেশ-বাঁশবন, পাখির ডাক, সজনের ফুল–আবার তার সঙ্গে মায়ের মায়ের ভালোবাসা দিয়ে মাখা নিস্পাপ শৈশব, মাঠের ওপারে নীল দিগন্তের দিকে তাকিয়ে সুদূরের কল্পনায় মগ্ন হয়ে যাওয়া–এসব কথা এত সহজভাবে আর কে বলতে পেরেছেন? আপনার বাবার লেখা ভালো লেগেছে–এটা আপনাকে জানানো দরকার ছিল।

ছোটবেলায় বাবা একবার আমাকে স্টিভেনসনের দু-তিনখানা বই কিনে দিয়েছিলেন। ট্রেজার আইল্যান্ড পড়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। যেন কী অপার মুক্তির সন্ধান এনে দিল বইখানা! নীল সমুদ্র, নির্জন দ্বীপ, পালতোলা জাহাজে করে দুঃসাহসিক অভিযান-রাত্তিরে তো লং জন সিলভারকে কদিন স্বপ্নই দেখে ফেললাম। পৃথিবীটা ছোট নয়, শুধু আমার পরিবার, দেশ বা এই গ্রহটা নিয়ে বিশ্ব গঠিত নয়–কোটি কোটি নক্ষত্র আর নীহারিকা দিয়ে তৈরি এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের যে রূপ, তার আরছা আভাস সেই বয়েসেই যেন দূর থেকে দেখতে পেয়েছিলাম। তারপর এতদিন কত মানুষের সঙ্গে মিশেছি, কত লেখাপড়া জানা পণ্ডিতের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, কিন্তু কারও কাছে এসব কথা আর শুনিনি। সবাই সাধারণ কথা বলে, সবাই তুচ্ছ কথা বলে। এই প্রথম আপনার বাবার বইয়ের ভেতরে আমার ছোটবেলার স্বপ্নের প্রতিধ্বনি পেলাম।

www.bengaliebook.com

আর সেদিন পিকনিকে গিয়ে আপনার সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছিল তাতে বুঝেছিলাম, আমাদের চিন্তার বেশ একটা মিল আছে। আপনি বোধহয় এই মানসিকতা আপনার বাবার কাছ থেকে পেয়েছেন। জানেন, আমার পরিচিত মানুষ অনেক আছে, কিন্তু আমার বন্ধু কেউ নেই। অনেক চিন্তা মনে আসে– যা বলবার লোক পাই না। আপনাকে বন্ধু মনে করে যদি মাঝে মাঝে চিঠি লিখি তাহলে আপনি কী আমাকে বেহায়া মেয়ে মনে করবেন?

চেস্টারটন পড়তে শুরু করেছি। এবার আসবার সময় কিনে নিয়ে এসেছিলাম। গতকাল □□□□□□□ □□ □□□ শেষ করেছি। দেখা হলে আলোচনা করব। ততদিনে সব গল্প পড়া হয়ে যাবে।

একবার আমাদের এখানে বেড়াতে আসুন না। আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে বাবাকে বলেছি, উনি খুব খুশি হয়েছেন। আপনি এলে ভারি আনন্দ পাবেন।

আশা করি ভালো আছেন। নমস্কার নেবেন। ইতি–
অপালা

চিঠি পড়া শেষ করিয়া কাজল অন্যমনস্কের মতো কাগজ কয়খানা খামে ভরিয়া টেবিলে রাখিয়া দিল। জানালা দিয়া মৃদু বাতাস আসিতেছে। জানালার ঠিক বাহিরেই একটা টগর গাছ, অন্ধকারের ভিতব তাহার আরছা আদল বোঝা যায়। শেলী লিখিয়াছিলেন–□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□! কী যেন নাম কবিতাটার? □□□□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□□? প্রথম পড়িবার সময় মনের ভিতর চম্পকসুরভিত একঝলক বসন্তের বাতাস বহিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ এখন সেই অনুভূতিটা যেন আবার ফিরিয়া আসিল। কিংবা ঠিক অতটা নহে–তবু কেমন একটা ঘোর-ঘোর ভাব। অবশ্য ইহাকে নিশ্চয় প্রেমপত্র বলা চলে না,

ট্রাডিশনাল প্রেমপত্রের কোনো লক্ষণ ইহাতে নাই। কিন্তু এই প্রথম একজন মেয়ে তাহাকে চিঠি লিখিয়াছে। এতদিনে তাহার জীবনে এমন কিছু ঘটিল, যাহা একান্তভাবে তাহার নিজের।

এ চিঠি সে কাহাকেও দেখাইবে না, অন্য কাহারও ইহাতে কিছুমাত্র অধিকার নাই। একটা বয়স পর্যন্ত মানুষের জীবনে কোনো গোপনীয়তা থাকে না, ফলে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের চিহ্নও থাকে না। গোপনীয়তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হয় আঁটে, কিন্তু তাহার জন্য কিছু মূল্যও দিতে হয়।

যাই যাই করিয়াও সরল শৈশবের যেটুকু অংশ প্রথম যৌবন পর্যন্ত থাকিয়া যায়, সেই অনাবিল সারল্য মূল্য হিসাবে বিসর্জিত হয়।

অবশ্য অপালা প্রেমপত্র লেখে নাই। সাধারণ চিঠি—যেমন বন্ধু বন্ধুকে লেখে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জনার্দন গাঙ্গুলী শহরে একটি অতি পরিচিত মুখ। সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ সে সাব-পোস্টাপিস হইতে চিঠির ঝুলি কাঁধে লইয়া একটি পুরাতন ব্যালে সাইকেলে চাপিয়া চিঠি বিলি করিতে বাহির হয়, এবং বিকাল তিনটা সাড়ে তিনটার সময় পত্রবিতরণ শেষ করিয়া দিনের কর্তব্য সাঙ্গ করে। অন্যান্য পিওনেরা বেলা দেড়টা কি দুইটার ভিতর কাজ শেষ করে, কিন্তু জনার্দন গাঙ্গুলী সবার আত্মীয়-কেহ তাহাকে দাদা, কেহ মামা, কেহ অন্য কিছু বলিয়া ডাকে। প্রত্যেকের বাড়িতে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া, একগ্লাস জল খাইয়া, মেয়ের বিবাহের কতদূর কি ঠিক হইল, কর্তার গেঁটেবাত কেমন আছে সে সম্বন্ধে সংবাদ লইয়া চিঠি বিলি করিতে তাহার কিছু বিলম্ব হয়। তাহার বিশ্বস্ত। বাহনটি বিগত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া অক্লান্তভাবে তাহাকে পিঠে করিয়া কর্তব্য পালনে সাহায্য করে। সহকর্মী কিংবা চিঠির গ্রাহকদের কাছে বাহনটি বিখ্যাত। প্লি মারা চাকা, জং ধরা নড়বড়ে মাডগার্ড, ছিড়িয়া স্পঞ্জ বাহির হওয়া সিট, সামনের রডের সহিত নারিকেলের দড়ি দিয়া বাঁধা, রবারের বলহন–সমস্তটা মিলাইয়া অত্যন্ত করুণ দৃশ্য। নেহাত প্রকৃত বিলাতী র্যালে বলিয়া ম্যালেরিয়া রোগীর মতো কাঁপিতে কাঁপিতে এখনও পথ অতিক্রম করে।

জনার্দন গাঙ্গুলীর মুখের আকৃতি কিছুটা চতুষ্কোণ, ছোট ছোট করিয়া চুল ছাঁটা–যথেষ্ট তৈলদান সত্ত্বেও সেগুলি সটান দাঁড়াইয়া থাকে। চোখদুটি বর্তুলাকার এবং সামান্য রক্তবর্ণ। মাঝারি দৈর্ঘ্য, গায়ে মোটা খাকির জামাতাহাতে পিতলের বোম বসানো। পরনে খাকির প্যান্ট এবং পায়ে শক্ত চামড়ার কালো রঙের কাবুলি চপ্পল। বয়েস বছর বাহান্ন হইবে। এই বর্ণনা হইতে চোখের সামনে অবশ্যই একটি নয়নাভিরাম দেবমূর্তি ভাসিয়া ওঠে না, কিন্তু চেহারা যেমনই হোক, গাঙ্গুলী পিওন মানুষটি ভালো।

পরের দিন কী একটা অজুহাতে কলেজ কামাই করিয়া কাজল তাহাদের গলির উলটাদিকে যে বটগাছটা আছে তাহার তলায় বেলা এগারোটা নাগাদ গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গাছের শিকড়ের উপর বসিয়া খোঁড়া অযোধ্যা নাপিত সামনে ইটের আসনে উপবিষ্ট খরিদ্দারের দাড়ি কামাইয়া দিতেছে। কাজলকে দেখিয়া বলিল-কী খোকা, দাড়ি বানাবে? কাজল হাসিয়া বলিল–না। ইহা তাহাদের পুরাতন রসিকতা। কাজল বাড়িতে নিজেই দাড়ি কামায় সে কথা অযোধ্যা জানে, তবু দেখা হইলেই সে রোজ এই কথা বলিবে। অযোধ্যা কাজলকে বালক দেখিয়াছে, তখনও দেখা হইলেই হাতে ক্ষুর লইয়া হাসিয়া বলিত–এসো খোকা, হজামৎ করে দিই। সে অভ্যাসটা রহিয়া গিয়াছে।

সাড়ে এগারোটার সময় দূরে নড়বড়ে সাইকেলের উপর গাঙ্গুলী পিওনের খাকি পোশাক পরা পরিচিত চেহারার উদয় হইল। কাজল তাহাকে গলির মুখে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল–গাঙ্গুলীমামা, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল

জনার্দন গাঙ্গুলী সাইকেল হইতে নামিয়া কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল-কী রে? এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? কী বলবি?

কাজল জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলে নাই এমন নহে, কিন্তু মুখে সারল্য এবং নিষ্পাপ ভাব ফুটাইয়া এ ধরনের ডাহা মিথ্যা বলিতে সে অভ্যস্ত নয়। সে আমতা আমতা করিয়া বলিল–যা, ইয়ে হয়েছে কী–আমার চিঠি সম্বন্ধে আপনাকে–মানে, বিলি না করে যদি-

–কী বলছিস ঠিক করে বল দেখি! বিলি না করে কী করবো?

কাজল ঘামিয়া উঠিয়াছে। অসংলগ্নভাবে সে বলিল–চিঠিগুলো, মানে আমার নামে যেগুলো আসবে, আপনি যদি-বুঝতে পারলেন তো?

গাঙ্গুলী পিওনের চোখ দুটি আরও ছোট ছোট এবং অধিকতর বর্তুলাকার হইয়া গেল। সে বলিল–না, আমি ঠিক বুঝলাম না।

কাজল মরীয়া হইয়া বলিল–সেগুলো যদি আপনি বিলি না করে আপনার কাছে রেখে দেন তাহলে খুব ভালো হয়। বাড়িতে গোলমালকে কোথায় রেখে দেয়, পরে আর পাই না। শনিবার আমার কলেজ থাকে না, বাড়িতেই থাকি। সেদিন আমি চিঠি আপনার কাছ থেকে চেয়ে নেবো

জনার্দন গাঙ্গুলী কয়েক মুহূর্ত নিশূপ। তাহার খাড়া খাড়া চুল বাতাসে নড়িতেছে। কান পাতিয়া শুনিলে বুঝিবা মাথার ভিতর চিন্তার যন্ত্র চলিবার খুটখাট শব্দ শোনা যাইবে।

তারপর সে হাসিয়া বলিল–বেশ, তাই ভালো। শনিবার শনিবার তুই আমার কাছ থেকে চিঠি চেয়ে নিস। তা তোর কী এখন থেকে খুব ঘনঘন চিঠি আসবে মনে হচ্ছে নাকি?

উত্তর হিসাবে কাজলের গলা দিয়া যে শব্দ বাহির হইল তাহার স্পষ্ট অর্থ করা কঠিন। গাঙ্গুলী আবার জিজ্ঞাসা করিল–সব চিঠিই কী আমার কাছে রেখে দেব, না যেগুলো নীল খামে

আসবে কেবল সেগুলো? কালকে যেমন একটা এসেছিল

কাজল যেন এখানে উপস্থিত নাই। গাঙ্গুলী পিওন অন্য কাহাকেও কিছু বলিতেছে। হাসিয়া সাইকেলে উঠিতে উঠিতে জনার্দন গাঙ্গুলী বলিল-ঠিক আছে। চিঠি আমার কাছেই থাকবে।

তারপর আপাদমস্তক কাজলকে একবার ভালো করিয়া দেখিয়া লইয়া বলিল–তুই বড়ো হয়ে গেলি, আঁ? কতটুকু দেখেছি তোকে-

এক-একজন মানুষ আছে যাহাদের কাছে লোকের গোপন কথা নিরাপদে থাকে। গাঙ্গুলী পিওন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিল। কেমন করিয়া সে নির্ভুলভাবে কেবলমাত্র অপালার চিঠিগুলিই বাছিয়া নিজের কাছে রাখিত, বাকিগুলি বাড়িতে বিলি করিয়া দিত-তা সে অপালা যে রঙের খামেই চিঠি লিখুক না কেন। প্রতিমাসে হাজার হাজাব চিঠি লইয়া যাহাব কারবার, মানুষের হাতের লেখা চিনিতে তাহার সময় লাগে না। জনার্দন গাঙ্গুলী সম্ভবত সেই অভিজ্ঞতাই প্রয়োগ করিয়াছিল।

কোনো একজায়গায় বেশিদিন বাস করিলে সেখানকার মাটিতে মানুষের শিকড় গজাইয়া যায়। কাজলের জীবনেও তাহাই ঘটিয়াছিল। অপুর মৃত্যুর পর মামাবাড়িতে বাস করিতে আসা, নিজেদের বাড়ি করিয়া লওয়া, কলিকাতার কলেজে পড়া—এইসব কারণে মালতীপুরে তাহার স্থায়ী ঠিকানা গড়িয়া উঠিয়াছে। ছোটবেলা হইতে বাস করিবার জন্য জায়গাটার উপর তাহার কিছুটা মায়াও আছে। মালতীপুর কলিকাতা হইতে কাছে বলিয়া আরহাওয়ায় শহরের ছোঁয়াচ পুরাদস্তুর, গাছপালা এবং ফাঁকা জায়গা কম, বাড়িঘর বেশি। প্রতিবৎসরই নতুন নতুন আরও বাড়ি উঠিতেছে, জমির দাম আগুন। মূল রাস্তাগুলির দুইধারে ফাঁকা জমি আর নাই বলিলেই চলে। গ্রাম সুন্দর, বিশাল শহরেরও একটি নিজস্ব সৌন্দর্য আছে—কিন্তু এই ধরনের আধা গ্রাম আধা শহর কাজল দেখিতে পারে না। শহরের চমকপ্রদ অভিনবত্ব নাই, আবার গ্রামের সরল স্বাভাবিকত্বও নাই, পরিকল্পনাহীনভাবে কিছু বাড়িঘর দোকানবাজার আর চালা গড়িয়া উঠিয়াছে—এই মাত্র। নিশ্চিন্দিপুরে তাহার বাবার যে মায়াময় শৈশব প্রকৃতির অকৃপণ দানে স্বর্ণমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল, তেমন ঈশ্বরের আশীর্বাদপুত শৈশব সে মালতীপুরে যাপন করে নাই। প্রবাসী ইংরেজ যেন অকিঞ্চিৎকর ঘটনা সম্বন্ধে রসিকতা করে- nothing to write home about, কাজলের শৈশবও প্রায় তাহাই। তবু নিজের কৈশোর ও শৈশব

প্রত্যেকেরই প্রিয়। বড়ো হইয়া উঠিতে উঠিতে মনের মধ্যে কত ভাঙচুর হয়, কত সরল বিশ্বাস সন্দেহে পরিণত হয়, আবার কত অস্পষ্ট ধারণা গভীর বিশ্বাসের রূপ নেয়। ছোটবেলার খেলার সঙ্গী, কতদিনের কত মেঘ-ঘনাইয়া-আসা কালবৈশাখীর অপরাহু, রাত্রিতে হ্যারিকেনের আলো কমাইয়া দিয়া মায়ের কাছে শুইয়া গল্প শোনা। নাঃ, বাবার মতো না হইলেও তাহার ছোটবেলাও নিতান্ত খারাপ কাটে নাই।

তবু নিশ্চিন্দিপুরের জন্য মাঝে মাঝে ভারি মন কেমন করে।

শহরের সহিত তাহার কোনো আত্মীয়তা নাই। গ্রামে সে বেশিদিন বাস করে নাই সত্য, কিন্তু সেখানেই তাহার অস্তিত্বের মূল প্রোথিত রহিয়াছে। কয়েকদিন ধরিয়া সে ভাবিতেছে—একবার নিশ্চিন্দিপুরে গেলে বেশ হত। কে কেমন আছে দেখে আসতাম। এই ইচ্ছার সহিত সমাপতনের মতো আর একটি ঘটনা পরের সপ্তাহেই কাজলের নিশ্চিন্দিপুর যাওয়াকে নিশ্চিত করিয়া তুলিল।

কলিকাতা হইতে অপুর ভক্ত সেই জগদীশবাবু একদিন আসিয়া বলিলেন-সামনের মাসে আমরা অপূর্ববাবুকে নিয়ে সভা করবো। তার আগে একবার তার গ্রামটা ঘুরে আসতে চাই। যে গ্রামকে তিনি তার সাহিত্যে অমর করে রেখেছেন সেটা না দেখলে তাকে পুরো চেনা যাবে না। কী করে যেতে হয় একটু বলে দেবে?

কাজল বলিল—তার চেয়ে ভালো হয়, আমি আপনাদের নিয়ে যাই চলুন। আমিও কিছুদিন ধরে যাবো যাবো করছি, বরং এই সুযোগে—

-বাঃ, তাহলে তো খুবই ভালো হয়। যেদিন যাবে সেদিনই ফেরা যাবে তো?

-তা চেষ্টা করলে ফেরা যায়, আজকাল তো মোটববাসও হয়েছে ও-পথে। তবে ভালো করে বেড়াতে হলে আমার সঙ্গে একটা দিন না হয় থেকে যাবেন।

—তা অবশ্য হতে পাবে যদি অসুবিধে না হয়—

—অসুবিধে আর কী? আমার সঙ্গেই তো থাকবেন।

যাইবার দিন ঠিক হইয়া যাইবার পর কাজলের মনে অদ্ভুত একটা আনন্দের ঢেউ বহিতে লাগিল। অপুর মৃত্যুর পর বার দুই সে নিশ্চিন্দিপুর গিয়াছিল। থাকা হয় নাই, বাড়িতে জরুরি কাজ থাকায় আবার রাত্রে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। রানুপিসির সঙ্গেও দেখা হয় নাই-রানাঘাটে কে একজন আত্মীয় অসুস্থ থাকায় রানুপিসি সেখানে গিয়াছিল। এবার গেলে হয়তো দেখা হইবে।

নির্দিষ্ট দিনে নিশ্চিন্দিপুরের পথে পা দিয়া সে অবাক হইয়া গেল। কী আশ্চর্য পরিবর্তন হইয়াছে তাহাদের গ্রামের! ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা সড়ক হইতে যে রাস্তা গ্রামে ঢুকিতেছে সেটা বরাবরই সে কঁাচা দেখিয়া আসিয়াছে। এবার সে অবাক হইয়া দেখিল রাস্তাটায় পিচ দেওয়া হইয়াছে। হইতেই পারে দিন কাটিবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্রই উন্নতির স্পর্শ লাগিয়াছে, তাহাদের গ্রামেব পথে যে পিচ পড়িবে উহা এমন আশ্চর্য কী? কিন্তু কাজলের মন খারাপ হইয়া গেল। এখানে ওখানে বেশ কয়েকখানা পাকা বাড়ি দেখা যাইতেছে। কবে এসব বাড়ি উঠিল? সারি সারি খুঁটির উপর দিয়া বিদ্যুতের তার গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে। রাত্রিবেলা গ্রামে তুলসীমঞ্চে প্রদীপ জ্বলে তো? নদীর ধার দিয়া আসিবার পথে যে বড়ো আমকাঠালের বাগানটা পড়ে সেখানে খুটির উপব বিদ্যুতের আলো জ্বলে না তো? পাখির দল কী আজও এ গ্রামের গাছের পাতার ফাঁকে গান গাহিতে আসে?

www.bengaliebook.com

নিশ্চিন্দিপুর তাহার একটা বড়ো আশ্রয়। আর হয়তো কোনদিন পাকাপাকি ভাবে এখানে আসিয়া বাস করা হইবে না, তবুও জীবনের শত দুঃখ এবং আঘাতের মুহূর্তে সেদৃঢ় বিশ্বসে স্থির থাকিতে পারিবে–কোথাও এই পৃথিবীতে সবুজ ঘাস আছে, পাখির ডাক আছে, শান্তির আশ্রয় আছে, সেখানে নির্জন বাঁশবনে উদাস হাওয়ায় নিঃশব্দে শুকনো পাতা খসিয়া মাটি ঢাকিয়া দেয়, পূর্বপুরুষদের নিবিড় স্নেহ যুগান্তের বাধা পার হইয়া শীতল ছায়ার রূপ ধরিয়া বনে-বনান্তে ঘনাইয়া আসে। এই গ্রাম হইতে জীবনের প্রবাহ তাহাকে যত দূরেই লইয়া যাক না কেন, একটা অদৃশ্য সংযোগসূত্র তাহাকে চিরদিন নিশ্চিন্দিপুরের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিবে।

নিশ্চিন্দিপুর বদলাইয়া গেলে তাহা সে সহ্য করিতে পারিবে না। জগদীশ একান্তই শহরের মানুষ, কলিকাতার বাহিরে কমই পা দিয়াছে। তুলনামূলকভাবে গ্রামের যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা জগদীশের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। সে সবকিছু দেখিয়াই ভয়ানক উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কাজলের প্রথমটা মজা লাগিলেও পরে সে ভাবিয়া দেখিল-জগদীশের দোষ নাই। □□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □ □□□□ □□□□, শহরের কুশ্রী ইটের স্তূপ দেখিয়া আর কর্কশ শব্দ শুনিয়া তাহার চোখ ও কান ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এখন প্রতিটি ঘাসের ডগা দেখিয়া তাহার উল্লসিত হইয়া ওঠা অস্বাভাবিক নয়।

–আহা কী চমৎকার! কী শান্তি! এমন জায়গায় মানুষ হয়েছেন বলেই না অপূর্ববাবু অমন বই লিখতে পেরেছিলেন! আচ্ছা, কুঠির মাঠ কোনদিকে? সেটাও দেখবো কিন্তু

জগদীশ মানুষ ভালো, কিন্তু আবেগের প্রাবল্যে অনর্গল কথা বলিয়া মুশকিল করিতে লাগিল। কাজলের পক্ষে নিশ্চিন্দিপুরে আসা একটা তীর্থযাত্রার মতো।

সারাটা দিন সে নিজের ভিতর মগ্ন হইয়া থাকিতে চায়। এমন চলিলে তাহা কী করিয়া সম্ভব হইবে?

আজ রানুপিসি বাড়িতেই ছিল। কাজলের ডাক শুনিয়া রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া অবাক হইয়া বলিল—ওমা, তুই! আমি ঠিক গলা শুনে চিনতে পেরেছি। ভাবলাম—ভুল শুনছি নাকি? কাজল এখন কোত্থেকে আসবে? খবর নেই, কিছু নেই—আর একবার এসেছিলি শুনলাম, আমি ছিলাম না—মামার অসুখ হয়েছিল, তাকে দেখতে গিয়েছিলাম রানাঘাট-

তারপর পেছনে জগদীশকে দেখিযা সংকুচিত হইয়া বলিল—ইনি কে?

—ইনি, মানে-ধরো আমার দাদা হন। বাবার বই পড়ে আমাদের গ্রাম দেখতে এসেছেন। ভালো কথা পিসি, আমরা কিন্তু আজ এখানে থাকবো-

রানী হাসিয়া বলিল—থাকবি তাই কী? সেকথা কী আবার বলতে হবে? আয়, ঘবে এসে বোস-

বেলা প্রায় এগারোটা বাজে। রানী জলখাবারের ব্যবস্থা না করিয়া একেবারে দুপুরবেলাব খাওয়ার আয়োজন করিতে লাগিল। কাজল বলিল—বানুপিসি, তুমি বরং রান্নাবান্না শেষ করে বাখো, আমি ততক্ষণ এঁকে নিয়ে একটু ঘুরে আসি। দুটো নাগাদ ফিবে খেতে বসবো-

—অত বেলায়? চান করবি কখন?

—সকালে চান করে বেরিয়েছি, শুধু হাতমুখ ধুয়ে নেবো এখন-

www.bengaliebook.com

উত্তরের মাঠে যাইবার পথে একটি চাষিব ছেলে দাঁড়াইয়া খেতে নিড়ান দেওয়া দেখিতেছে। কাজল তাহাকে ডাকিয়া বলিল-এই শোন, তোর নাম কী?

বালক মুখ হইতে আঙুল বাহির করিয়া বলিল-হারাণ।

-একটা কাজ করবি হারাণ? আমার এই দাদাকে একটু কুঠির মাঠ দেখিয়ে আনবি? তোকে চারআনা পয়সা দেবো-

বালক ঘাড় হেলাইয়া জানাইল-পারিবে।

—তবে নিয়ে যা। জগদীশদা, আপনি রানুপিসির বাড়ি চিনে ফিরতে পারবেন তো? আমার একটু কাজ আছে, সেটা সেরে নিই-

জগদীশ হাসিয়া বলিল-খুব পারবো। তুমি যাও, কাজ সেরে নাও-

কাজল পকেট হইতে একটা সিকি বাহির করিয়া হারাণের হাতে দিতে গেল—এই নে তোর চারআনা-

হারাণ বলিল-নাঃ।

কাজল বিস্মিত হইয়া বলিল-সে কি রে? এই যে বললি যাবি?

—যাবো, পয়সা নেবো না।

কাজল নতুন করিয়া ছেলেটির দিকে তাকাইল। শ্যামবর্ণ, নিতান্ত সাধারণ চেহারা—অনেকদিন চুল কাটা হয় নাই, জুলফি লতাইয়া পড়িয়াছে। পরনে

ছেঁড়া ইজের, গা খালি। সর্বাঙ্গে খড়ি উড়িতেছে। মূর্তিমান দারিদ্র। অথচ কত সহজে পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করিল।

এই সারল্য চিরস্থায়ী হইবে তো? দিনকাল বড়ো খারাপ পড়িয়াছে। জগদীশ চৌধুরী ছেলেটির সঙ্গে চলিয়া গেলে কাজল একা নিজেদের পুরানো ভিটার দিকে গেল। এখানেও জগদীশ নিশ্চয় আসিতে চাহিবে, তবে সেটা বিকালের দিকে হইলেও ক্ষতি নাই। প্রথমে সে একা কিছুক্ষণ সেখানে কাটাইতে চায়। জগদীশ অপুর যত বড়ো ভক্তই হোক না কেন, পুরানো ভিটার প্রতিটি ইটে প্রতি ধূলিকণায় তাহার বাবার যাপিত শৈশবের যে আনন্দময় ইতিহাস লেখা আছে, সে ইতিহাস পড়িবার ক্ষমতা তাহার নাই। কাজলের শৈশবও এখানে কাটে নাই বটে, কিন্তু সে এই গ্রামেরই সন্তান—এই ভিটার সহিত তাহার বত্রিশ নাড়ির সম্বন্ধ। অন্যে তাহা অনুভব করিতে পারিবে না।

ভিটায় যে জঙ্গল হইয়া গিয়াছে তাহা সে ছোটবেলাতেই দেখিয়া গিয়াছিল। কেহ পরিষ্কার না করায় জঙ্গল যেন আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে। কাঁটাওয়ালা দুষ্প্রবেশ্য ওকড়া ফলের ঝোপ ঠেলিয়া ভেতরে ঢোকাই কঠিন। নিশ্চিন্দিপুরে তাহার বাবা সম্প্রতি যে বাড়ি কিনিয়াছিল, কেহ বাস না করায় সেটির অবস্থাও ভালো নহে, অবিলম্বে মেরামত প্রয়োজন। বর্তমানে সে রানুপিসির বাড়িতেই থাকিবে।

তাহাদের বাড়িটার বলিতে গেলে আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। দু-একটা দেয়াল কোনোমতে দাঁড়াইয়া আছে, চারিদিকে ভাঙা ইট আর উইধরা কাঠের খুঁটির স্তূপ। ফ্যাকাসে সবুজ পাতাওয়ালা শেয়ালকাটার গাছ সর্বত্র। তাহার পায়েব শব্দে একটা গিবগিটি দ্রুত ছুটিয়া ধ্বংসস্তূপের ফাঁকে কোথায় লুকাইল।

কাজলের পরিচিত একজন প্রৌঢ় ইতিহাসের অধ্যাপক সবকাবের অনুমতি লইয়া কিছুদিন এখানে-ওখানে শখের খননকার্য চালাইযাছিলেন। প্রত্নতত্ত্বে

www.bengaliebook.com

উৎসাহী কাজল মাঝে মাঝে সন্ধ্যার দিকে তাহার কাছে গিয়া গল্প শুনিত। অধ্যাপক ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন–যেখানে-সেখানে খুঁড়তে আরম্ভ করলেই তো হল না, তোমাকে নিশ্চিত হতে হবে সেখানে আগে মানুষের বাস ছিল। নইলে খোঁড়াখুড়ি কবলে, অঢেল পয়সা খরচ হল, পরিশ্রমও হল–তারপর সেখানে মাটির নিচে কিছুই পাওয়া গেল না–

-কী করে নিশ্চিত হওয়া যায়? কোনো উপায় আছে?

–আছে, অন্তত আমি পারি। ধবো, কোথাও একটা টিবি দেখে বা অন্য কোনো লক্ষণ দেখে মনে হল এখানে এসক্যাভেশন চালানো যেতে পারে। আমি তখন সেখানকার মাটি একমুঠো হাতে তুলে নিয়ে এঁকে দেখি-

-কেন? মাটি খুঁকে কী বোঝেন?

-মানুষ কোথাও একবার বাস করলে সেখানকার মাটিতে মানুষের গন্ধ মিশে যায়–সে গন্ধ আর নষ্ট হয় না। আমি মাটি খুঁকে বলে দিতে পারি–এখানে একহাজার বছর আগে বসতি ছিল। অবশ্য এ ক্ষমতা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয় কিছুটা সহজাতও বটে। যার থাকে তার থাকে

কাজল নিচু হইয়া এক মুঠা মাটি হাতে লইল।

এই মৃত্তিকা বিগত তিনপুরুষ ধরিয়া তাহাদের বংশকে লালন করিয়া আসিয়াছে, আশ্রয় দিয়াছে। তাহার ঠাকুরদা এই ভিটার দাওয়ায় বসিয়া পুথি লিখিয়াছে, ঠাকুমা রান্না করিয়াছে–

দুর্গাপিসি পুতুলের বাক্স সাজাইয়াছে এই উঠানে বসিয়া। তাহার বাবার শৈশবক্রীড়ার সাক্ষী এই ভিটা। এই মাটিতে কী সত্যই তাহাদের স্মৃতির ঘ্রাণ মিশিয়া রহিয়াছে?

বদ্ধমুষ্টি মুখের কাছে আনিয়া কাজল চোখ বুঁজিয়া ঘ্রাণ লইল।

প্রথমে শুধুই সোঁদা সোঁদা সাধারণ মাটির গন্ধ। তারপর যেন তাহারই সঙ্গে মিশিয়া কোন সুদুর অতীত হইতে হারানো দিনের ছবি আর রঙ ভাসিয়া আসিল। কত না-দেখা প্রিয়জন, ভুলিয়া যাওয়া উৎসবের আনন্দ-জন্মান্তরের তটভূমি হইতে প্রবাহিত অলৌকিক বায়ুস্রোতে ভর করিয়া দেবধূপের সৌরভ বহন করিয়া আনিল।

তাহার জন্মের বহু পূর্বেই এই মঞ্চের নাটক সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। কোথায় ঠাকুরদা-ঠাকুরমা, কোথায়ই বা দুর্গাপিসি আর বাবার হারানো শৈশব! বাবার কাছে সেইসব দিনের গল্প শুনিয়াছে শুধু, তাহার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ নাই সে যুগটার। অন্যের মুখে শোনা রূপকথার কাহিনীর মতো।

তবু চোখে জল আসে কেন?

জায়গাটায় বেশ ছায়া-ছায়া ভাব, তীব্র সূর্যের আলো প্রবেশ করিয়া পরিবেশের স্বপ্নিল মোহাচ্ছন্নতাকে খর্ব করে নাই। কাজল দুইখানি ইট পাশাপাশি পাতিয়া তাহার উপর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

এই বাড়িটাকে আবার সারাইয়া তুলিতে হইবে। আধুনিক নকশা অনুযায়ী নতুন বাড়ি নয়, পূর্বে যেমন ছিল ঠিক তাহাই। সে দেখে নাই, কিন্তু রানুপিসি বলিতে পারিবে বাড়িটা দেখিতে কেমন ছিল। আজ জগদীশের আগমন দিয়া শুরু, তাহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে আগামী কয়েক বছরে তাহার বাবার খ্যাতি আরও বাড়িবে। দেশের দূর দূর প্রান্ত হইতে ভক্তের দল এই বাড়ি দেখিতে আসিবে একদিন। আসিয়া কী দেখিবে? এই শ্রীহীন ভগ্নস্তূপ? নাঃ, বাড়িটার সংস্কারের ব্যবস্থা লইতে হইতেছে। কিংবা থাক। বিগত যুগকে এভাবে কালের

www.bengaliebook.com

গর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া লাভ নাই। শেষ জীবনে তাহার বাবা যে বাড়িতে বাস করিত, তাহাই বরং লোকে দেখুক। পুরোনো ভিটার বেদনাকরুণ স্মৃতি বাবার উপন্যাসে অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

ঘণ্টাখানেক পরে উঠিয়া আসিবার সময় কাজল ভিটা হইতে কিছুটা মাটি তুলিয়া লইল। পকেটে একটা কিসের হ্যান্ডবিল রহিয়াছে আজ দিন দুই-তিন, শেয়ালদার মোড়ে কে যেন বিলি করিতেছিল। সেই কাগজখানা বাহির করিয়া মাটিটুকু তাহাতে মুড়িয়া পকেটে রাখিল।

সে রানুপিসির বাড়ি পৌঁছাইবার একটু পরেই জগদীশও ফিরিয়া আসিল। কুঠির মাঠ দেখিয়া সে খুব খুশি। বলিল–নীলকুঠির ভাঙা চৌবাচ্চাগুলো এখনও পড়ে আছে দেখে এলাম, বুঝলে? অপূর্ববাবুর শেষ উপন্যাসখানা তো নীলবিদ্রোহের পটভূমিতে বাংলার গ্রাম নিয়ে লেখা। মহাকাব্য, বুঝলে, মহাকাব্য। সেই উপন্যাসের জন্মস্থানে দাঁড়িয়ে আছি ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিল–

দুপুরে রানী যত্ন করিয়া তাহাদের খাওয়াইল। কাজল ছোটবেলায় কী কী খাইতে ভালোবাসিত তাহা সে ঠিক মনে করিয়া রাখিয়াছে। থালায় চূড়া করিয়া ভাত বাড়িয়াছে–শহরের পালিশ করা চালের সাদা ভাত নয়, ঈষৎ লালচে মোটা চাল। কিন্তু ভারি মিষ্টি স্বাদ। পাতের একপাশে মোচার তরকারি, তাহার উপর বড়িভাজার গুঁড়া আর নারকোলকোরা ছড়ানো। ছোটবেলায় খাইতে বসিয়া মোচার ঘণ্ট দেখিলেই সে বলিতও পিসি, বড়ি দাওনি কেন? আমি এমনি এমনি মোচা খাবো না–

অনুরোধ-উপরোধে ফল হইত না, রানীকে আবার বড়ি ভাজিয়া আনিতে হইত। রানুপিসি সেই কথা এখনও মনে রাখিয়াছে দেখিয়া আবেগে তাহার বুকের মধ্যেটা কেমন করিয়া উঠিল। পিসি তাহাকে এত ভালোবাসে, অথচ

সে কতবছর আসিয়া একবার খোঁজ করে নাই। কাজটা খুব অন্যায় হইয়া গিয়াছে। এখন হইতে সে নিয়মিত যোগাযোগ রাখিবে।

মধ্যাহ্নভোজনের পর জগদীশ বাহিরের তক্তাপোশের উপর মাদুর পাতিয়া সামান্য বিশ্রাম করিবার জন্য শুইয়া পড়িল। কাজল ভিতরে গিয়া দেখিল খাওয়া সারিয়া রানী শোওয়ার ঘরে মেঝেতে বসিয়া জাতি দিয়া সুপারি কাটিতেছে। কাজলকে দেখিয়া রানী বলিল–আয়, বোস এখানে। ও লোকটা ঘুমিয়েছে?

-হ্যাঁ পিসি, ওকে শুতে দিয়েই তো এলাম।

–কে রে লোকটা? তোর মামাবাড়ির দিকের কেউ নাকি?

-না, আমার কেউ হয় না। বাবার এখন খুব নাম হয়েছে তা জানো তো? অনেক বই বেরিয়েছে বাবার, সেসব বই পড়ে লোকেরা বলছে বাংলা সাহিত্যে অনেক যুগের মধ্যে এতবড় সাহিত্যিক আর আসেনি। এর নাম জগদীশ চৌধুরী, কলকাতায় থাকে, বাবার লেখার খুব ভক্ত। এরা কয়েকজন বন্ধু মিলে বাবার স্মৃতিতে সভা করবে কলকাতায়, তার আগে একবার আমাদের গ্রাম দেখতে এসেছে।

জাঁতির কুচকুচ শব্দ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। আগ্রহপূর্ণ স্বরে রানী জিজ্ঞাসা করিল–কেন রে? অপু বইতে আমাদের গাঁয়ের কথা লিখেছে বুঝি?

কাজল অবাক হইয়া গেল। যে বই লইয়া এখন সারাদেশে এত আলোচনা, রানুপিসি সে সম্বন্ধে কিছুই জানে না? সে বলিল–বাবার প্রথম উপন্যাসখানা তো আমাদের এই গ্রামের কথা নিয়েই লেখা। সব সত্যি ঘটনা, চরিত্রগুলোও

সব সত্যি। ঠাকুরদা-ঠাকুরমার কথা আছে, প্রসন্ন গুরুমশাইয়ের কথা আছে, চিনিবাস কাকার কথা আছে।

তারপর একটু থামিয়া আস্তে আস্তে বলিল–তোমার কথাও অনেক আছে পিসি। তুমি নাকি বাবাকে ছোটবেলায় একটা খাতা দিয়েছিলে গল্প লিখে দেবার জন্য, কিছুদূর লেখার পর ঠাকুরদা এ গ্রাম ছেড়ে চলে যান, বাবা আর খাতাটা শেষ করতে পারেনি–সে ঘটনাও লেখা আছে। তুমি বাবার বই একটাও পড়ো নি? কত লোকে পড়ে ফেলল–

রানী ধরা গলায় বলিল–কী করে পড়বো বল? আমাদের গাঁয়ে বই পড়ার রেওয়াজ নেই, কেউ আমাকে বলেও নি অপুর এত নাম হয়েছে। তুইও তো একটা বই আমাকে দিয়ে যেতে পারতিস-আসলে কী জানিস, আমরা সেই গাঁয়েই পড়ে আছি, কাদায় গুণ পুঁতে। তুই শহরে থাকিস, তোর কত বন্ধু, কত কাজ–তোর কী আর মনে পড়বে আমার কথা? তবে তুই ছেলেমানুষ, তোকে দোষ দিই না, তোর বাবা বেঁচে থাকলে

কাজলের সত্য-সত্যই খুব মনখারাপ হইল। রানীর একটা হাত ধরিয়া সে বলিল–পিসি, তুমি রাগ কোরো না, আমার সত্যিই খুব ভুল হয়ে গিয়েছে। এরপর আমার আসতে আবার কমাস দেরি হবে হয়তো, কিন্তু আমি তার আগেই তোমাকে ডাকে পার্সেল করে বাবার এক সেট বই পাঠিয়ে দেব। অন্য লোকে যতই নাচানাচি করুক, এ পৃথিবীতে বাবার বই পড়বার সবচেয়ে বেশি অধিকার তোমার, কেন জানো?

রানী উত্তর দিল না, মাথা নিচু করিয়া কাটা সুপারির টুকরাগুলি আঙুল দিয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

কাজল বলিল—কারণ এই যে, ছোটবেলায় তোমার প্রেরণাতেই বাবা প্রথম লিখতে শুরু করে। হলই বা ছেলেমানুষি লেখা, জীবনের প্রথম লেখা তো! বাবা নিজের উপন্যাসে তোমার ঋণ স্বীকার করেছে–

রানী মুখ তুলিল না। সুপারিগুলি আঙুল দিয়া নাড়িয়াই যাইতেছে।

কাজল এতক্ষণ আবেগের বশে কথা বলিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল রানুপিসি প্রাণপণে কান্না চাপিবার চেষ্টা করিতেছে। সে অপ্রতিভ হইয়া কথা ঘুরাইয়া গ্রামের বর্তমান পরিবেশ কিরূপ সে বিষয়ে আলোচনা শুরু করিল। রানী অধমনস্কভাবে দুই-একটা অসংলগ্ন উত্তর দিল। কাজল বুঝিতে পারিল এ আলোচনায় রানুপিসির মনোযোগ নাই। কিছুক্ষণের ভিতরেই দ্বিপাক্ষিক নীরবতার মধ্যে কথাবার্তা থামিয়া গেল।

সারাটা বিকাল ধরিয়া কাজল জগদীশকে লইয়া গ্রাম দেখাইয়া বেড়াইল। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরিয়া জগদীশ ঝোলার ভিতর হইতে নোটবই বাহির করিয়া হ্যারিকেনের আলোয় কী সব লিখিতে বসিল। কাজল ভিতর-বাড়িতে ঢুকিয়া দেখিল রান্নাঘরের বারান্দায় বসিয়া রানুপিসি তরকারি কুটিতেছে। সে কাছে বসিয়া বলিল—পিসি, বাবা তোমাকে যে খাতাখানা লিখে দিয়েছিল সেটা এখনও তোমার কাছে আছে?

রানী বিষণ্ণ হাসিয়া বলিল-ছোটবেলার জিনিস কী ফেলা যায়? আছে বাক্সের মধ্যে। কেন রে?

—আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। একবার দেখাবে?

বঁটি কাত করিয়া রাখিয়া রানী উঠিয়া ঘরের মধ্যে গেল। খাটের তলায় রাখা পুরাতন বেতের পেঁটরা টানিয়া বাহির করিয়া খুলিতেই অকস্মাৎ চারিদিকের

যেন কঠিন বর্তমানটা আর নাই। আবার সেই অতীতের নিশ্চিন্দিপুর। হলুদ জমির উপর খয়েরী ডুরেপাড় শাড়ি, খানকতক পুরানো চিঠি, ভিটোরিয়ার আমলের দুইটি তামার ডবল পয়সা। একটা পুঁতির মালা, মালার সূতা ছিড়িয়া পুতিগুলি বাক্সের ভিতর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সর্বোপরি পেটরার মধ্যেটায় কেমন একটা গন্ধপুরাতন কাপড় বা কাগজপত্র বন্ধ পড়িয়া থাকিলে যেমন পাওয়া যায়। এই ঘ্রাণের সহিত অতীত দিনগুলির কী যেন সম্পর্ক আছে, শুকিলেই মনে হয় মাঝের বসরগুলি সব ফাঁকি। আবার যেন সেই কালের গর্ভে বিলীন বাল্যকালটা সমস্ত রূপ-রস-গন্ধ লইয়া ফিরিয়া আসে।

উদ্‌গত চোখের জল চাপিয়া রানী খাতাখানা কাজলকে আনিয়া দিল।

সেকেলে ধরনের হাতে সেলাই করিয়া বাঁধানো খাতা। মোটা পাতাগুলি হলুদ হইয়া আসিয়াছে। প্রথম পাতাতেই গোটা গোটা অক্ষরে লেখা-শ্রীঅপূর্বকুমার রায়। চাউলপোড়া আর খয়ের দিয়া তৈয়ারি কালি, এখনও ঝকঝক করিতেছে।

পাতা উলটাইয়া পড়িতে শুরু করিয়া কাজল খুব মজা পাইল। রাজা-রানী, সৈন্যসামন্ত, সেনাপতি আর গূঢ় ষড়যন্ত্র লইয়া একটা সাংঘাতিক কাহিনী! ত্রিশ-বত্রিশ পাতা মোট লেখা হইয়াছিল। তাহার মধ্যেই যুদ্ধ, প্রতিহিংসা, দেশের জন্য আত্মত্যাগ, বাউল ভিখারির ছদ্মবেশে রাজগুরুর রাজমাহাত্ম্য প্রচার, বিশ্বাসঘাতিনী মহিষীর উপযুক্ত দণ্ডবিধান-সব হইয়া গিয়াছে। এই বালকই বড় হইয়া এমন সাহিত্য রচনা করিয়াছে যাহা পাঠ করিয়া লোকে লেখকের ভিটা দেখিতে ছুটিয়া আসিতেছে!

খাতা রানীর হাতে ফেরৎ দিয়া কাজল বলিল–যত্ন করে রেখে দিয়ে রানুপিসি, একদিন এখানা দেখতে তোমার কাছে লোক আসবে, দেখো–

www.bengaliebook.com

কাজল চলিয়া যাইবার দিন দশেক পর একদিন রানী দক্ষিণের ঘরে জানালার পাশে বসিয়া দুপুরবেলা সেলাইয়ের কাজ করিতেছে। উঠানের গাবগাছে একটা ঘুঘু বহুক্ষণ ধরিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া দুপুরবেলার নির্জনতাকে নির্জনতর করিয়া তুলিয়াছে, এমন সময় উঠানে গ্রামের শিশির পিওন আসিয়া দাঁড়াইল।

-একটা পার্সেল রয়েছে দিদিঠাকরুণ-তোমার নামে। সই করে নিতে হবে। রসিদে সই করাইয়া একটা পুলিন্দা রানির হাতে দিয়া শিশির পিওন চলিয়া গেল।

কাজল কথা রাখিয়াছে। পুলিন্দা খুলিতেই আট-দশখানা বাংলা বই বাহির হইল। প্রত্যেকটির মলাটে অপুর নাম। রানী অবাক হইয়া বইগুলি বার বার দেখিতে লাগিল। বাঃ, কী সুন্দর ছবি মলাটে, কেমন সুন্দর বাঁধানো! পিছনের মলাটে বইগুলি সম্বন্ধে বড়ো বড়ো সমালোচকেরা যাহা বলিয়াছেন তাহা ছাপা হইয়াছে। অত কঠিন কথা রানী বোঝে না, তাহার কেবল গর্বে বুকের মধ্যেটা কেমন করিয়া উঠিল এই ভাবিয়া যে, এত সমস্ত বই তাহার হোটবেলার সঙ্গী অপু লিখিয়াছে।

সেলাইয়ের সরঞ্জাম সরাইয়া জানালার পাশে বসিয়া রানী অপুর লেখা প্রথম উপন্যাসখানি পড়িতে শুরু করিল।

বেলা গড়াইয়া নিবিড় অপরাহ্নের ছায়া নামিল বাহিরের উঠানে। ক্রম আলো কমিয়া আসিল, চোখের কাছে বই না আনিলে আর পড়া যায় না।

কোথাও মন চলিয়া গিয়াছে রানীর। লোকে বলিতেছে অপু নাকি মস্তবড় লেখক। বড়ো লেখকের লেখা এত সহজ হয় বুঝি? এ তো তাহাদের ঘরের কথা, তাহাদের শৈশবের খেলার গল্প-সংসারের দুঃখকষ্ট হাসিকান্নার কাহিনী।

www.bengaliebook.com

রানীর চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। সে মনে মনে বলিল—সব ঠিক আছে অপু। সেই মাঠ-বন, আমাদের গাঁ নিশ্চিন্দিপুর-শুধু তুই কেন চলে গেলি?

www.bengaliebook.com

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বি.এ. পাশ করিবার পর প্রথমে কাজল ভাবিয়াছিল আর পড়াশুনা করিবে না। খামোকা দুই বৎসর এম.এ. পড়িয়া বয়েস বাড়াইয়া লাভ কী? বরং যে পেশায় সারাজীবন কাটাইতে হইবে সেটা খুঁজিয়া লওয়া ভালো। কিন্তু বাধা দিল হৈমন্তী।

মার্কশিট হাতে বাড়ি আসিয়া মাকে প্রণাম করিতেই হৈমন্তী কাঁদিয়া ফেলিল। কাজল বলিলকঁদছো কেন মা? এই দেখো, এগুলো অনার্স পেপারের নম্বর, আর এগুলো পাস কোর্সে

হৈমন্তী কাঁদিতেই থাকিল।

একটিমাত্র মানুষের অনুপস্থিতি তাহার মা ও ছেলের সংসাবে একটা অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি করিয়াছে। আজ বাবা বাঁচিয়া থাকিলে সবদিক দিয়া আনন্দটা সম্পূর্ণতর হইত। অবশ্য চিন্তা ও জীবনচর্যার ভিতর দিয়া বাবা তাহার কাছে অনেক জীবিত মানুষেব চেয়ে বেশি করিয়া বাঁচিয়া আছে। গভীর চিন্তার মুহূর্তে অপুর স্মৃতি এবং সাহিত্য তাহাকে যে সাহচর্য দেয়, অনেকের জীবিত জনকও ততখানি দিতে পারে না। কিন্তু কাজলের পৃথিবী অনেক বড়ো, প্রান্তর পর্বত আকাশ গ্রহ-নক্ষত্র লইয়া তাহার দুনিয়াটা আপন সংকীর্ণ গৃহাঙ্গন ছাড়াইয়া অনেকদূর অবধি বিস্তৃত। মৃত্যুর কঠোর বিচ্ছেদ সে দার্শনিক ঔদাসীন্যকে কিছুটা সহনীয় করিয়া আনিতে পারে। হৈমন্তীর জগৎ অত বড়ো নহে, তাহার যাহা যায় তাহা যায়।

বিকালের দিকে হৈমন্তী জিজ্ঞাসা করিল—তা এবার এম এ.-তে ভর্তি হবি তো?

–ভাবছি মা। দুটো বছর নষ্ট না করে একটা কাজ খুঁজে নিলে হয় না?

কথাটা হৈমন্তীর পছন্দ হইল না। সে বলিল–তোর বাবার খুব ইচ্ছে ছিল তুই এম.এ. পাস করিস। প্রায়ই বলত। তাছাড়া আমাদের টাকার এমন কী প্রয়োজন যে তোকে এখনই চাকরি করতে হবে! না, তুই এম.এ. পড়

প্রভাতও সেই পরামর্শ দিল। বলিল–বয়েস বাড়লে জীবনে নানা জটিলতা আসবে, ইচ্ছে হলেও তখন আর পড়বার সুযোগ থাকবে না। ভর্তি হয়ে যাও দেখি

-তুমি পড়বে?

–হ্যাঁ। তোমার চেয়ে আমার বরং একটা চাকরি পাওয়ার দরকার অনেক বেশি। তবু আমি পড়ব-যাতে জীবনে কোনও আফসোস না থাকে। কলেজের চেয়ে ইউনিভার্সিটির পরিধি অনেক বড়ো, সে লাইফটা একটু চেখে দেখবো না?

প্রভাতের সঙ্গে একদিনেই কাজল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হইয়া আসিতেছে। হিটলারের দুর্মদ বাহিনীসহ অক্ষশক্তি সর্বত্রই কোণঠাসা। সুদীর্ঘ চারবৎসরব্যাপী প্যারিস অবরোধের অবসান ঘটাইয়া জেনারেল দ্য গলের রেজিস্ট্যান বাহিনী প্যারিসকে মুক্ত করিয়াছে। যুদ্ধ শেষ হইলেই ভারত স্বাধীনতা পাইবে এমন গুজবও বাতাসে ভাসমান। রাজনীতি সম্বন্ধে কাজলের ততটা আগ্রহ না থাকিলেও বেশ অনুমান করিতে পারে মানবেতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কট ও ক্রান্তিকালের সে সাক্ষী।

একদিন একটা মজার কাণ্ড হইল।

দুপুর আড়াইটার পর ইউনিভার্সিটিতে আর কোনও ক্লাস ছিল না। কাজল বইখানা হাতে ট্রামে চাপিয়া এপ্ল্যানেডে গিয়া নামিল। হাঁটিতে হাঁটিতে ময়দানে একটা কাঠবাদামের গাছ দেখিয়া তাহার নিচে বসিয়া পড়িল। দূরে পশ্চিমদিকে গঙ্গাবক্ষে সারি সারি জাহাজ বাঁধা, তাহাদের মাস্তুলগুলির ঊর্ধ্বমুখ স্পর্ধায় আকাশকে বিদ্ধ করিতেছে। দুপুরে শেষ ক্লাসে ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রেড পড়ানো হইতেছিল। তাহার কয়েকটা লাইন মনে আসিল কাজলের। হাতে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেসের কবিতার সংকলনখানা ছিল, সেটার পাতা উল্টাইয়া সে প্রেলড-এর নির্বাচিত অংশ বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল। জীবনের এইসব একান্ত মুহূর্তগুলি বড়ো সুন্দর। ঘাসের উপর দিনান্তের রৌদ্র আসিয়া এলাইয়া পড়িয়াছে, আপনমনে বসিয়া কেমন কবিতা পড়া।

কাছেই কেহ কী বলিয়া যেন চেঁচাইতেছে। তাহার কর্কশ স্বরে বিরক্ত হইয়া কাজল মুখ তুলিয়া তাকাইল।

একজন হিন্দুস্থানী গাড়োয়ান শ্রেণীর লোক কিছুদূরে গামছা পাতিয়া ঘুমাইতেছিল। একটা লালমুখো সার্জেন্ট আসিয়া তাহাকে ঠেলিয়া তুলিয়া গালিগালাজ করিতেছে। গভীর নিদ্রা হইতে অকস্মাৎ জাগিয়া এই নিদারুণ বিপৎপাতে লোকটা হতচকিত হইয়া পড়িয়াছে। সার্জেন্ট তিবস্কারে ক্ষান্তি দিয়া নির্যাতন পর্বের সমাপ্তি-অনুষ্ঠান হিসাবে লোকটিকে একটা রদ্দা মারিল। নীরবে অপমান পরিপাক করাই এক্ষেত্রে দুর্বলের একমাত্র পন্থা, লোকটা মারের চোটে মাটিতে বসিয়া পড়িল, তারপর ম্লানমুখে ধীরে ধীরে নিজের গামছাটা পাট করিয়া কঁাধে লইয়া যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল।

কাজলের হঠাৎ খুব রাগ হইল। অকস্মাৎ সে উঠিয়া হিন্দুস্থানী লোকটার সামনে গিয়া বলিল—দাঁড়াও, কোথায় যাচ্ছো? শ্বেতাঙ্গ সার্জেন্ট কোমরে হাত

দিয়া দাঁড়াইয়া ব্যাপার দেখিতেছিল, তাহাকে বলিল–তুমি এ লোকটাকে অকারণে মারলে কেন?

বিজিত দেশের নাগরিকের নিকট হইতে শাসকজাতির প্রতিনিধি এ ধরনের প্রশ্ন আশা করে। সার্জেন্ট বিস্মিত হইয়া বলিল—আমি কী তোমার কাছে আমার কাজের কৈফিয়ৎ দেব? তুমি কে?

—আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র। না, তুমি পুলিশ, তোমার কর্তব্যের জন্য আমার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নও। কিন্তু আমি লক্ষ করেছি এই লোকটা কোনও অপরাধ করেনি, অথচ তুমি একে শারীরিক নির্যাতন করলে।

সার্জেন্টের মুখ লাল হইয়া উঠিল।—তুমি কী আমাকে চ্যালেঞ্জ করছো?

কাজল বলিল–আদৌ না। আমি শুধু এই কথা বলছি যে, ভাগ্যক্রমে আমরা পরাধীন, তোমরা শাসক। কিন্তু চিরকাল কোনও জাতি পরাধীন থাকে না, যদি কোনওদিন তোমাদের চলে যেতে হয়, তাহলে পেছনে কিছু সুন্দর স্মৃতি রেখে যাওয়াই কী ভালো নয়?

—মাঠের এই অংশ জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য নয়। এখানে শুয়ে থাকা বেআইনি—

-সেই কথাটা তুমি একে বুঝিয়ে বলতে পারতে। পশুশক্তির প্রকাশে কোনও মহত্ত্ব নেই।

-তোমাকে কর্তব্যে বাধাদানের জন্য আমি এখনই গ্রেপ্তার করতে পারি জানো?

www.bengaliebook.com

সরাসরি এ কথার উত্তর না দিয়া কাজল বলিল–আমার হাতে এই বইটা দেখছো? এখানা তোমাদের বিখ্যাত কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের লেখা, এক্ষুনি বসে বসে পড়ছিলাম। একে আমি একজন মহাকবি বলে মনে করি। যে জাতি এমন মহাপুরুষের জন্ম দিয়েছে সেই জাতির লোকের কাছে কী আমরা এর চেয়ে ভালো ব্যবহার আশা করতে পারি না?

সার্জেন্টটি একেবারে run of the mil নহে। বয়সেও তরুণ, এখনও কঠিন হৃদয় পুলিশে পরিণত হইতে পারে নাই। তাহার মুখের রাগত ভাব একটু একটু করিয়া কমিয়া আসিল। সে বলিল–তুমি কী সত্যিই বিশ্বাস করে একদিন ব্রিটিশরা ভারত থেকে চলে যাবে? একদিন এ দেশ আর আমাদের সাম্রাজ্যের অধিকারে থাকবে না?

আমি সত্যিই একথা বিশ্বাস করি। ইতিহাস কী সেই সাক্ষ্যই দেয় না? কোনও জাতি কখনও চিরকাল পরাধীন থেকেছে? আর প্রকৃত বীর এবং সভ্যজাতের লক্ষণ হল দুর্বলের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করা।

শ্বেতাঙ্গ সার্জেন্ট কয়েক মুহূর্ত কী ভাবিল, তারপর হঠাৎ কাজলের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল-অ রাইট, আই অ্যাম সিনসিয়ারলি সরি। কাম, জয়েন হ্যান্ডস্-

এতদুর হইবে তাহা কাজল ভাবে নাই। সে হাসিমুখে করমর্দন করিল।

-আমার নাম হ্যারল্ড ওগডেন, শতকরা একশো ভাগ ব্রিটিশ রক্ত বইছে আমার শরীরে। তবু বলি, তোমরা স্বাধীনতা পেলে আমি খুশি হব

তারপর হাসিতে হাসিতে বলিল–তুমি আবার আমার এ কথা ওপরওয়ালাদের বলে দিয়ে, তাহলে গরিবের চাকরিটি যাবে!

www.bengaliebook.com

ওগডেন চলিয়া গেলে কাজলও ট্রাম ধরিবার জন্য পা বাড়াইল। সমস্ত ঘটনার কেন্দ্র সেই হিন্দুস্থানী লোকটি একটু দুরে দাঁড়াইয়া ব্যাপার দেখিতেছিল। সে এবার আগাইয়া আসিয়া বলিল–আরে বাপ! আপ তো বহোৎ তেজি আদমি বাবুসাহেব! গোরা পুলিশ ভি আপনাকে কুছু বলল না!

–ও কিছু না ভাই, সাহস করে কথা বললে একটু তো ফল হয়ই–

লোকটির মুখে অকৃত্রিম বিস্ময় ও শ্রদ্ধা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে বলিল–ওফ! বাবুজির আংগ্রেজি যেন মিশিনগানের গুলি–

মনের মধ্যে কীসের একটা অতৃপ্তি, একটা অপূর্ণতার ভাব। কী যেন করিবার ছিল, যাহা করিতে পারিলে জীবনটা সার্থকতা লাভ করিত–সেটা ক্রমাগতই স্বর্ণমৃগের মতো জীবন-অরণ্যের বিশাল বৃক্ষের ফাঁকে ফাঁকে সরিয়া বেড়াইতেছে। জন্ম-কর্ম-প্রেম-মৃত্যুর সমস্ত স্বাভাবিক পর্যায়ের মধ্য দিয়া আর এক অলৌকিক জগৎ পরিব্যাপ্ত, শেষরাত্রির নিবিড় সুষুপ্তির ভিতরে যে জগৎটার আবছা তীরভূমি ব্যবধানের সমুদ্রপারে ক্ষণমুহূর্তের জন্য দেখা দিয়াই আবার দেশ-কালের জটিল গোলকধাঁধায় হারাইয়া যায়। রিটায়ার করিবার কিছুদিন আগে সুরপতি একটা হিজ মাস্টার্স ভয়েস কোম্পানির গ্রামোফোন কিনিয়াছিলেন। মামাবাড়ি হইতে সেটি কাজল লইয়া আসিয়াছে। ওয়েলিংটনের মোড়ের পুরোনো রেকর্ডের দোকান হইতে সংগ্রহ করা একসেট মোজার্ট, বিঠোফেন, শুম্যান, শোপার রেকর্ড হাতে বাজাইয়া মাঝে মাঝে কাজল শোনে। আনফিনিশড সিম্ফনি বা পেজ্যান্টস মেরিমকিং-এর নরম পর্দার স্বরগুলি ওবো-র বিষণ্ণ উদাস করা আওয়াজে বুকের গভীর গোপন হইতে ভুলিয়া যাওয়া হারানো ব্যথা তুলিয়া আনে, পিয়ানোর শব্দে পাইনবন হইতে বরফগলা জলের ঝরনা নামিয়া আসে। চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে বার্চ, বিচ আর অ্যাসপেন অরণ্য। তাহার ফাঁকে ফাঁকে উত্তরসমুদ্র হইতে বহিয়া আসা হিমশীতল বাতাস সারাদিন খেলা করে। কোথায় রহিয়াছে

সাহারা মরুভূমির মধ্যবর্তী তাসিলি পাহাড়, যাহার গুহায় বহুসহস্র বৎসর পূর্বে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের আঁকা চিত্র অন্ধকারে গোপন আছে একদিন প্রকৃত রসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার আশায়। কোথায় আমাজন অববাহিকার উন্নতশীর্ষ বৃক্ষের ডালে বসিয়া তীক্ষ্ণস্বরে ডাকে টুকান পাখি, তাহার বিচিত্রবর্ণের শরীর বেলাশেষের সূর্যালোকে ক্রমে নিষ্প্রভ হইয়া আসে। ইস্টার দ্বীপের প্রস্তরময় তটভূমিতে লাফাইয়া পড়ে প্রশান্ত মহাসাগরের ব্যস্ত তরঙ্গমালা। জাপান সমুদ্র পার হইয়া যায় বিধ্বংসী শক্তিসম্পন্ন সুনামী প্রবাহ। ট্রঘোনের স্বরে যেন শতবৎসরের বিস্মৃতির পর্দাটা সরিয়া যায়, কাজলের মনে হয় কবে যেন সে ওইসব দেশে একবার করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কতবার সে বলগাহরিণের স্লেজে চাপিয়া বিভার শিকার করিতে গিয়াছে, দেখিয়াছে নরম তুষারের উপর ভালুকের সদ্যসৃষ্ট পদচিহ্ন। কতবার ইউফ্রেটিস নদীর জলে সাঁতার কাটিয়া নলখাগড়ার বনের ধারে কাপড় শুকাইতে দিয়া তাকাইয়া থাকিয়াছে নীল আকাশের দিকে। দুর্গের চূড়া হইতে রাজকুমারীকে একহাতে ধরিয়া লাফাইয়া পড়িয়াছে পরিখার জলে। হানিবলের আল্পস পর্বত পার হইবার সময় সে ছিল সশস্ত্র সৈনিক, ফিনিশীয় নৌবাণিজ্যের যুগে সে ছিল একজন সার্থবাহ। তারসপ্তকে বেহালার সম্মিলিত করুণ-মধুর স্বরে বুকের মধ্যে হারানো সেই সব দিনের জন্য একটা অদ্ভুত হাহাকার মাথা কুটিয়া মরে।

কিন্তু ভারতীয় রাগসঙ্গীতের প্রভাব অন্যরকম। সুরের জগতের এই অদ্ভুত দিকটা কাজল বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিয়াছে। দেশী গান বা ওস্তাদের বাজনা শুনিলে মন দিগবিদিকে ছড়াইয়া পড়ে না, বরং আত্মস্থ হইয়া নিজেরই হৃদয়ের গভীরে ডুব দিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া পড়ে। ভাবিলে তাহার অবাক লাগে, একই তো স্বরসপ্তক—তাহারই হেরফেরে কত বৈচিত্র্য!

কে জানে মৃত্যুর পর আর কোথাও নতুন করিয়া জীবন শুরু হয় কিনা, কোথাও আবার মায়ের কোল, স্বপ্নমাখা শৈশব অপেক্ষা করিয়া থাকে কিনা। হয়তো

অনন্ত কালসমুদ্রে বর্তমান জীবনই একমাত্র সবুজ দ্বীপ। কিছু একটা করিতে হইবে। সময় বৃথা বহিয়া যাইতেছে।

একদিন বিকালে ইউনিভার্সিটি হইতে বাহির হইয়া কাজল ও প্রভাত গোলদিঘির একটা বেঞ্চে গিয়া বসিল। অপরাহ্নের রৌদ্র রাঙা হইয়া মহাবোধি সোসাইটির বাড়ির গায়ে পড়িযাছে। কতকগুলি অল্পবয়স্ক ছেলে জল ছোঁড়াছুড়ি করিযা স্নান কবিতেছে। কিছুক্ষণ নানা বিষয়ে আলোচনা কবিবাব পর কাজল বলিল-প্রভাত, একটা কথা তোমাকে বলব বলে কদিন ভেবে রেখেছি, কিন্তু ঠিকমতো সুযোগ না পাওয়ায় আর বলা হয়ে উঠছে না। বিষয়টা আমার কাছে খুব জরুরি

প্রভাত কাজলের গলাব স্ববে একটু বিস্মিত হইয়া বলিল-খুব জবুবি? কী বিষয়ে?

-দেখ, কিছুদিন ধবেই মনে হচ্ছে জীবনটা যেন বৃথা কাটিয়ে দিচ্ছি। প্রত্যেকেই একটা না একটা কিছু করার জন্য পৃথিবীতে আসে। আমার পড়াশুনো তো শেষ হয়ে এল, কিন্তু সামনে আমার কোনও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নেই। এবার কী করব প্রভাত?

প্রভাত কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল–খুব শক্ত প্রশ্ন। এখুনি আমি তোমাকে এব জবাব দিতে পারবো না। তবে একটা কথা বলি, তোমাকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে বিচার করার সুযোগ আমার হয়েছে তাতে মনে হয় শিল্পই তোমার পথ।

–শিল্প? কী ধরনের শিল্পের কথা বলছো?

-বৃহত্তরভাবে শিল্প বলতে যা বোঝায়। তোমার মধ্যে অনেক বলবার কথা রয়েছে, শিল্পের মাধ্যমে তা প্রকাশের চেষ্টা করে দেখছো না কেন?

www.bengaliebook.com

কাজল বলিল-যেমন?

—যেমন তুমি সাহিত্যিক হবার চেষ্টা করে দেখতে পাবো। শিল্পের অন্য কোনও শাখায় এমন নিভৃত চর্চার সুযোগ আর নেই।

কাজল হাসিয়া বলিল—এ কথাটা আমি নিজেও ভেবেছি, কিন্তু এতে অনেক অসুবিধা আছে।

-কিসের অসুবিধে?

—অনেক রকম। প্রধান দুটোব কথা বলছি, শোনন। প্রথমতঃ, সাহিত্যে আমার সত্যিকারের কোনো প্রবণতা আছে কিনা তা বোঝা দরকার। নইলে কেবলমাত্র আমার খেয়াল হয়েছে বলেই লিখতে শুরু করার কোনও মনে হয় না। সাহিত্য চার পয়সার চানাচুর নয়, যে ইচ্ছে কিনে এনে চিবোতে পারে না

প্রভাত বলিল—এর সমাধান এই সমস্যার মধ্যেই নিহিত আছে। তোমার মধ্যে সাহিত্যিক প্রতিভা রয়েছে কিনা জানাবার জন্য তোমাকে আগে তা লিখতে হবে। আর একটা কী?

আমার বাবা লেখক ছিলেন। নিজের মুখে বলছি বলে কিছু মনে কোরো না, বর্তমান কালের পাঠকেরা বাবাকে বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এক্ষেত্রে আমাকে লিখতে হলে খুব বিরাট বাধা ঠেলে এগুতে হবে-

—এ কথা আমার ঠিক বলে মনে হয় না।

-নাও হতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয় পাঠকেরা আমার লেখাকে আমার বাবার লেখাব সঙ্গে মনে মনে তুলনা করবে। সেটা নতুন লেখকের পক্ষে কাম্য নয়। বিখ্যাত মানুষের ছেলের পক্ষে বড়ো কাজ করা খুব কঠিন।

প্রভাত সামান্য ভাবিয়া বলিল হতে পারে, জোর করে না বলব না। কারণ সত্যিই বৃড়ো মানুষের ছেলেকে বড়ো হতে দেখা যায় না। কিন্তু এটাও তো পরীক্ষাসাপেক্ষ অমিতাভ। তাছাড়া গত তিন-চার বছরে তোমার কিছু লেখা আমি পড়েছি, তাতে প্রকৃতই সৎ সাহিত্যের উপাদান রয়েছে। তুমি লেখো।

দুই বন্ধুতে আরও অনেক আলোচনা হইল। ফিরিবার সময় প্রভাত বলিল–তুমি এবার কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করো, বুঝলে? শুধুমাত্র ভেতরে অনেক বলবার কথা থাকলেই তা দিয়ে সাহিত্য হয় না। বলার কথাটা হচ্ছে পাখি, কিন্তু সে পাখির জন্য একটা ভালো খাচা দরকার। খাচা বানাবার মালমশলা জোগাড় করতে শুরু করো–

রাত্রিতে শুইয়া কাজল অনেক চিন্তা করিল। জীবনকে সম্যকভাবে জানিতে হইলে এই চার দেওয়ালের মধ্যে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়াই কিছুদিন ঘুরিয়া বেড়াইলে কেমন হয়? সামনে পূজা আসিতেছে, সে সময় ইচ্ছা করিলে মাসখানেক বেড়ানো চলে। অবশ্য পূজার পর তিন-চার মাসের মধ্যেই এম.এ. পরীক্ষা, পড়াশুনার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে। তবে বইপত্র কিছু সঙ্গে লওয়া যাইতে পারে। আর ফিরিবার পর বেশি করিয়া পড়াশুনা করিলে ক্ষতি সামলাইয়া লওয়া যাইবে।

এবার বাহির হইবে সম্পূর্ণ একা। বন্ধুদের সঙ্গে নহে।

সিদ্ধান্ত লইবার সঙ্গে সঙ্গে কাজল সমস্ত মনে একটা অদ্ভুত শিহরণ অনুভব করিল। প্রকৃত জীবনানন্দ স্থাণুত্বের পরিপন্থী–সবরকম বন্ধনকে অগ্রাহ্য

www.bengaliebook.com

করিয়া পৃথিবীর মূক্ত প্রসাবে ইচ্ছামতো বিচরণের একটা নেশা আছে। মানুষ মূলতঃ প্রকৃতির সন্তান, প্রকৃতিব সন্তান, অবণ্যে-প্রান্তরে ছিল তাহার নিবাস। সভ্যতার প্রয়োজনে পরে সে নগর গড়িয়াছে, যন্ত্র বানাইয়াছে বটে, কিন্তু ইট কাঠলৌহে প্রস্তুত মহানগর তাহার প্রকৃত আশ্রয় নহে। মানুষের মস্তিষ্কের কোনও এক গোপন কোণে তাহার অরণ্যচারী মুক্ত জীবনের প্রাগৈতিহাসিক স্মৃতি লুকাইয়া আছে, যে কারণে সামান্য সুযোগ পাইলেই লোকে তল্পিতল্পা বাঁধিযা বেড়াইতে বাহির হয়, হারাইয়া যাওয়া সেই আনন্দময় স্বাধীনতাকে আর একবার আস্বাদন করিতে চায়। তাহা না হইলে কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া, পথের কষ্ট ভোগ করিয়া অচেনা বিদেশে ঘুরিবার অন্য কী সার্থকতা আছে?

দেশভ্রমণের অনুমতি আদায় করিতে কাজলকে বেশ বেগ পাইতে হইল। প্রস্তাব শুনিয়াই হৈমন্তী বলিল–সে কী কথা! সামনে তোর একজামিন, এখন বেড়াতে বেরুলে পাশ করতে পারবি?

–আমি ঠিক সে অর্থে বেড়াতে যাচ্ছি না মা। কলকাতা আর আমাদের এই শহর বড় একঘেয়ে হয়ে উঠেছে, পড়াতেও তো মন বসছে না। বরং কদিন কোথাও ঘুরে এলে মনটা হাল্কা হবে। বইপত্র সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, যেখানেই থাকি না কেন রোজ পড়াশুনা করব।

-কোথায় যাবি কিছু ভেবেছিস?

সহজে অনুমতি পাইবার জন্য কাজল এইখানে মায়ের সঙ্গে সামান্য তঞ্চকতা করিল। সে বলিল-না, তা এখনও ঠিক হয়নি। আমি তো একা যাচ্ছি না, প্রভাতও যাচ্ছে আমার সঙ্গে। দু-জনে মিলে ঠিক করব।

হৈমন্তী কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া বলিল–প্রভাতও যাচ্ছে? তাহলে অবশ্য–

www.bengaliebook.com

-হ্যাঁ মা, তুমি কিছু ভেবো না। আমরা খুব সাবধানে থাকব।

জিনিসপত্র কাজল বেশি কিছু সঙ্গে লইল না। একটা মাঝারি সুটকেসে কিছু পাঠ্য এবং কিছু অ-পাঠ্য বই, ডায়েরি, কলম-পেনসিল, কিছু লিখিবার কাগজ এবং কয়েক প্রস্থ জামাকাপড় ভরিল। কাঁধের একটা ঝোলায় লইল চাদর, ফু দিয়া ফোলানো যায় এমন একটা বালিশ, তোয়ালে আর দাড়ি কাটিবার সরঞ্জাম। নিজে বওয়া চলিবে না এমন কোনও জিনিস সে সইল না। বইপত্রের দরুন সুটকেসটা কিঞ্চিৎ বেশি ভারি হইয়া পড়িল বটে, কিন্তু রওনা হইবার আগের দিন রাত্রে কাজল অনেক হিসাব করিয়াও তাহা হইতে একখানা বইও কমাইতে পারিল না। বরং মনে হইল–উপায় থাকিলে আর কখানা বই নিতাম। সবরকম মুডের জন্য সঙ্গে বই নেওয়া ভালো, কখন কী পড়িতে ইচ্ছে করে তার ঠিক আছে কিছু?

কাজল কোথায় যেন পড়িয়াছিল, বাঙালি বেড়াইতে খুব ভালোবাসে বটে- কিন্তু রওনা হইবার সময় দরজায় তালা দিতে গিয়া মনটা একবার কেমন করিয়া ওঠে। মনে হয় না গেলেই যেন ভালো হইত।

সুটকেস আর ঝোলাটা গুছাইয়া ঘরের কোণে রাখা আছে। শুইয়া কাজলের ঘুম আসিতেছিল না। আগামীকাল এইসময় তাহার ট্রেন সগর্জনে ছুটিতেছে। বাহিরের পৃথিবীর যেমন একটা রহস্যময় আকর্ষণ আছে, তেমনি সেই অপরিচিত জগৎটা সম্বন্ধে ভয়মিশ্রিত শঙ্কাও মানুষের মজ্জাগত। নিজের গৃহকোণ শতরকমের প্রীতি ও ঘনিষ্ঠ মমতার আয়োজন সাজাইয়া লইয়া বসিয়া আছে। বৃহত্তর জগতে অজানার আকর্ষণ আছে বটে, কিন্তু নিকটজনের প্রতিপূর্ণ আহ্বান নাই। তবুও সে কেন বাহির হইতেছে?

কল্পনায় রেলগাড়ির চাকার শব্দ শুনিতে শুনিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন সন্ধ্যায় হাওড়া স্টেশনে পৌঁছাইয়া কাজল দেখিল মনের মধ্যে আশঙ্কা আর দ্বিধার ভাবটা আর নাই। চারিদিকে লোজ্জন ব্যস্ত হইয়া ছুটিতেছে, কুলিদের কোলাহল, ক্যানাডিয়ান এঞ্জিন হইতে তীক্ষশব্দে স্টিম ছাড়িবার উচ্চনিনাদ, কিছু যাত্রী লাইন দিয়া কুঁজায় জল ভরিয়া লইতেছে– ইহারই মধ্যে কী একটা ট্রেন হুইল দিয়া ছাড়িয়া গেল। সব মিলাইয়া বেশ একটা রোমাঞ্চকর পরিবেশ। কিছুক্ষণ থাকিলেই সুদূরে কোথাও যাত্রা করিবার সম্ভাবনায় মন উৎফুল্ল হইয়া উঠে।

আজ বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় পর্যন্ত কাজল কোথায় যাইবে কিছু ঠিক করে নাই। তাহাদের বাড়ির মাঝখানের ঘরটায় বনমালী মিস্ত্রির তৈয়ারি কাঁঠাল কাঠের আলমারিতে তাহার বাবার অনেক বছরের ডায়েরি রহিয়াছে। কলেজ জীবনের কিছুদিন পর হইতে মৃত্যুর পূর্ব অবধি অপু নিয়মিত দিনলিপি লিখিত। অবসর পাইলেই কাজল সেগুলি লইয়া পড়ে। বিশেষ করিয়া বাবাব জীবনের কোনও কিছু জানিবার জন্য নহে–আসলে ডায়েরি পড়িতে বসিলেই বহুদিন আগে বিদায় লওয়া প্রিয় মানুষটা যেন সম্পূর্ণভাবে সজীব হইয়া আবার সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। বাবার সহিত আবার একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

বাবার একটা ডায়েরিতে সে পড়িয়াছে বাবাও একবার কিছু ঠিক না করিয়া হাওড়া স্টেশনে আসিয়া প্রথম যে গাড়িটা ছাড়িতেছে টিকিট কাটিয়া সেটায় উঠিয়া বসিয়াছিল। সে অবশ্য অতটা করিবে না, কারণ হাওড়া ব্রিজ পার হইবার সময় গঙ্গার ওপারে সমস্ত পশ্চিম দিগন্তব্যাপী সিন্দুরবর্ণ আশ্চর্য সুন্দর সন্ধ্যার দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে অকস্মাৎ সে কোথায় যাইবে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে।

সে কাশী যাইবে, যেমন বাবা গিয়াছিলেন।

কালো কোট পরা একজন টিকিট কালেকটরকে সে জিজ্ঞাসা করিল-কাশীতে যাবার ট্রেন এখন কী পাব বলতে পারেন?

লোকটা বোধহয় কী জরুরি কাজে যাইতেছিল, থামিবার সময় নাই। চলিতে চলিতেই বলিয়া গেল-কাশী? ভালো ট্রেন পাবেন দিল্লি মেল-

বাকিটা ভালো শোনা গেল না।

কাউন্টারে গিয়া কাজল প্রথমে বেনারস সিটির একখানা টিকিট কিনিল। তাহার পর এনকোয়ারিতে খোঁজ করিয়া জানিল দিল্লি মেল আরও দেড়ঘণ্টা পরে চারনম্বর প্ল্যাটফর্ম হইতে ছাড়িবে। তবে দিল্লি মেল বেনারস সিটির উপর দিয়া যায় না। মোগলসরাই নামিয়া ট্রেন বদলাইয়া অথবা টাঙায় যাইতে হইবে। টাঙাই ভালো, সে কখনও টাঙায় চড়ে নাই।

ট্রেনে উঠিয়া একটা বাঙ্কে সে বিছানা পাতিয়া ফেলিল। দূরভ্রমণের সময় সহযাত্রীদের সঙ্গে খুব সহজেই আলাপ জমিয়া যাওয়াটা নিয়ম, কিন্তু এই কামরায় দুইজন অবাঙালি স্বল্পবাক প্রৌঢ় এবং অনেকগুলি বৃদ্ধ-বৃদ্ধা রহিয়াছে। অবাঙালি সহযাত্রীদ্বয় ট্রেন ছাড়িবার পূর্বেই পুঁটুলি হইতে চাপাটি ও ভাজি বাহির করিয়া নৈশাহার সম্পন্ন করিল এবং পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া ঘুমাইতে আরম্ভ করিল। বয়স্কদের দলটি বাঙালি বটে, তাহারাও বাবা বিশ্বনাথের মাথায় জল দিতে কাশী চলিয়াছে এমনও জানা গেল, কিন্তু বর্ধমান ছাড়াইবার পরও তাহাদের সম্মিলিত এবং সরব বৈষয়িক আলোচনায় কাজলের প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। যাইতেছে কাশীতে, সেটেলমেন্টের খাজনার রসিদ, আমমোক্তারনামা এবং খুড়তুতো ভাইকে জব্দ করিবার জন্য উকিলের আবিষ্কৃত কূটবুদ্ধির বিষয়ে আলোচনা এখন কোন

www.bengaliebook.com

কাজে আসিবে? কাজলের হাসি পাইল। মূর্খের দল! ধর্ম করিতে চলিয়াছে, ধর্মের মূল উপদেশটিই গ্রহণ করে নাই।

একটা পোকা উড়িয়া উড়িয়া আলোর বাবে ঠোক্কর খাইতেছে। সেদিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে কাজল ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুম ভাঙিল খুব সকালে। ট্রেন গুমগুম শব্দ করিয়া একটা বিশাল নদী পার হইতেছে। বাঙ্ক হইতে নামিয়া কাজল জানালা দিয়া বাহিরে তাকাইল। চওড়া নদীগর্ভে ইতস্তত দু-একটা বড়ো পাথর পড়িয়া আছে। বালুকাপূর্ণ নদীখাতের অধিকাংশই শুষ্ক, দু-এক স্থান দিয়া জলধারা বহিয়া চলিয়াছে। এখনও সূর্য ওঠে নাই, প্রভাতের স্নিগ্ধ মাধুর্যে সমস্ত দৃশ্যটি ভরিয়া আছে। দুই অবাঙালি সহযাত্রী উঠিয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের একজন কাজলের দিকে তাকাইয়া হাসিয়া বলিল—ইয়ে শান নদ হ্যায় বাবুজি

দেখিতে দেখিতে শোনের দৃশ্য পিছাইয়া পড়িল।

সূর্য উঠিবার কিছু পরেই মোগলসরাই। কাজল দেখিল তাহার দুই অবাঙালি সহযাত্রীও নামিয়াছে। সে কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনারা কী কাশী যাচ্ছেন?

-হ্যাঁ বাবুজি, কেন?

—আমিও কাশী যাব। যদি টাঙায় যান তাহলে আমি সঙ্গে যেতে পারি। যা ভাড়া লাগবে তার অর্ধেক আমি দেব

নিশ্চয়, আসুন বাবু আমাদের সঙ্গে। ভাড়া কিছু দিতে হবে না। আমরা তো যাচ্ছিই, বাবুজি কী তীর্থ করতে চলেছেন?

www.bengaliebook.com

কাজল জানাইল সে তীর্থ করিতে যাইতেছে না বটে, কিন্তু যাহারা তীর্থ করিতে যায় তাহাদের প্রতি তাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে।

–আমরা বাবা বিশ্বনাথের মাথায় জল দেব বলে যাচ্ছি বাবু। আমার নাম ধরমদাস, এ আমার চাচেরা ভাই, এর নাম রামচরণ। আমরা বিহারের পূর্ণিয়া জেলার লোক, দুভাই মিলে কলকাতায় ব্যবসা করি। এই প্রথম কাশী আসছি।

প্ল্যাটফর্মের কলে কাজল ও তাহার সঙ্গীয় মুখহাত ধুইয়া লইল। ধরমদাস বলিল–চলুন বাবুজি, কিছু নাস্তা করে নিয়ে টাঙায় উঠব।

মোগলসরাই বেশ বড়ো শহর। স্টেশনের বাহিরেই কিছুদূরে রাস্তার উপর হালুইকরের দোকান। তাহারা তিনজনে ঢুকিয়া পুরী-তরকারি, পেঁড়া ও জিলাপি খাইল। কাজল রাবড়িও সইতে চাহিয়াছিল, ধরমদাস ও তাহার সঙ্গী বারণ করিয়া বলিল–এখানে রাবড়ি খাবেন না বাবুজি, কাশীতে রাবড়ি বিখ্যাত–খেলে সেখানেই খাবেন।

খাওয়া হইলে কাজল সঙ্গীদের বারণ না শুনিয়া তিনজনেরই খাবারের দাম মিটাইয়া দিল। ধরমদাস দুঃখিতমুখে বলিল–এ বড়ো জুলুম করলেন বাবুজি, খেলাম তিনজনে মিলে, তাহলে আপনি একা পয়সা দেবেন কেন?

–তাতে কী হয়েছে ধরমদাস ভাই? বাইরে বেরিয়ে অত চুলচেরা হিসেব করলে চলে না। আপনারা তো টাঙার ভাড়া দিয়ে দেবেন বলেছেন, আমি কী তাতে আপত্তি করেছি?

টাঙায় উঠিয়া কাজল বলিল–আপনারা কোথায় উঠবেন কিছু ঠিক করেছেন?

–না। ভালো কোন ধর্মশালায় উঠব ইচ্ছে আছে।

–আমি আপনাদের সঙ্গে থাকলে আপত্তি নেই তো? ভয় নেই, বিরক্ত করব না–

ধরমদাস বলিল–কী বলছেন বাবুজি! বেফিকর চলে আসুন, আমরা খুব খুশি হব –

এবার দূর হইতে বেণীমাধবের ধ্বজাটা দেখিতে পাওয়া মাত্র কাজলের মন কেমন করিয়া উঠিল। এই কাশী! এখানে তাহার বাবার শৈশবের অনেকখানি কাটিয়াছে, ঠাকুরদার স্মৃতি মাখানো রহিয়াছে। ঠাকুমার মমতা এখানকার বাতাস যেন এখনও বহিয়া ফেবে। ধরমদাসকে সে বলিল বটে যে সে তীর্থ করিতে আসে নাই, কিন্তু এও একপ্রকার তীর্থেই আসা।

বাবাব ডায়েরি হইতে ঠাকুরদার বাসার ঠিকানা সে লিখিয়া আনিয়াছে। সম্ভব হইলে আজই একবার জায়গাটা দেখিতে যাইবে।

যে ধর্মশালায় টাঙাওয়ালা তাহাদেব আনিয়া হাজির করিল তাহা খুব বড়ো না হইলেও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। প্রথমেই কাজল ভালো করিয়া স্নান করিল। সকালে হালুইকরদের দোকানে যে পরিমাণ খাওয়া হইয়াছে তাহাতে এবেলা আর না খাইলেও চলিবে। কিন্তু বর্তমানে একটু ঘুমাইয়া লওয়া প্রয়োজন। ট্রেনে সারারাত ভালো ঘুম হয় নাই, বিকালে ঘুরিতে হইলে শরীরটা ঝরঝরে করিয়া লইলে ভালো হয়।

ঘূম হইতে উঠিয়া কাজল দেখিল বেলা পড়িয়া আসিতেছে। জিনিসপত্র ঘরে রাখিয়া কেবলমাত্র টাকার ব্যাগটি সঙ্গে লইয়া সে বাহির হইল। প্রথমে তো কেহই ঠিকানা শুনিয়া কোনও সন্ধান দিতে পারে না, পরে অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়া এবং অনেক ঘুরিয়া মোটামুটি অঞ্চলটা বাহির হইল। কাশীর গলি সম্বন্ধে তাহার কোনও ধারণা ছিল না, পথের সংকীর্ণতা বিষয়ে কলিকাতার

সরু গলিই তাহার ধারণার চরম সীমা। মাকড়সার জালের মতো এতগুলি সরু গলি একসঙ্গে কোনও শহরে থাকিতে পারে তাহা সে জানিত না। রাস্তায় সাইনবোর্ডও নাই যে পথের নাম ও নম্বর দেখিয়া লইবে। শেষে একটি সরু গলির মুখে সিমেন্ট বাঁধানো বোয়াকে বসিয়া তাম্রকূট সেবনরত এক বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিতে বাড়িটার সন্ধান পাওয়া গেল। লোকটি নিতান্ত বৃদ্ধ এবং নিতান্ত শীর্ণ। বিকট একটা কাশির দমক সামলাইয়া লইয়া বলিল–কেন, সে বাড়িতে কী?

-এই, এমনি একটু দরকার আছে

–রামধন মুখুজ্যের কেউ হও নাকি? তাদের এক ভাগ্নে শুনেছি কলকাতায় থাকে।

কাজল সবিনয়ে জানাইল সে রামধন মুখুজ্যের ভাগ্নে নহে।

–আচ্ছা, এগিয়ে যাও, ডাইনে চারখানা দরজা ছাড়িয়ে পাঁচ নম্বরেরটা- বুঝেছো?

কাজল ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া গলিতে ঢুকিল। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন প্রায় ঘনাইয়া আসিয়াছে। ইট বাঁধানো পথে নানা ধরনের বর্জ্যদ্রব্য জমিয়া পরিবেশে একটা স্থায়ী অপ্রীতিকর গন্ধের জন্ম দিয়াছে। এমন সময় বোধহয় না আসিলেই ভালো হইত। সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান, যে বাড়িতে যাইতেছে সেখানেও তাহাকে কেহ চেনে না। সঙ্গে বেশ কিছু টাকাপয়সাও রহিয়াছে। কে জানে, কাশীর গুণ্ডার গুজবটা যদি হঠাৎ সত্য হইয়া পড়ে। একবার মনে হইল ফিরিয়া যায়, কাল সকালে আসিলেই হইবে। তারপরই ভাবিল–দুর ছাই! ভয়ের কী আছে? দেখিই না কী হয়–

ডানদিকে পঞ্চম দরজাটা খোলা। ভিতরে ছোট্ট একটু বাঁধানো উঠানমতো। উঠানের চারদিক ঘিরিয়া দু-তিনটি খুব ছোট ছোট খুপরির মতো ঘর। উঠানের একপ্রান্তে জলের কল (বাবার ডায়েরিতে আছে বাবা কাশীতে প্রথম জলের কল দেখে, এই কলটাই নাকি?) আর ঠিক মাঝখানে একটি তুলসীমঞ্চ। দুইজন বৃদ্ধা একটি ঘরের সামনে বারান্দায় বসিয়া মালা জপ করিতেছে। ঘরের মধ্যে কথাবার্তার আওয়াজ কানে যাইতেছে বটে, কিন্তু কাহাকেও দেখা যাইতেছে না। বারান্দার বৃদ্ধা দুইজন সম্ভবতঃ চোখে খুবই কম দেখে, কাজলের উপস্থিতি গ্রাহ্য না করিয়া তাহারা মালা জপ করিয়া চলিল।

কাজল দাঁড়াইয়া কী করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যা দিবার জন্য একজন প্রৌঢ়া মহিলা প্রদীপ হাতে বাহির হইয়া কাজলকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন-কে? কে ওখানে? কী চাই?

কাজল বলিল—আজ্ঞে আমি, একটু প্রয়োজন ছিল—

—কী প্রয়োজন? কার কাছে এসেছেন?

-আপনি বরং সন্ধেটা দেখিয়ে নিন, তারপর বলছি। ব্যাপারটা বোঝাতে আমার একটু সময় লাগবে।

প্রৌঢ়টি অবাক হইয়া কাজলের দিকে একবার তাকাইয়া তুলসীতলায় প্রদীপ নামাইয়া প্রণাম করিল। এব মধ্যে তাহাদের গলার শব্দ পাইয়া এক ভদ্রলোক ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন। কাজল আন্দাজে বুঝিল-ইনিই রামধন মুখুজ্যে। ভদ্রলোক বলিলেন-কী চাই মশাই? এদিকে আসুন—

কাজল রোযাকের কাছে গিয়া বলিল—আমার নাম অমিতাভ রায়। আমি কলকাতা থেকে আসছি। আপনার সঙ্গে একটু দরকার ছিল—

www.bengaliebook.com

-আপনাকে ঠিক চিনতে পারলাম না তো! কী দরকার?

–দরকার তেমন কিছু নয়। আসলে এই বাড়িতে অনেকদিন আগে আমার ঠাকুরদা আর ঠাকুমা ভাড়া থাকতেন। বাবা তখন খুব ছোট। এই বাড়িতেই আমার ঠাকুরদা মারা যান। আমি আজ সকালে কাশী এসেছি, এমনি বেড়াতে–ভাবলাম বাবার ছোটবেলা কেটেছে যেখানে সে বাড়িটা দেখে যাই।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রামধন মুখুজ্যে বলিলেন–ব্যস, এই কারণে এসেছেন?

–আজ্ঞে হ্যাঁ।

সন্ধ্যা দেখাইতে আসা প্রৌঢ়াটিও অবাক হইয়া তাকাইয়া আছেন। কাজল ইহাদের দোষ দিতে পারিল না। সন্ধ্যার অন্ধকারে একজন অপরিচিত লোক এমন অদ্ভুত অনুরোধ লইয়া উপস্থিত হইল, যা দিনকাল পড়িয়াছে, সন্ত্রস্ত না হইয়া উপায় থাকে না।

রামধন বলিলেন–বাড়িটা দেখতে এসেছেন মানে বুঝলাম না! কীভাবে বাড়ি দেখবেন?

বাড়িটা সে অতসী কাচ হাতে লইয়া গল্পের গোয়েন্দার মতো হামাগুড়ি দিয়া দেখিবে না। কিন্তু অতীতের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত স্থানের প্রতি যে গভীর আকর্ষণ তাহা অন্যকে বোঝানো দুরুহ। বোধটা যাহার মধ্যে আছে, তাহার আছে। যাহাব নাই, নাই।

কাজল বলিল–আজ্ঞে বিশেষ করে দেখার তো কিছু নেই। তবে ঠাকুরদা কোন ঘরটায় থাকতেন সেটা যদি একবার জানতে পারতাম–

www.bengaliebook.com

ঘরের মধ্যে ঢুকিতে চায় যে! রামধন মুখুজ্যে ভাবিতেছিলেন লোকটাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হইবে কিনা, এমন সময় বাহিরের দরজা দিয়া একজন সুবেশ স্মিতদর্শন যুবক ঢুকিয়া উঠানে দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া রামধন যেন গুরুতর সমস্যার হাত হইতে মুক্তি পাইলেন। বলিলেন–এই যে নির্মল, বেড়ানো হল? তুমি একবার কথা বল তো এর সঙ্গে। আমি ব্যাপার ঠিক বুঝতে পারছি নে–

পরে কাজলের দিকে ফিরিয়া ঈষৎ গর্বের সুরে বলিলেন–আমার ভাগ্নে, কলকাতায় ইংরিজি খবরের কাগজের অফিসে চাকরি করে শহরের বড়ো বড়ো সব লোকের সঙ্গে জানাশোনা। আপনি বরং এর সঙ্গে কথা বলুন। কাল এসেছে আমার কাছে বেড়াতে–

যুবকটির বয়েস বছর আটাশ-ঊনত্রিশ, পরনে পায়জামা ও পাঞ্জাবি, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। ছিপছিপে চেহারা, রঙ ফরসা। মুখেচোখে বুদ্ধির ছাপ। সে কাজলের দিকে ফিরিয়া বলিল–কী ব্যাপার ভাই? আপনি কোথা থেকে আসছেন?

যুবকটির আবির্ভাবে কাজল খুশি হইয়াছিল। ইহাকে বিষয়টা বোঝানো সহজ হইবে। নিজের আগমনের কারণ সে পুনরায় খুলিয়া বলিল। তাহার পর হাসিয়া বলিল—কিছুটা নস্টালজিয়া, কিছুটা নিজের ফ্যামিলির ইতিহাসের প্রতি মোহ—এই আর কী! আপনাদের অবশ্য বড়োই কষ্ট দেওয়া হল–

-কিছু নয়। কিন্তু মামা কী বলতে পারবেন এঁরা কোন ঘরে থাকতেন? পুরোনো ভাড়াটেরা এখন আর কেউ নেই। মামাই নিচের সবটা নিয়ে থাকেন।

রামধন বলিলেন—না, আমি বলতে পারব বলে মনে হচ্ছে। কাবণ এদিকের ঘর দুটো বাড়িওয়ালা কখনওই ভাড়া দিত না, নিজেই থাকত। ওপাশের দুটো

www.bengaliebook.com

ঘরের মধ্যে ডানদিকেরটায় পুরোনো ভাড়াটেরা বহুদিন ছিল, আমরা আসায় উঠে গিয়েছে। কাজেই হলে ওই বাঁদিকের কোণের ঘরটাই হবে। দেখবেন? যাও না নির্মল, একবার দেখিয়ে দাও

মোটা দেওয়াল আর নিচু ছাদওয়ালা পুরাতন ঘর। বাতাস ঢুকিবার পথ নাই। উঃ, এই ঘরের মধ্যে তাহার বাবা ছোটবেলায় থাকত! ঘরের মধ্যে গত পঞ্চাশ বছরে একবারও বোধহয় চুনকাম হয় নাই। বিবর্ণ, ধূসর দেওয়ালে সোঁতাধরা দাগ। বর্তমানে ঘরটি বোধহয় বিশেষ ব্যবহার হয় না, কারণ কয়েকটি টিনের তোরঙ্গ এবং এককোণে দাঁড় করানো একটি গোটানো মাদুর ছাড়া ঘরে আর কোনও আসবাব নাই। কড়িকাঠ হইতে ঝুলন্ত তারের ডগায় একটি অল্প পাওয়ারের ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বলিতেছে। তাহার বাবার সময় নিশ্চয়ই বিদ্যুতের আলো ছিল না, পরে হইয়াছে।

বাবার শৈশব, ঠাকুরদার মৃত্যু, ঠাকুমার কত দুঃখ ও সংগ্রাম-এই ঘরে। কাজল অনেকক্ষণ অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিল, যদিও ঘরের শ্রীহীন অভ্যন্তরে বিশেষ করিয়া দেখিবার কিছু ছিল না। নির্মল ছেলেটি বিবেচক, কাজলের মনের অবস্থা অনুমান করিয়া সে চুপ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে কাজল বলিল-চলুন এবার যাই–

ফিরিতে গিয়া চোখ পড়িল দরজার পাশে। সেখানে দেওয়ালের গায়ে একটা কুলুঙ্গি। কুলুঙ্গির নিচের দিকটায় ইঞ্চি দেড়েক জায়গা সিমেন্ট দিয়া বাঁধানো। সেই সিমেন্টের উপর তীক্ষাগ্র কোনো কিছু দ্বারা কী যেন লেখা রহিয়াছে। কৌতূহল হওয়ায় কাজল ঝুঁকিয়া লেখাটা পড়িবার চেষ্টা করিল। পরক্ষণেই সে বুঝিতে পারিল কী লেখা আছে! মুহূর্তের মধ্যে বুকের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ হইতে বুকের গভীরে জমিয়া থাকা কান্নাটা হঠাৎ বাধা না

www.bengaliebook.com

মানিয়া বাহির হইয়া আসিল। অক্ষর কয়টার উপর হাত রাখিয়া কাজল নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল।

নির্মল প্রথমটা খেয়াল করে নাই, সে দরজা দিয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। কাজলকে পেছনে দেখিয়া আবার ঘরে ঢুকিয়া বলিল-কোথায় গেলেন, আসুন—এ কী! কী হল আপনার! কাদছেন কেন?

পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া কাজল চোখ মুছিয়া বলিল—আমার বাবার নাম—বাবাই ছোটবেলায় এখানটায় লিখে রেখেছিলেন। এখনও রয়েছে-

সরিয়া আসিয়া নির্মল লেখাটা দেখিল।

—অপূর্বকুমার রায়। আপনার বাবার নাম? তা আপসেট হয়ে পড়া খুবই স্বাভাবিক। আপনার বাবা কী—

-মারা গিয়েছেন। আমার ছোটবেলাতেই।

—ওঃ।

কী ভাবিয়া কাজল বলিল—আমার বাবাকে হয়তো আপনি চিনবেন। উনি লেখক ছিলেন।

নির্মল একটু অবাক হইয়া কাজলের দিকে তাকাইল, বলিল—লেখক ছিলেন? আপনি কী বিখ্যাত সাহিত্যিক অপূর্বকুমার রায়ের কথা বলছেন? যাকে আজকাল প্রকৃতির পূজারী বলা হয়?

কাজল ঘাড় কাত করিয়া জানাইল-হ্যাঁ।

-বাট অফ কোর্স। তাকে চিনতে পারব না মানে! এই গত হপ্তাতেও অমৃতবাজারে অপূর্ববাবুকে নিয়ে আমার আর্টিকেল বেরিয়েছে-প্রিস্ট অফ নেচার, আপনি তার ছেলে?

কাজল চুপ করিয়া রহিল।

নির্মল কাজলের দুই হাত ধরিয়া বলিল—আসুন, বাইরে আসুন—আপনার সঙ্গে কথা বলি। আমি তো জানতাম না কোনও সময় এই বাড়িতে অপূর্ব রায় থাকতেন! কী আশ্চর্য যোগাযোগ।

বারান্দায় মাদুর পাতিয়া সে ও নির্মল বসিল। ঘটনাটা ততক্ষণে বাড়িতে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। রামধন মুখুজ্যে এবং তার স্ত্রী সাহিত্যের খুব একটা ধার ধারেন না বা প্রিন্ট অফ নেচার অপূর্ব রায়ের নামও শোনেন নাই। কিন্তু নির্মলের বিচারবুদ্ধির উপর তাঁহাদের গভীর আস্থা আছে। তাহারা মোটামুটি আন্দাজ করিয়া লইয়াছিলেন কাজলের বাবা কোনও একটা কারণে বিখ্যাত লোক এবং তিনি শৈশবে এই বাড়িতে থাকিতেন। অবিলম্বে কাজলের জন্য কিছু জলখাবার এবং চা আসিল।

নির্মল বলিতেছিল—গ্রাজুয়েট হয়েই খবরের কাগজে ঢুকি। সেই কলেজ লাইফ থেকেই আপনার বাবা আমার মানসগুরু। আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা পরাধীন দেশে বাস করি আমাদের ভাষার প্রচার নেই, অনুবাদ হয় না। ইউরোপ অথবা আমেরিকার লেখক হলে অপূর্ববাবু নোবেল প্রাইজ পেতেন। মজার কথা কী জানেন, পরশু রাত্তিরে ট্রেনে আসবার সময় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল—তিনিও কাশীতেই আসছিলেন। সাহিত্য ভালোবাসেন। আধুনিক লেখকদের নিয়ে আলোচনা হতে হতে অপূর্ববাবুর কথা উঠল। তিনি বললেন, তিনি আপনার বাবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন—

www.bengaliebook.com

কাজল জিজ্ঞাসা করিল–কে বলুন তো? কলকাতার নোক–

–কলকাতার তো বটেই। তবে এখন ভারতের বাইরে থাকেন, কে আত্মীয়া মারা যাওয়ায় কিছুদিনের জন্য ফিরেছেন বললেন। দিনদশেক কাশীতে থাকবেন, নিজের বাড়ি আছে। ভদ্রলোকের নাম বি. রায়চৌধুরী। আমি কাশীর ঠিকানাও নিয়ে নিয়েছি। আপনি তো দেখছি ফ্যামিলির পুরোনো ইতিহাস খুঁজে বেড়াতে ভালোবাসেন। আমার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে একবার গিয়ে দেখুন না চিনতে পারেন কিনা! নারদ ঘাটের কাছে বাড়ি–

ঠিকানা লইয়া কাজল উঠিল। কথা রহিল কলিকাতায় ফিরিয়া খবরের কাগজের অফিসে সে নির্মলের সঙ্গে যোগাযোগ করিবে। নিজের ঠিকানাও তাহাকে দিল। বামধন মুখুজ্যে বলিয়া দিলেন, কাশীতে আসিলেই যখন ইচ্ছা সে বাড়িটা দেখিয়া যাইতে পারে।

গলির মুখে সেই অতিবৃদ্ধ লোকটি এখনও বোয়াকে বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া বলিলতুমিই রামধন মুখুজ্যের বাড়ি খোঁজ করছিলে না?

-আজ্ঞে হ্যাঁ।

–পেলে?

–হ্যাঁ।

বৃদ্ধ আপনমনে বিড়বিড় করিয়া বলিল—আমিও ওই বাড়িতে ছিলাম, বুঝলে? ছত্তিশ বচ্ছর থাকবার পর রামধন হারামজাদা আমায় উঠিয়ে, অন্য সব ভাড়াটে উঠিয়ে একা একা ভোগদখল করছে। বাড়িওয়ালাকে কী জাদুই যে করল! এই বুড়োবয়সে আমার কী কষ্ট! তারপর আবার হয়েছে হাঁপের ব্যারাম–

কাজল বলিল–হাঁপানির কষ্ট থাকলে তামাকটা কিন্তু না খাওয়াই ভালো–

বৃদ্ধ বলিল–জানি, কিন্তু ছাড়তে পারিনে। তা ও বাড়িতে কী দরকার ছিল?

–ওই বাড়িতে আমার ঠাকুরদা ভাড়া থাকতেন অনেকদিন আগে। বাবা তখন খুব ছোট। তাই একবার জায়গাটা দেখতে এসেছিলাম।

-ভাড়া থাকতেন? কতদিন আগে? কী নাম ছিল তোমার ঠাকুরদার?

তা বছর চল্লিশ আগে তো বটেই। ঠাকুরদার নাম ছিল হরিহর রায়।

বৃদ্ধের ঘোলাটে চোখ মুহূর্তের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল-হরিহর রায়? খোকা, তোমার বাবার নাম কী-অপু? অপূর্ব?

কাজল অবাক হইয়া বলিল–আপনি বুঝি বাবাকে চিনতেন? ঠাকুরদাকে দেখেছেন?

–তোমার ঠাকুরদা মারা যাবার সময় আমি ওবাড়ির ওপরের ঘরে ভাড়া থাকতাম। আমিই গিয়ে লোকজন ডেকে সৎকারের ব্যবস্থা করি। তোমার ঠাকুমা কী

-অনেকদিন মারা গিয়েছেন। বাবা তখন কলেজে পড়েন।

-আর তোমার বাবা? সে কোথায় আছে?

কাজল বলিল–বাবাও বেঁচে নেই, আমার ছোটবেলাতেই মারা গিয়েছেন।

বৃদ্ধ কেমন একটা অসহায় না-বুঝিবার ভঙ্গিতে তাকাইয়া বলিল-কেউ বেঁচে নেই? তোমার বাবাও মারা গিয়েছে? তার তো মরার বয়েস হয়নি

তারপর কাজলকে বলিল–কাছে এসে দেখি, পড়াশুনা করো?

-আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি এবার এম.এ. দেব–

বৃদ্ধ সস্নেহে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল–ভাল। মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া কববে।

কাজল বলিল-আপনার নামটা তো জানা হল না-

–সে জেনে আর কী হবে? আমাকে যারা চিনতে পাবত তারা তো আর কেউ বেঁচে নেই বল্পে। তোমার বাবা থাকলে নন্দবাবু বললে চিনত–

–আমি কিন্তু আপনার নাম জানি–

বৃদ্ধ বলিল–তুমি কীভাবে আমার নাম জানবে? কে বলেছে তোমাকে?

–কেউ বলেনি। কয়েকখানা বই লিখে মারা যাবার আগে বাবা খুব নাম করেছিলেন। তার মধ্যে একখানা বই বাবার নিজের জীবন নিয়ে লেখা। সেই বইতে আপনার নাম আছে

নন্দবাবু একটু থতমত খাইয়া বলিল–আমার কথা? কী লেখা আছে তাতে?

প্রকৃত কথা বলিতে গেলে নন্দবাবুর মদ্যপান ও আনুষঙ্গিক দুশ্চরিত্রতার কথা বলিতে হয়। কাজল বলিল–ওই আপনি যা বললেন, ঠাকুরদার মৃত্যুর সময়ে আপনার সাহায্যের কথা।

—শুধু ওই?

—আর কী থাকবে?

বৃদ্ধ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল–নাঃ, কিছু না—আর কী থাকবে।

বিদায় লইয়া কিছুদুর আসিয়া পিছন ফিরিয়া কাজল দেখিল নন্দবাবু প্রস্তরমূর্তির মতো বোয়াকে বসিয়া আছে। আবার সে হয়তো কাশী আসিবে, এই বাড়িটা দেখিতে আসিবে-কিন্তু তখন নন্দবাবু বোধহয় আর থাকিবে না।

মহাকালের ঘটিকাযন্ত্র নিপে কাজ করিয়া চলিয়াছে। আগ্রহী জন ছাড়া কে তার নিঃশব্দ প্রহর ঘোষণা শুনিতে পায়?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পরের দিন সকালের দিকেই কাজল নারদ ঘাটের ঠিকানাটায় খোঁজ করিতে গেল।

এবার অবশ্য ঠিকানা বাহির করিতে অসুবিধা হইল না। রাস্তার উপরেই বেশ বড়ো বাড়ি। সামনে লোহার কারুকার্য করা ফটক। দেখিলেই মনে হয় বেশ ধনীর বাড়ি—যদিও এখন কিঞ্চিৎ শ্রীহীন। ভিতরে লোকজনও বিশেষ আছে বলিয়া মনে হইল না। ফটকের ভিতরেই একজন বিহারী দারোয়ান বসিয়া খৈনি ডলিতেছে। কাজল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল- বাবু আছেন?

নিচের ঠোঁটটা টানিয়া চূর্ণীকৃত খৈনি সেই গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া দারোয়ান বলিল—ববালিয়ে বাবুসাহেব, কিৎসকো চাহিয়ে?

—মিঃ রায়চৌধুরী আছেন? আমি তার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।

—জী, আইয়ে—

পুরাতন ধরনের আসবাবে সাজানো ড্রয়িংরুমে তাহাকে বসাইয়া লোকটা ভিতরে খবর দিতে গেল। ঘরে বিচিত্র গঠনের সেকেলে মেহগনি কাঠের চেয়ার, মেঝেতে বহু ব্যবহারে জীর্ণ সূতা বাহির হওয়া কার্পেট, কাঁচের টপ সমন্বিত ভারি টেবিল, দেওয়ালের সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো বিলাতি ল্যান্ডস্কেপ-সমস্তই এই পরিবারের হৃত গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে। তাহার বাবার সহিত ইহাদের কীরূপ যোগাযোগ ছিল?

ভিতরের দরজা দিয়া একজন অত্যন্ত সুপুরুষ বছর পঞ্চাশ-বাহান্নর ভদ্রলোক ঘরে ঢুকিয়া একটু বিস্ময়ের সঙ্গে কাজলের দিকে তাকাইলেন।

কাজল দাঁড়াইয়া নমস্কার করিয়া বলিল–আমি একবার মিঃ রায়চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে চাই–

প্রতিনমস্কার করিয়া ভদ্রলোক বলিলেন-আমিই বিমলেন্দু রায়চৌধুরী। কী দরকার বলুনতো? আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি বলে মনে হচ্ছে-বসুন!

বসিয়া কাজল বলিল–আমাকে বোধহয় কোথাও দেখেন নি। এবার কাশীতে আসার সময় ট্রেনে একজন সাংবাদিক ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছিল, তার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে আসছি-

বিমলেন্দু বলিলেন–ট্রেনে! ওঃ হ্যাঁ, নির্মল চট্টোপাধ্যায় বলে এক ইয়াং ভদ্রলোক-তাঁর কাছ থেকে ঠিকানা পেয়েছেন? আমি কী আপনার কোনও কাজে আসতে পারি?

কথা বলিতে বলিতে কাজল ভদ্রলোককে লক্ষ করিতেছিল। প্রৌঢ়ত্বের প্রথম ধাপে দাঁড়াইয়াও মানুষটি দেখিতে আশ্চর্য রকমের সুন্দর। যৌবনেও লোকে এত রুপবান হয় না। কাব্যে নারীসৌন্দর্যের জয়গান আছে, কিন্তু পুরুষও যে এত সুন্দর হইতে পারে তাহা সে এই প্রথম দেখিল।

কাজল বলিল–আমি কোনও কাজ নিয়ে আপনার কাছে আসিনি, কেবল একটা বিষয় জানবার খুব কৌতূহল হওয়ায় এসেছি। সেদিন ট্রেনে আপনি আর নির্মলবাবু সাহিত্যিক অপূর্বকুমার রায়ের প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলেন, তাই না? আপনি বলেছিলেন অপূর্ব রায়ের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, সেই পরিচয়ের ব্যাপারটা আমি একটু জানতে চাই-

বিমলেন্দু বলিলেন–আপনিও কী সাংবাদিক? আর্টিকেল লিখবেন?

–আজ্ঞে না।

-তবে? এ প্রসঙ্গে আপনার উৎসাহের কারণ কী?

কাজল একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আমি অপূর্বকুমার রায়ের ছেলে, আমার নাম অমিতাভ রায়।

বিমলেন্দু প্রথমে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন, যেন কাজল কী বলিয়াছে তিনি শুনিতে পান নাই। তাহার পর তাহার মুখের উপর দিয়া পরপর অনেকগুলি ভাবের ঢেউ খেলিয়া গেল। সটান দাঁড়াইয়া উঠিয়া তিনি বলিলেন—আপনি—তুমি অপূর্ববাবুর ছেলে! অই তোমাকে দেখে প্রথমেই তোমাকে কেউ বলেনি তোমার চেহারা অবিকল তোমার বাবার মতো? কেবল মনে হচ্ছে কোথায় দেখেছি—এখন বুঝলাম। এই বয়েসে তোমার বাবা ঠিক এইরকমই দেখতে ছিলেন। তুমি কাশীতে কী করছো?

বেড়াতে এসেছি। ছোটবেলায় বাবা কাশীতে থাকতেন জানেন বোধহয়, বাবার ডায়েরি থেকে ঠিকানা পেয়ে সে বাড়িটা দেখতে এসেছিলাম। সেখানেই তো নির্মলবাবুর সঙ্গে পরিচয়। উনি আপনার কথা বললেন-

বিমলেন্দু অস্ফুটস্বরে বলিলেন—কী আশ্চর্য যোগাযোগ! আমার সঙ্গে ট্রেনে নির্মলবাবুর আলাপ হওয়া, তোমার কাশী আসা-আবার তোমার সঙ্গে নির্মলবাবুর দেখা হওয়া—জানো, এইসব কারণে মাঝে মাঝে বিশ্বাস হয় ভগবান আছেন।

কাজল বলিল-কিন্তু আপনার সঙ্গে বাবার পরিচয় কীভাবে হয়েছিল তা তো বললেন না?

www.bengaliebook.com

প্রশ্নটা শুনিয়া বিমলেন্দু কিছুক্ষণ কাজলের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তারপর বলিলেনতোমার বাবার প্রথম উপন্যাসখানা যে আত্মজীবনীমূলক সেটা নিশ্চয় জানো?

-আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তাতে লীলা বলে একজনের কথা আছে জানো?

কাজলের বুকের মধ্যে রক্ত চলকাইয়া উঠিল, সে বলিল-জানি।

-লীলা আমার দিদি।

কাজলের মাথার ভিতর কেমন করিয়া উঠিল। লীলার ভাই বিমলেন্দু! তাই বটে, বাবার বইয়েও নাম বিমলেন্দুই আছে। লীলা! বাবার উপন্যাস পড়িয়া, ডায়েরি পড়িয়া কাজল বুঝিয়াছে লীলার সহিত তাহার বাবার কী গভীর সম্পর্ক ছিল। রক্তমাংসের মানব-মানবীর সাধারণ পারস্পরিক আকর্ষণ নয়, তাহা হইতে অনেক উচ্চস্তরের এক সম্পর্ক—বোঝা যায়, কিন্তু বোঝানো যায় না। সেই লীলার ভাই ইনি!

কাজল অগ্রসর হইয়া বিমলেন্দুকে প্রণাম করিল।

হৃদয়াবেগ কিছুটা প্রশমিত হইলে বিমলেন্দু বলিলেন—অপূর্ববাবু বিয়ে করেছেন জানতাম, কারণ বিয়ের পর একবার আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। এই বাড়িতেও উনি এসেছেন-তোমার মায়ের মৃত্যুর পর। কিন্তু তোমার কথা উনি আমাকে বলেন নি। তুমি কী করছে এখন?

—আমি এইবার এম.এ. দেব। ইংরিজিতে—

–বাঃ, খুব ভালো কথা। তারপর কী করবে কিছু ভেবেছো?

কাজল সসংকোচে জানাইল–এ বিষয়ে সে কোনও সিদ্ধান্ত নেয় নাই।

কিছুক্ষণ কথা বলিবার পর বিমলেন্দু বলিলেন-বোসো একমিনিট, তোমার জন্য একটু জলখাবারের কথা বলে আসি-

কাজল আপত্তি করিতে যাইতেছিল, বিমলেন্দু তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। মিনিট-দুই পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন–বাড়িতে যা রয়েছে তাই দিতে বললাম। এ বাড়ি আমার মায়ের, বৃদ্ধা অবস্থায় মা মারা গিয়েছেন আজ মাসদুই হল। আমি তখন বিলেতে, আমার ফিরে আসতে আসতে শ্রাদ্ধশান্তি সব চুকে গিয়েছিল। আমি হচ্ছি ডিজাইনিং আর্কিটেক্ট, বুঝলে? একটা কনট্রাকটর চাকরি নিয়ে বিলেত গিয়েছিলাম, তার মেয়াদ ফুরোতে এখনও বছর-দুই বাকি। সামনের মাসেই আমি আবার ফিরে যাচ্ছি লন্ডনে, এবার একেবারে চাকরি শেষ করে তবে ফিরব। এ বাড়ি ততদিন তালাবন্ধ থাকুক, পরে যাহোক ব্যবস্থা করা যাবে।

এইসময় জলখাবারের থালা হাতে ঘরে ঢুকিল আঠারো-উনিশ বৎসর বয়েসের একটি মেয়ে। ভদ্রতাবিরুদ্ধ হয় বলিয়া কাজল একবার তাকাইয়াই চোখ নামাইয়া লইল বটে, কিন্তু তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল আর একবার তাকাইয়া দেখে। মেয়েটি ভারি সুন্দরী, গাঢ় বেগুনী রঙের শাড়ি চাপাফুল গাত্রবর্ণের সঙ্গে মানাইয়াছেও ভালো।

বিমলেন্দু বলিলেন–খাবার টেবিলে রাখ, তারপর একে প্রণাম কর–এ আমাদের পরিবারের খুব পুরোনো বন্ধুর ছেলে, আমাদের আপনার লোক।

www.bengaliebook.com

মেয়েটি সলজ্জ ভঙ্গিতে আগাইয়া আসিয়া কাজলকে প্রণাম করিল। প্রণাম পাইবার অভ্যাস নাই, অভিজ্ঞতাটা এতই অভিনব যে বাধা দিবার আগেই ঘটিয়া গেল।

প্রণাম করিয়া উঠিবার সময় মেয়েটি চোখ নিচু করিয়া ছিল, কাজল লক্ষ করিল মেয়েটির চোখের পাতা আশ্চর্যরকম লম্বা।

বিমলেন্দু বলিলেন—এ হচ্ছে তুলি, দিদির মেয়ে।

উদ্বেগ, অজানা কী এক আবেগে কাজলের গলার কাছে গুটলি-গুটলি কী যেন আটকাইয়া যাইতে লাগিল। লীলার মেয়ে। ছোটবেলায় বাবার ডায়েরিতে ইহারই সঙ্গে তাহার বিবাহের প্রসঙ্গে বাবার ইচ্ছার কথা সে পড়িয়াছে। না না, ও কথা মনে রাখা উচিত নয়। সে অনেকদিনের কথা, সেসব কথা নিশ্চয় বাবা কাহাকেও বলে নাই, কেবল ডায়েরিতে লিখিয়াছিল মাত্র।

সাম্প্রতিক মানসিক দুর্যোগ এড়াইবার জন্য সে খাবারের প্লেটটা হাতে তুলিয়া যা হোক একটা কী হাতে লইয়া খাইতে শুরু করিল।

বিমলেন্দু বলিলেন—তুলি, তুই একটু অমিতাভর কাছে বোস। আমি লালুয়াকে কয়েকটা চিঠি পোস্ট করতে দিয়ে আসি, এরপর আবার ডাক ধরতে পারবে না

বিমলেন্দু চলিয়া গেলেন। মেয়েটি দাঁড়াইয়া ছিল, কাজল বলিল-দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন না! আমার পরিচয়টা না দিয়েই অবশ্য আপনার মামা চলে গেলেন

টেবিলের অপর দিকে একটা চেয়ারে বসিয়া তুলি বলিল—আমি মামার কাছে শুনেছি।

ইউনিভার্সিটিতে নিমন্ত্রণবাড়িতে কাজল সুন্দরী মেয়ে কম দেখে নাই, কিন্তু তুলির দিকে ভালো করিয়া তাকাইয়া কাজল অবাক হইয়া গেল। ভালো করিয়া দেখিতে বাধা নাই, তুলি চোখ নিচু করিয়া আছে। একমাথা ঘন চুল, যেন শিল্পীর আঁকা দুই ভূ, পুরন্ত ঠোঁটের নিচে চিবুকের সুন্দর খাঁজ, তাছাড়ানাঃ, এভাবে কোনও বিচার হয় না, আসলে মেয়েটির এমন একটা শ্রী আছে যাহা বুঝাইয়া বলা যায় না-বুঝিতে গেলে দেখিতে হয়। নিজের সমস্ত উপস্থিতির দ্বারা মেয়েটি অনন্য।

কাজল বলিল—মামার কাছে কী শুনেছেন? আমাদের সম্বন্ধে আগে জানতেন আপনি?

তুলি তাহার ডাগর শান্ত চোখ তুলিয়া বলিল—আমি-আপনার বাবাকে দেখেছি। তখন আমি খুব ছোট, এই বাড়িতে। ওঁর সব বই আমার অনেকবার করে পড়া-

তারপর আবার চোখ নামাইয়া বলিল—আমাকে আপনি বলবেন না-

খাবারের শূন্য প্লেট নামাইয়া কাজল বলিল-বাবার কোন্ বইটা তোমার সবচেয়ে ভালো লাগে?

সব বই-ই ভালো লাগে। তবে সবচেয়ে ভালো লাগে ওঁর লেখা প্রথম বইখানা।

পরে একটু বিষয় হসিয়া বলিল—ওতে আমার মায়ের কথা আছে—

www.bengaliebook.com

তুলির বিষণ্ণ হাসিটা কাজলের হৃদয়ের মর্মস্থানে আঘাত করিল। বেচারা! ও নিশ্চয় নিজের মায়ের শূন্যতাময়, ব্যর্থ জীবনের কথা জানে। সে বলিল—তুমি কী এইখানেই থাকো?

-হ্যাঁ। দিদিমা এই বাড়িতে থাকতেন, মা মারা যাবার পর দিদিমার কাছেই আমি মানুষ হয়েছি। দিদিমাও মারা গিয়েছেন আজ দু-মাস। এবার হয়তো কলকাতা চলে যাব

-ভবানীপুরের বাড়িতে থাকবে?

তুলি অবাক হইয়া তাকাইল—ভবানীপুরের বাড়ির কথা আপনি জানেন?

-জানি। বাবার ডায়েরিতে পড়েছি। তোমাদের-তোমার মায়ের অনেক কথা আছে তাতে-

তুলি আগ্রহের সঙ্গে বলিল—মায়ের কথা। আমাকে সে ডায়েরি একবার পড়াবেন?

-বেশ তো। তুমি কলকাতায় গিয়ে তোমাদের ঠিকানা আমাকে জানিও, আমি তোমাকে পড়তে দিয়ে আসবো। আমার ঠিকানা তোমার মামার কাছে দিয়ে যাচ্ছি।

তুলি ঘাড় কাত করিয়া সম্মতি জানাইল, তারপর বলিল—ভবানীপুরের বাড়ি কিন্তু আর নেই, বিক্রি হয়ে গিয়েছে। বড়োমামার কথা জানেন কিনা, তব নাম রমেন, তিনি নানারকম বদখেয়ালে সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করে ফেলেছেন। কেবল বর্ধমানের বাড়িটা আছে, তাও হয়তো শিগগিরই দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে যাবে। ছোটমামা, এই মামা, তিনি কিছু নেন নি। পড়াশুনো করে নিজের পায়ে

www.bengaliebook.com

দাঁড়িয়েছেন। আপনার বাবার বইতে আমাদের কথা যেমন পড়েছেন, আমরা এখন কিন্তু আর তেমন নেই—এখন আমরা গরিব হয়ে গিয়েছি।

কাজল বলিল—আমাকে তুমি এসব কথা বলছো কেন তুলি? আমাদের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্কটা অন্যরকম, তোমরা গরিব কি বড়োলোক তাতে কিছু এসে যায় না।

পরে আলোচনার মোড় অন্যদিকে ফিরাইবার জন্য বলিল—তুমি পড়াশুনো করো তো?

-ছোটবেলায় স্কুলে পড়েছি, বড় হবার পর বাড়িতে মাস্টারমশাই এসে পড়িয়ে যান। এখানে বাঙালি মেয়েদের পড়বার মতো তেমন ভালো ইস্কুল নেই কিনা। ইচ্ছে আছে এইবারে কলকাতায় কোথাও ভর্তি হয়ে ম্যাট্রিকটা দিয়ে দেব-

এইসময় বিমলেন্দু ফিরিয়া আসিলেন।-তোমার খাওয়া হয়ে গিয়েছে দেখছি, চা খাবে? কাজল জানাইল-এইসময়ে সে চা খায় না।

—তুমি আসায় আমি যে কত খুশি হয়েছি তা বলতে পারি না। দেখা যখন হল, এবার থেকে মোগাযোগ রাখবে, কেমন? তোমার ঠিকানাটা দাও দেখি-

কাজল নিজের ঠিকানা লিখিয়া দিয়া বিমলেন্দুকে বলিল—আপনার ঠিকানাটা?

—আমি কিছুদিনের মধ্যেই কাশী থেকে চলে যাচ্ছি, কলকাতায় কোথায় উঠব এখনও কিছু ঠিক হয়নি। মাসখানেকের মধ্যে চিঠি দিয়ে তোমাকে জানাব-

বিদায় দিতে আসিয়া ফটকের কাছে বিমলেন্দু বলিলেন—অনেক কথা তোমায় বলবার আছে, বাবাকে তুমি বেশিদিন পাও নি, তোমারই দুর্ভাগ্য। আর একটু বেশি বয়েস পর্যন্ত তার সাহচর্য পেলে সেটা তোমার জীবনের অক্ষয় সৌভাগ্য

www.bengaliebook.com

হয়ে থাকত। অমিতাভ, আমি জোর গলায় বলছি–অমন মানুষ হয় না। সে সব কথা একদিন তোমাকে বলব-

–আপনি আর কদিন আছেন কাশীতে?

–দিন-পনেরো খুব বেশি হলে। তুমি?

-আমার তেমন কিছু ঠিক নেই, তবে হপ্তাখানেকের বেশি হয়ত্বে থাকবো না–

বিমলেন্দু বলিলেন-সন্ধের দিকে আমি রোজই একবার দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে বেড়াতে যাই। ওখানে যদি ওইসময়ে কখনও আসে, তাহলে দেখা হতে পারে।

ধর্মশালায় ফিরিতে ফিরিতে কাজলের মনে হইল আকাশ-বাতাসের রঙ যেন বদলাইয়া গিয়াছে। এক ধরনের ঘটনা আছে, যাহা ঘটিয়া গেলে জীবনের অর্থ সম্পূর্ণ বদলাইয়া যায়–কিছুই আর যেন পুর্বের মতো থাকে না। তুলির সহিত দেখা হওয়াটা ঠিক সেইরকমের ঘটনা। ডায়েরিতে বাবার গৃঢ় ইচ্ছাটা পড়িয়া থাকিবার জন্যই হোক বা প্রথম যৌবনের আশীর্বাদপূত অলৌকিক বয়েসে সুন্দরী একটি মেয়ের সহিত পরিচয় ঘটিয়া যাইবার জন্যই তোক, তাহার ভিতরে এতদিনকার ঘুম ভাঙিয়া কে যেন জাগিয়া উঠিল। সবই ঠিক আছে, সে সেই পুরাতন অমিতাভই রহিয়াছে, তবু সে যেন ঠিক পুরাতন মানুষটা নহে।

রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া ঘুম আসিতেছিল না। ধরমদাস আর রামচরণ আজ নৌকায় করিয়া রামনগর গিয়াছিল। সেখানকার রাজবাড়ি দেখিতে যাইবার পথে এক সাধুর দর্শন পায়। সেই গল্প ধরমদাস উৎসাহের সহিত করিয়া চলিয়াছে। খুব ভারি সাধু, কেবল মুখের দিকে তাকাইয়া ভূতভবিষ্যৎ বলিয়া

দিতে পারেন, হাত অবধি দেখিবার প্রয়োজন বোধ করেন না। ধরমদাসের যে বর্তমানে সময়টা ভালো যাইতেছে না, আর রামচরণের ছোটবেলায় বসন্ত হইয়াছিল—এসব তো তাহারা গিয়া বসিবামাত্র বলিয়া দিলেন। অনেক ভাগ্যে এমন সাধুর দর্শন মেলে।

শুনিতে শুনিতে কাজল অন্যমনস্ক হইয়া গেল। তুলিকে তাহার এত ভালো লাগিল কেন? সুন্দরী বলিয়া? কিন্তু সুন্দরী মেয়ে তো সে অনেক দেখিয়াছে—অবশ্য তুলি সত্যই অদ্ভুত সুন্দরী, তাহার দেখা অনেকের অপেক্ষা বেশি, তবু বোধহয় কেবল বাহিরের সৌন্দর্য তাহাকে মুগ্ধ করে নাই। লীলার মেয়ের সহিত তাহার বিবাহ হইবার যে সম্ভাবনার কথা বাবা ডায়েরিতে প্রকাশ করিয়াছে সেই মধুর সম্ভাবনার ইঙ্গিত মনের জানালা দিয়া তাহার চেতনার গভীরে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিল। আর একটা বড়ো কারণ—তুলির বর্তমান জীবনের অসহায়তা। লীলার হীরক রায়ের সঙ্গে গৃহত্যাগের ঘটনা কাজল জানে, তাহা লইয়া সমাজে বিশ্রী ঘোট হইয়াছিল তাহাও তাহার অজানা নাই। সত্যই তুলির বিবাহ হওয়া কঠিন। যতই সুন্দরী হোক, অমন মায়ের মেয়েকে কেহ গৃহবধূ করিয়া ঘরে তুলিয়া লইবে না। কিন্তু বাবার বই পড়িয়া মনে মনে সে লীলাকে দেবীর আসনে বসাইয়াছে। মনের দেবমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত সেই মূর্তির গায়ে কোনো কলঙ্কের দাগ পড়িতে পাবে না। সমাজ যাহাই বলুক, লীলাকে বিচার করিবার দায়িত্ব তাহার উপর ন্যস্ত নাই, সে অধিকারও তাহার নাই।

অকস্মাৎ তাহার চমক ভাঙিল। নাঃ, মনে একটা গুরুতর পরিবর্তন আসিয়াছে বটে! এতক্ষণ ধরিয়া সে কেবলই তুলির কথা চিন্তা করিয়াছে, অথচ গতকাল এইসময়ে শুইয়া সে মায়ের কথা ভাবিতেছিল। জীবন এমনভাবেও বদলায়!

ধরমদাস এবং রামচরণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া চারদিন পর কাজল দিল্লির ট্রেন ধরিল। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস তাহাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ

www.bengaliebook.com

করে। মহাভারতের যুগ হইতে দিল্লি ভারতীয় সংস্কৃতি এবং প্রাণস্রোতের প্রধান কেন্দ্র, তাহা দেখা না হইলে দেশের ইতিহাস অজানা থাকিয়া যাইবে।

দিল্লি পৌঁছিয়া কাজল লাল দরওয়াজার কাছে একটা ভদ্র অথচ কম খরচের বাঙালি হোটেল খুঁজিয়া বাহির করিল। মালিকের নাম তিনকড়ি দাস, মধ্যবয়স্ক এবং অতীব বিনয়ী। দুই হাত ঘষিয়া তিনি বলিলেন–ছাত্র কিনা? বেড়াতে এসেছেন? দেখুন ঠিক ধরেছি! আপনার বয়েসী বাঙালি যাত্রী যাঁরা দিল্লি বেড়াতে আসেন তারা অধিকাংশই আমার এখানে ওঠেন কিনা। তা যাই হোক, চাকর আপনার ঘর দেখিয়ে দিচ্ছে, স্নান-টান সেরে বিশ্রাম করে খেয়ে নিন, তারপর টানা একখানা ঘুম দিন। ওবেলা কাছাকাছি দু-একটা জায়গা ঘোরবার ব্যবস্থা করে দেব। কাল থেকে সত্যিকারের বেড়াবেন–

হোটেলের অপর একদল অতিথির সহিত তিনকড়িবাবু তাহার টাঙায় ঘুরিবার আয়োজন করিয়া দিলেন। ব্যবস্থাটা বিশেষ মনঃপূত না হওয়া সত্ত্বেও কাজল মানিয়া লইল। ধরমদাস এবং রামচরণ বরং সঙ্গী হিসাবে ইহাদের অপেক্ষা ভালো ছিল, তাহারা অশিক্ষিত হইলেও সরল এবং উদার। এই বাঙালি পরিবারটির ক্রমাগত লম্বা-চওড়া কথায় আর চালবাজিতে কাজল অবিলম্বে বিরক্ত হইয়া উঠিল। কুতবের পাশে ইলাহি মিনার দেখিয়া এবং পরে পুরানা কিল্লার পাশে দাঁড়াইয়া দলের একজন বলিলেন–নাঃ, এই ভাঙাচোরা ইট-পাথরের স্তূপ দেখতে লোকে এত পয়সা খরচ করে বেড়াতে আসে কেন বুঝি না! হুমায়ুনের কবরটা তবু ভালো–

কাজল থাকিতে না পারিয়া বলিল–দেখুন, ঐতিহাসিক নগরী তো আর সবটা হীরে-মুক্তো দিয়ে গাঁথা হবে না, এর ইতিহাসটাই আসল। এখানে দাঁড়িয়ে আপনার পুরোনো দিনের কথা ভেবে অবাক লাগছে না?

লোকটি মৃদু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল—কী জানি মশাই, আপনারা হলেন একালের লেখাপড়া জানা আধুনিক মতের ছেলে, আমরা চোখের ভালো লাগাটাকে অনেক দাম দিইএককাড়ি টাকা খরচ করে ফ্যামিলি নিয়ে এলুম কী এই দেখতে? এর চেয়ে আমাদের কলকাতায় ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল কিংবা পরেশনাথের মন্দির খারাপ কী?

কাজল কথা বাড়াইল না। এ ধরনের কল্পনাশক্তির লেশহীন মানুষ সে আরও কয়েকজন দেখিয়াছে। ইহাদের বুঝাইবার চেষ্টা করা বৃথা। বাল্যসঙ্গী চনুর কথা মনে পড়ে। জ্যোৎস্নারাত্রিতে তাহার কোনও বিচিত্র অনুভূতি হয় কিনা জিজ্ঞাসা করাতে সে অবাক হইয়া না-বুঝিবার দৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিল। সেই প্রথম শিশুবয়েসের অপরিণত বুদ্ধিতেও কাজল পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের চিন্তাধারার সহিত তাহার পার্থক্য আরছা আন্দাজ করিয়াছিল। বড়ো হইয়া উঠিবাব সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝিতে পারিয়াছিল তাহার জীবন খুব সুখের হইবে না। মানুষ কেবলমাত্র খাইয়া-পবিয়া বাঁচে না, তাহার মনের সঙ্গীব প্রয়োজন হয়। আর নিজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কাজল বুঝিয়াছে-তেমন সঙ্গী পৃথিবীতে খুবই কম।

হুমায়ুনের সমাধি দেখিতে গিয়া তাহার খুবই ভালো লাগিল। তখন বিকাল হইয়া আসিয়াছে। নির্জন নিজামউদ্দিন দিনাবসানের শান্ত ছায়ায় ঝিমাইতেছে। একজন বৃদ্ধ মুসলমান গাইড তাহাদের সবকিছু ঘুরিয়া দেখাইল। হুমায়ুনের পাথরে বাঁধানো কবর দেখাইয়া বৃদ্ধটি বলিল—এটা কিন্তু নকল কবর বাবু, আসল কবর রয়েছে এর নিচে, মাটির তলায়, যাবেন?

সঙ্গীরা কেহ রাজি হইল না। অজানা জায়গা, তাহার উপর নিজামউদ্দিন এমনিতেই নির্জন স্থান, অপরিচিত মুসলমান বৃদ্ধের সহিত মাটির নিচে তিনশত বৎসর পূর্বে মরিয়া ভূত হইয়া যাওয়া মোগল সম্রাটের সমাধি দেখিতে যাইবার উৎসাহ নাই কাহারও। কাজল একাই চলিল। আসল

www.bengaliebook.com

সমাধিতে পৌঁছিতে হইলে স্মৃতিসৌধের ভিত্তির নিচে একটি সুড়ঙ্গ দিয়া অনেকটা পথ যাইতে হয়। সুড়ঙ্গের মধ্যে ঘোর অন্ধকার, পথপ্রদর্শক বৃদ্ধটি একটি ছোট দুই-পয়সা দামের মোমবাতি জ্বালাইয়া হাতে লইয়াছে। পায়ের নিচে জমি উঁচুনিচু, সর্বত্র সমান নহে, সাবধানে না চলিলে হোঁচট খাইবার সম্ভাবনা। অনেকগুলি বাঁক পার হইয়া বৃদ্ধ তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। শেষে একটি অন্ধকার, বাদুড়ের ডানার শব্দে পূর্ণ চতুষ্কোণ ছোট্ট ঘরে আসিয়া যাত্রা শেষ হইল। অনাড়ম্বর একটি কবর দেখাইয়া বৃদ্ধ বলিল—য়হ বাদশা হুমায়ুন শোয়ে হয়ে হে

কাজল যুক্তকরে নমস্কার করিল। কে জানে হুমায়ুন প্রকৃতপক্ষে মানুষ হিসাবে কেমন ছিলেন, প্রণামের যোগ্য ছিলেন কিনা! তাহার প্রণাম প্রাচীনত্বের প্রতি, একজন স্বাধীন সম্রাটের প্রতি। বৃদ্ধ মুসলমান কাজলের প্রণাম লক্ষ করিয়া খুশি হইয়াছিল, উৎসাহের প্রাবল্যে সে ফিরিবার পথে উর্দুতে মোগল আমলের কত ইতিহাস শানাইতে লাগিল। কাজল তাহার কিছু বুঝিল, কিছু বুঝিল না।

দলের সকলে বাহির হইবার মূল দরজার কাছে অপেক্ষা করিতেছিল। কাজলকে অক্ষতদেহে সুড়ঙ্গ হইতে বাহির হইতে দেখিয়া তাহারা যেন ভারি অবাক হইল। টাঙায় উঠিয়া দলের চালাক সদস্যটি বলিল—ধন্য আপনার সাহস মশায়! কী বলে একটা অচেনা মুসলমানের সঙ্গে ওই অন্ধকূপে ঢুকলেন? জানেন, ওরা আগে থেকে ওইসব জায়গায় গুণ্ডা বসিয়ে রাখে, তারপর নিরীহ যাত্রীকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে তার টাকাকড়ি কেড়ে নেয়—দিতে আপত্তি করলে ছুরি মারে!

কাজল হাসিয়া বলিল-মুসলমান মানেই খারাপ লোক নয়, যেমন হিন্দুরা সবাই দেবতুল্য নয়। তাছাড়া আমার কাছে ছিলই বা কত? মেরে ওদের লাভ কী? বরং ভয় করলেন বলে ভালো একটা জিনিস দেখা থেকে বাদ পড়লেন

www.bengaliebook.com

ভদ্রলোকের মুখ দেখিয়া মনে হইল কাজলের কথা তাহার মনে ধরে নাই। তিনি বলিলেন– তা হোক মশাই, তবু ওদের বিশ্বাস নেই–

কাজল চুপ করিয়া রহিল।

হোটেলে ঢুকিতেই তিনকড়ি দাস বলিলেন–এই যে সব ফিরেছেন দেখছি। তা বেড়ানো কেমন হল বলুন? ভালো লাগছে দিল্লি শহর?

কাজল বলিল–ভাল লাগছে বইকি। ছোটবেলা থেকে ইতিহাসের বইতে যা পড়েছি সে-সব চোখের সামনে দেখলে রীতিমতো রোমাঞ্চ হয়

-আর অমরবাবু? আপনার?

অমরবাবু অর্থাৎ কাজলের সঙ্গী সেই ভদ্রলোক, বিবক্তমুখে চুপ করিয়া রহিলেন। কাজল বলিল–ওঁর বোধহয় বিশেষ ভালো লাগছে না। কুতবের চাইতে নাকি ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল ভালো

অমরবাবু রাগিয়া বলিলেন–কথা ঘোরাবেন না, কুতবের কথা আমি মোটেই বলিনি, ভাঙা ইটের গড়টার কথা বলেছি

তিনকড়িবাবু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কাজলের দিকে তাকাইতে সে বলিল–পুরানা কিল্লা ওঁর পছন্দ হয়নি।

খরিদ্দার লক্ষ্মী এবং খরিদ্দার সবসময়ই সঠিক–তাহার সহিত তর্ক করিতে নাই, ইহাই ব্যবসার মূলমন্ত্র। কাজেই তিনকড়িবাবু অচিরাৎ প্রসঙ্গ বদলাইয়া বলিলেন–যান, আপনাবা ফ্রেশ হয়ে নিন, আজ শনিবার–প্রতি শনিবাব আমাদের হোটেলে স্পেশাল ফিস্ট হয়। আজ পোলাও হচ্ছে, সঙ্গে

www.bengaliebook.com

এলাহাবাদের বড়ো বড়ো পাবদা মাছের তেলঝাল, কষা মাংস, মাছের পুর দিয়ে পটলের দোলমা। শেষপাতে রাবড়ি-কেমন?

অমরবাবু সুরুৎ করিয়া শব্দ করিযা সপরিবারে দোতলায় নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। কাজল বলিল–এতসব আয়োজন করেছেন, প্রতি শনিবাবেই হয় নাকি?

হয়, তবে এতটা নয়। মাংস আর পোলাওটা করবার চেষ্টা করি মাঝে মাঝে, যখন অনেক বাঙালি অতিথি থাকে তখন একটু ভালো রান্নাবান্না হয়। বসুন, দুটো কথা বলা যাক–সিগারেট চলে?

তিনকড়ি দাস কাজলকে একটা কঁচি সিগারেট দিয়া নিজেও একটা ধরাইলেন।

–বসুন ভালো করে। আজ থেকে বাইশ বছর আগে পেটের ধান্দায় ঘুরতে ঘুরতে দিল্লি এসে পৌঁছেই, বুঝলেন? হুগলী জেলার তারকেশ্বরের কাছে এক গ্রামে আমার আদি বাড়ি। বাপ-মা মারা গেলেন হোটবেলাতেই, জমিদার মহাজন এসে ঘরবাড়ি, জমি আর গরু ক্রোক করে নিয়ে গেল দেনার দায়ে। কে জানে সত্যি দেনা ছিল কিনা, আমি তখন ছোট, কে আর দেখতে গিয়েছে? কোনও আত্মীয়স্বজন আমাকে রাখলেন না মশাই, বুঝলেন? কে যেচে পরের হ্যাপা ঘাড়ে নেয়? চাকরের কাজ করে, জুতো পালিশ করে, কুলিগিরি করে পেট চালিয়েছি কবছর। তারপর ভাসতে ভাসতে এই দিলি।

-তারপর এই হোটেল দিলেন কী করে? মূলধন কোথায় পেলেন?

–সেও এক কাহিনী। এখানে ছিল একটা মিঠাইয়ের দোকান, এদেশি মেঠাই-বঁদের লাচ্ছু, ক্ষীরের বরফি এইসব। মালিকের নাম লোচন সিং। সে আমাকে

ছোট কারিগরের কাজ দিল। আসল কারিগর যাকে সবাই ওস্তাদ বলে ডাকত সে জিনিসটা বানিয়ে দিত—আর আমি গোল করে পাকিয়ে দিতাম বা সাইজ মাফিক কেটে দিতাম। লোচন সিং-এর বৌ-ছেলেপুলে ছিল না, সব মরে গিয়েছিল, দোকানের পেছনের একটা ঘরে তার সঙ্গে আমি থাকতাম। কিছু মাইনে পেতাম আর তার কাজকর্ম করে দেবার জন্য খেতে পেতাম। দুবছর কাজ করার পর এই অঞ্চলে চেচকের মহামারী হয়। চেচক, বুঝলেন তো, বসন্ত। অনেকদিন দেশছাড়া, আমার কথার ভেতর আজকাল প্রায়ই হিন্দি ঢুকে যায়। একদিন লোচন সিং দোকান বন্ধ করে ঘরে এসে বলল—তবিয়ত ভালো লাগছে না, রাত্রে কিছু খাব না, তুই নিজের মতো অল্প রান্না কর।

দুদিন বাদে লোচন সিংয়ের গায়ে বসন্তের গুটি দেখা দিল। জলবসন্ত নয়—একেবারে আসল বসন্ত। ভয়ানক ছোঁয়াচে আর মারাত্মক জিনিস। খবর রটে যাওয়া মাত্র দোকানের অন্য দুজন কর্মচারী আর বড়ো কারিগর পালিয়ে গেল বাকি মাইনের মায়া না করেই। আমিও একবার ভাবলাম—যাই পালিয়ে। তারপর লোকটার দিকে তাকিয়ে মায়া হল। বেচারা! কেউ দেখবার নেই ওর—আমি সেবা না করলে বেঘোরে মারা যাবে। আমার বাবা খুব সেবাপরায়ণ লোক ছিলেন, ছোটবেলায় তাকে রাত জেগে টাইফয়েড বা কলেরার রোগীকে যত্ন করতে দেখেছি, তার ছেলে হয়ে অসুখের ভয়ে অন্নদাতাকে ফেলে পালিয়ে যাব? না, থেকেই গেলাম।

কী ভয়ানক অবস্থাই হল লোচন সিংয়ের সমস্ত গায়ে বড়ো বড়ো গুটি গলে একসঙ্গে মিশে দগদগে ঘা হয়ে গেল। মুখের মধ্যেও ঘা, জল পর্যন্ত খেতে পারে না। চোখ করমচার মতো লাল। সারাদিন বিকারের ঘোরে পাগলের মতো চিৎকার করছে। গা দিয়ে রস গড়াচ্ছে দরদর করে। শেষে সমস্ত শরীরের মাংস ফেটে ফেটে যেতে লাগল। আসল বসন্তের রোগী অনেক দেখেছি, কিন্তু এমন সাংঘাতিক দশা হতে দেখিনি কখনও। এর আগেও না,

পরেও না। আমার তখন একটা নেশাগ্রস্ত অবস্থা। মনে ঘেন্না নেই, ভয় নেই, আপ্রাণ সেবা করছি মানুষটার। তুলো দিয়ে গড়িয়ে পড়া রস মুছিয়ে দিই, কবিরাজী তেলে ভেজানো ন্যাকড়ার পটি দিয়ে দিই ঘায়ের ওপরে-যন্ত্রণা আর কমে না।

একদিন বিকেলে লোচন সিং আমাকে ডেকে বলল–তিনু বেটা, পরমাতমার ডাক এসেছে, এবার আমাকে চলে যেতে হবে। তার আগে একটা কাজ করে যেতে চাই। তুমি গিয়ে মহল্লা থেকে কয়েকজন ভদ্রলোককে আমার নাম করে ডেকে আনো–

-কেন মালিক, লোক দিয়ে কী হবে?

–সে দেখতেই পাবে। যাও, দেরি কোরো না–

কেউ কী আসতে চায়? অনেক ঘুরে লোচন সিংয়ের যিনি চিকিৎসা করছিলেন সেই হেকিম সাহেব আর গঙ্গানাথ তেওয়ারী নামে একজন উকিলবাবুকে ধরে নিয়ে এলাম। তারা ঘরে ঢুকলেন, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন। লোচন সিং বিছানা থেকেই যতদূর সম্ভব গলা উঠিয়ে বললহেকিম সাহেব, ভকিলবাবু, ভগবান আমাকে ডেকেছেন–এবার আমি চলে যাব। আমার বালবাচ্চা কেউ নেই, চাকরবাকরও আমাকে ফেলে ভয়ে পালিয়েছে। কেবল এই বাঙালি লেড়কা আমাকে নিজের ছেলের চাইতেও বেশি সেবা করেছে। আমার এই দোকান আমি এক দিয়ে যেতে চাই। লেখালেখি করবার আর সময় নেই, আপনারা মহল্লার ইমানদার আদমি, আপনারা সাক্ষী রইলেনও যেন সম্পত্তির দখল নিতে পারে।

ওঁরা দু-জন রোগীকে আশ্বস্ত করে বিদায় নিলেন। সেদিনই মাঝরাত্তিরের একটু পরে লোচন সিং মারা গেল।

www.bengaliebook.com

দু-একজন পাজী লোক মিঠাইয়ের দোকানের মালিকানা পাবার পথে বাধা সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু হেকিম সাহেবের এক ধমকে সবাই ভয় পেয়ে থেমে গেল। পথের ভিখিরি আমি, সত্যি সত্যি একটা দোকানের মালিক হয়ে বসলাম।

কাজল মুগ্ধ হইয়া তিনকড়ি দাসের গল্প শুনিতেছিল। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া যে লোক ক্রমাগত নিজের আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের দিকে অগ্রসর হইতেছে, সে মানুষ যতই সাধারণ হউক না কেন, তাহার সহিত নেপোলিয়ন কিংবা কলম্বাসের বিশেষ পার্থক্য নাই। পার্থক্য কেবল সামাজিক প্রতিষ্ঠা এবং আর্থিক অবস্থার। কাজের উৎসাহ এবং সাফল্যের আনন্দ উভয়ের ক্ষেত্রেই এক।

সে প্রশ্ন করিল–মিঠাইয়ের দোকান হোটেল হল কী করে?

–প্রথম দুতিন বছর মিঠাইয়ের ব্যবসাই চলছিল। মাঝে মাঝে বাঙালি যাত্রী এসে অন্য কোথাও থাকবার সুবিধা না পেলে আমার দোকানে থাকতে চাইত। থাকতে দিতাম–যাবার সময় তারা ঘরের ভাড়া হিসেবে কিছু কিছু টাকা দিয়ে যেত। এইভাবে একটা খ্যাতি রটে যাওয়াতে এত বেশি অতিথি আসতে লাগল যে আস্তে আস্তে মিঠাইয়ের দোকান তুলে দিয়ে পুরোপুরি হোটেলের ব্যবসাতে নেমে পড়লাম। তা চলছে মন্দ নয়–

রাত্রের খাওয়া গুরুতর রকমের হইল। কাজল ভালো জিনিস খাইতে ভালোবাসে বটে, কিন্তু বেশি পরিমাণে খাইতে পারে না। তাহার পাশে বসিয়া অমরবাবু প্রাণের আনন্দে ভোজ খাইলেন। নিজের আহার শেষ করিয়া কাজল বহুক্ষণ বসিয়া অবাক বিস্ময়ে তাহার খাওয়া দেখিল। খাইতে খাইতে অমরবাবু অকারণ কৈফিয়তের সুরে বলিলেন–খেতে বসে লজ্জা করা কোনও

কাজের কথা নয়। তাছাড়া এ তো হোটেল, পয়সা দিচ্ছি-খাওয়া বুঝে নিচ্ছি। কুটুমবাড়ির নেমন্তন্ন তো নয় যে লজ্জা করে খাব–

অমরবাবু যে প্রকৃতই কিছুমাত্র লজ্জা করিলেন না তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইল। রাত্রে কিছুক্ষণ না পড়িলে কাজলের ঘুম আসে না। আজও সে হ্যাজলিটের টেবল্ টকখানা হাতে লইয়া বিছানায় শুইল। সারাদিন ঘুরিয়া শরীর ক্লান্ত ছিল, কখন যে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে তাহা সে নিজেই টের পায় নাই। অনেক রাত্রিতে দরজায় ধাক্কাব শব্দে তাহার ঘুম ভাঙিল। বিছানা হইতে উঠিতে উঠিতে সে বলিল–কে?

নারীকণ্ঠে উত্তর হইল–একবার দরজাটা খুলুন না?

কাজল প্রথমটা বিস্মিত হইল, একটু ভয়ও হইল। এখানে সে বেড়াইতে আসিয়াছে, কেহ তাহাকে চেনে না। কোন মহিলা এত রাত্রে তাহার দরজায় ধাক্কাচ্ছে–শেষে একটা গোলমালে না জড়াইয়া পড়ে।

আবার দরজায় করাঘাত–দয়া করে তাড়াতাড়ি খুলুন, বড়ো বিপদ। সাহস করিয়া দরজা খুলিতেই কাজল অবাক হইয়া গেল। সামনে দাঁড়াইয়া অমরবাবুর স্ত্রী। কাজলকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন-একবার আমাদের ঘরে আসবেন? আপনার দাদা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন

একটা শার্ট গলাইতে গলাইতে কাজল বলিল–ভয় নেই, চলুন যাচ্ছি। কী হয়েছে অমরবাবুর?

অশ্রুরুদ্ধ গলায় মহিলাটি বলিলেন কী জানি! শুয়ে বহুক্ষণ বকছিলেন, কিছুতেই ঘুমোন না। এই অল্প আগে থেকে বলছেন–দম আটকে আসছে, বুকে ব্যথা-কী হবে ভাই?

-কোনো ভয় নেই, চলুন যাই দেখি-

ঘরে ঢুকিয়া কাজল দেখিল খাটের উপর অমরবাবু শুইয়া বেজায় ছটফট করিতেছেন, মুখ বেদনায় বিকৃত। কপালে এবং সারা গায়ে সামান্য ঘাম। সে জিজ্ঞাসা করিল-কী হয়েছে? কী হচ্ছে আপনার?

উত্তরে অমরবাবু হাত দিয়া বুক দেখাইলেন।

কাজল মনে মনে ভয় পাইল। বুকে ব্যথা, নিঃশ্বাসের কষ্ট এবং গায়ে ঘাম লক্ষণগুলি ভালো নহে, হৃদরোগের ইঙ্গিত দেয়। তাহার বাবারও ঠিক এমনি হইয়াছিল। এই বিদেশে লোকটার হঠাৎ কিছু হইলে ইহার স্ত্রী-পুত্র এবং দলের অন্যান্যরা মহা বিপদে পড়িবে।

সে অমরবাবুর স্ত্রীকে বলিল—দিদি, আপনি বরং ওঁর বুকে হাত দিয়ে মালিশ করে দিন, আর মাথায় হাওয়া করুন। আমি তিনকড়িবাবুকে বলি একজন ভালো ডাক্তার ডেকে আনতে।

হোটেলের কারবার করিলেও তিনকড়ি দাস আদ্যন্ত ব্যবসায়ী নহেন। ব্যাপার শুনিয়া অত রাত্রে তিনি নিজেই বাহির হইলেন ডাক্তার ডাকিতে। কাজল সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিল, তিনি বারণ করিলেন।

আধঘণ্টাখানেক বাদে তিনকড়ি ডাক্তার লইয়া ফিরিলেন। সাহেবী পোশাক পরা লম্বা মানুষটি, পেটা স্বাস্থ্য, ফরসা রঙ। মুখে একটা স্বাভাবিক সহৃদয়তার ছাপ রহিয়াছে। মিনিট দুই রোগীকে পরীক্ষা করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—ইনি রাত্তিরের খাবার কী খেয়েছিলেন?

চিকিৎসকের কাছে সত্য গোপন করিয়া লাভ নাই, কাজল ডাক্তারকে অমরবাবুর নৈশাহারের আনুপূর্বিক বর্ণনা দিল। শুনিয়া ডাক্তার ব্যাগ হইতে

ঔষধ বাহির করিতে করিতে বলিলেন–টারটার এমেটিক দিচ্ছি, এখুনি খুব বমি হতে শুরু করবে, মেয়েদের ভয় পেতে বারণ করুন

কথাবার্তা উর্দু এবং ইংরেজিতে মিশাইয়া হইতেছিল, ডাক্তারের বক্তব্য বুঝিতে না পারিয়া অমরবাবুর স্ত্রী কাজলের দিকে তাকাইলেন। কাজল ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতে তিনি কাঁদিয়া ফেলিয়া ডাক্তারের দিকে তাকাইয়া বলিলেন–আপনাকে বাবা বলে ডাকছি, আমি আপনার মেয়ে। আমার স্বামী বাঁচবেন তো?

ডাক্তার বলিলেন-ভয় নেই। বেশি পরিমাণে রিচ ফুড় খাওয়ায় অ্যাসিড আর গ্যাস ফর্ম করে এমনটা হয়েছে। বমি হয়ে গেলে অনেকটা রিলিফ পাবেন। নিন এটা খাইয়ে দিন

টারটার এমেটিকের প্রভাবে অমরবাবু অবিলম্বে ঘর ভাসাইয়া বমি করিতে শুরু করিলেন। বমি করিবার আবেগে দম আটকাইয়া আসে আর কী!

অমরবাবু প্রাণপণে ডাক্তারের হাত আঁকড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন-ডাক্তারবাবু, আমার শরীরের মধ্যে কেমন করছে, আমি আর বাঁচবো না-

ডাক্তার ততোধিক জোরে তাহার হাত চাপিয়া বলিলেন–ডোন্ট ওরি, আপনার কিছু হয়নি, বমি করতে থাকুন-

সব প্রলয়েরই সমাপ্তি আছে, কিছুক্ষণ ধরিয়া অনর্গল বমি করিবার পর অমরবাবু নিশ্চুপ হইয়া পড়িলেন। ডাক্তার ব্যাগ হইতে আর একটা কী ঔষধ তাঁহাকে খাওয়াইয়া কাজলকে বলিলেন–ইনি এখন ঘুমোবেন। আর ভয় নেই, আমি সকালে আবার এসে দেখে যাব-

অমরবাবুর স্ত্রী বলিলেন-বাবা, আপনার ভিজিট-

-ও সকালে এসে একেবারে নেব-

ডাক্তার বিদায় লইলে অমরবাবুর স্ত্রী বলিলেন—ভাই, আপনি ছিলেন বলে আজ খুব রক্ষে হল। আমি গেরস্তঘরের বৌ, কোনোদিন বিদেশে বেরুই নি, তারপর এসব জায়গার ভাষা মোটে বুঝিনে। আপনি না থাকলে-

কাজল বলিল—ওসব কথা বলবেন না। আপনাকে দিদি বলে ডেকেছি ভাই তো বোনের জন্য এটুকু করবেই

-দেখুন তো দেখি কী কাণ্ড! বরাবরই ওইরকম লোভী মানুষ, খেতে ভালোবাসেন। ভালো রান্নাবান্না হলে আর খেয়াল থাকে না। অম্বল, পেটের অসুখ আর বায়ুতে কষ্ট পান-কত বলি! বয়েস হচ্ছে, এবার একটু সামলে চল—তা কে কার কথা শোনে! তবে এত বাড়াবাড়ি কখনও হয়নি।

পরদিন সকাল আটটা নাগাদ ডাক্তার নিজেই কথামত আসিয়া হাজির। অমরবাবু কিছুক্ষণ হইল উঠিয়া সমবেত পরিজনের তিরস্কার সহ্য করিতেছেন। দেখিয়া ডাক্তার বলিলেন—ফাইন! এই তো রোগী উঠে বসেছে-কী মশায়, কাল রাত্তিরে সবাইকে অমন ভয় লাগিয়ে দিয়েছিলেন কেন? আর কখনও ঠেসে রি খাবার খাবেন না! খাবার অন্যের, শরীর তো আপনার নিজের না কী? অমরবাবুর স্ত্রী কিছু টাকা কাজলের হাতে খুঁজিয়া দিয়াছিলেন, সে তাহা দিতে গেলে ডাক্তার অমরবাবুর স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া হাসিয়া বলিলেন-না, আপনি আমাকে বাবা বলে ডেকেছেন এমনিতে এই মহল্লায় আমি অনেক বোজগার করি, জামাইয়ের চিকিৎসা করে আর টাকা নেব না।

অমরবাবু চিঁ-চিঁ করিয়া বলিলেন—আপনি আমার প্রাণদাতা, আপনার নামটা তো জানা হল-আবার কখনও দিল্লি এলে দেখা করবো

ডাক্তার বলিলেন—আমার নাম মহম্মদ ইলিয়াস আজম।

ডাক্তার বিদায় লইলে কাজল মৃদু হাসিয়া অমরবাবুকে বলিল কী দাদা, তাহলে মুসলমান মাত্রেই খাবাপ লোক নয়, কী বলেন?

অমরবাবু লজ্জিত মুখে বললেন—আমার ভুল হয়েছিল ভাই। এক জায়গায় আটকে থাকা মানুষকে বড়ো ছোট করে দেয়। এইজন্যেই তো দেশভ্রমণ প্রয়োজন।

নবম পরিচ্ছেদ

কাজল মনসাপোতা পৌঁছিল সন্ধ্যাবেলা।

বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরিতে ঘুরিতে একটি ভ্রাম্যমাণ দলের সঙ্গে সে অজন্তায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। গুহাভ্যন্তবে অনতিউজ্জ্বল আলোকে মায়ের কোলে শিশু বুদ্ধের চিত্র দেখিতে দেখিতে হঠাৎ তাহার হারানো মায়ের জন্য মন কেমন করিয়া উঠিল। জগতে মাতৃশক্তি একটা বড়ো শক্তি। যে মাকে সে কখনও দেখে নাই, অথচ দশমাস ধরিয়া যাহার গর্ভে বাস করিয়া, যাহার শরীর হইতে পুষ্টি সংগ্রহ করিয়া তাহার দেহ পুষ্ট হইয়াছে, তাহার কথা মনে পড়িবামাত্র কাজলের সমস্ত নাড়ীতে টান ধরিল। মায়ের সহিত দেখা কবিবার আর কোনো উপায় নাই, কিন্তু মায়ের পবিত্র স্মৃতিবিজড়িত মনসাপোতায় গিয়া হাজিব হইতে পারিলে যেন মাকে সে অনেকখানি ফিরিয়া পাইবে।

অপরাহের রৌদ্র বাঁকাভাবে আসিয়া গুহার দেওয়ালে পড়িয়াছে, চারিদিকে স্তব্ধতা এবং নিবিড় প্রশান্তি। কোথায় লুকাইয়া বসিয়া কী একটা পাখি ক্রমাগত ডাকিতেছে। পাখির ডাকে সমস্ত পবিবেশ যেন করুণ উদাস হইয়া উঠিল। মানুষ সকলেই সকলের আত্মীয়, তবু মায়ের সঙ্গে শিশুর যে গভীর আত্মীয়তা তাহার সমান্তরাল কোনো সম্পর্ক আর পৃথিবীতে নাই। শৈশব হইতেই একটা বঞ্চনার অনুভূতি হৃদয়ের গভীরতম তলদেশ হইতে উঠিয়া আসিয়া মাঝে মাঝে তাহাকে কষ্ট দেয়। কী একটা জিনিস যেন তাহার পাওয়া হইল না, কী এক অমৃত আস্বাদন করিতে বাকি রহিয়া গেল। বড়ো হইয়া উঠিবার পর হইতে সে অপর্ণার জন্য তাহার মন-খারাপের কথা হৈমন্তীকে কখনও বলে নাই– বলিলে মা ভাবিতে পারে এত ভালোবাসা সত্ত্বেও ছেলে

www.bengaliebook.com

আপন হয় নাই। কিন্তু মনের ভিতরে গোপন রাখা এক জিনিস, আর ভূলিয়া যাওয়া অপর জিনিস।

তাহার ভয় ছিল সে ঠিক ঠিক পথ চিনিয়া যাইতে পারিবে কিনা, সেই কোন ছোটবেলায় বাবার সহিত একবার আসিয়াছিল। স্টেশন হইতে সে একখানা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিল বটে, কিন্তু গ্রামে ঢুকির মুখে সেখানা ছাড়িয়া দিল এই গ্রামে সে হাঁটিয়া ঢুকিবে। জেলে-পাড়া ছাড়াইয়া পথের বাকে একটা অশ্বথ গাছ। ছোটবেলায় গাছটাকে সে এইটুকু দেখিয়া গিয়াছে, গোড়ায় কতগুলি ইট সাজাইয়া বেদিমতো করা ছিল। মেয়েরা স্নান করিয়া এক ঘটি করিয়া জল ঢালিয়া দিয়া যাইত। এখন গাছটা দোতলা সমান বড়ো হইয়া উঠিয়াছে, গোড়াটা গোল করিয়া বাঁধানো। আর কিছুটা হাঁটিতেই দূর হইতে একটা ঝাকড়া গাছের মাথা নজরে আসিল, কাহাদের উঠানে যেন গাছটা বাড়িয়া উঠিয়াছে। তারপরেই তাহার বুকের মধ্যে রক্ত ঢেউ খেলিয়া উঠিল। তাহাদের বাড়ি! তাহার মায়ের হাতে পোঁতা স্বর্ণচাপার গাছটা!

স্বপ্নের মধ্য দিয়া হাঁটিবার মতো কাজল নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বাড়ির উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে পতনোম্মুখ বাড়িটা বিস্মৃত ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের মতো দেখাইতেছে। চালে খড় প্রায় নাই, দাওয়ায় ছোট-বড়ো ইদুর অথবা সাপের গর্ত, সমস্ত উঠান জুড়িয়া আগাছার জঙ্গল। চাপাগাছে এখন ফুল নাই, এখন চাঁপাফুল ফুটিবার সময় নয়, কেবল সান্ধ্য-বাতাস বাধিয়া গাছের পাতায় ঝিরঝির শব্দ হইতেছে। গাছটা কী নিজের ভাষায় তাহাকে কিছু বলিতে চায়?

প্রথমেই একটা আলো প্রয়োজন। স্টেশন হইতে কয়েকটা মোমবাতি কিনিয়া আনা উচিত ছিল। আসলে সে জীবনে কখনও সাংসারিক বিষয়ে মাথা ঘামায় নাই, কোথাও গেলে সেখানে শয্যা, আলো, আহার এবং অন্যান্য গার্হস্থ্য সুবিধা অপেক্ষা করিয়া থাকিবে ইহাতেই সে অভ্যস্ত। আলোর ব্যবস্থা যে

www.bengaliebook.com

আবার নিজেকে সঙ্গে করিয়া আনিতে হইবে ইহা তাহার মাথায় আদৌ খেলে নাই। বস্তুত এখন মনে পড়িল, খাওয়ার ব্যবস্থাও সে কিছু করিয়া আসে নাই বটে। অবশ্য একরাত্রি না খাইলে তেমন কিছু অসুবিধা নাই, কিন্তু আলো নিতান্ত প্রয়োজন।

পাশে তেলিদের বাড়িতে সবে সন্ধ্যার প্রদীপ দেখানো হইতেছে। একজন বৃদ্ধা উঠানের তুলসীতলায় ছোট একটি পিতলের প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া উপুড় হইয়া প্রণাম করিতেছিল, প্রণামের শেষে সোজা হইয়া আধ-অন্ধকাবে কাজলকে দেখিয়া অবাক হইয়া বলিল–কে? কে ওখানে?

কাজল আন্দাজ করিল ইনিই কুণ্ডবাড়ির গৃহিণী, ছোটবেলায় যখন দেখিয়াছিল তখন আরও মোটাসোটা ছিলেন, বয়েস বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে চেহারা ভয়ানকভাবে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। বয়স তো কম হইল না, তাহার বাবাকে ইনি ছোট দেখিছেন, সে বলিল—আমি-আমি কাজল-

-কাজল? কে কাজল?

-আমি—এই পাশের বাড়ির ছেলে। আমাকে ছোটবেলায় একবার আপনি দেখেছেন। আমার বাবার নাম অপূর্ব-অপু। মায়ের নাম অপর্ণা-

তেলি-গিন্নি অবাক হইয়া আগাইয়া আসিতে আসিতে বলিল—কে? বামুনঠাকরুনেব নাতি? অপুর ছেলে? তুমি হঠাৎ কোথা থেকে? এতদিন ছিলে কোথায়—এসো এসো, দাওয়ায় উঠে এসো

কাজল আধুনিক মনোবৃত্তির ছেলে, সে বৃদ্ধার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে গেল। বৃদ্ধা পিছনে সরিয়া গিয়া বলিলেন-না না, ছিঃ! তোমরা ব্রাহ্মণ, আমাদের পুরোহিত বংশ। তোমার ঠাকুমা আমার চেয়ে বয়েসে ছোট ছিলেন,

www.bengaliebook.com

কিন্তু আমি তাকে চিরদিন পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে এসেছি। আহা, তোমার মা-ঠাকুমা বড়োই অল্প বয়েসে-

তেলিগিন্নি তাহাকে যথেষ্ট আদর করিলেন, গ্রামে আর ভদ্রলোক নাই সে বিষয়ে বিস্তর দুঃখ করিলেন, কিছু ধানী জমি দান করিলে কাজল তাহার বর্তমান মাকে লইয়া আবার মনসাপোতায় আসিয়া বাস করিতে রাজি আছে কিনা সে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার বাবা যখন ছোটবেলায় এই গ্রামে বাস করিত, সেই সময় ও বর্তমান সময়ে যে অনেক পার্থক্য তাহা বলিয়া সে এই সরল ও স্নেহময়ী বৃদ্ধার মনে আঘাত দিতে চাহিল না। বিশেষ করিয়া সে জানে একদিন তেলি-গিন্নির দয়ার দানের উপর নির্ভর করিয়াই তাহাদের সংসার চলিত, আজ একটু সুবিধাজনক অবস্থায় পৌঁছিয়া তাহাকে অসম্মান করা যায় না। সে বলিলআমি মায়ের সঙ্গে কথা বলে দেখব, দেখি ওঁর কী মত–

-তুমি কী এখন কদিন এখানে থাকবে? বাড়িঘর যে সারানোনা দরকার তা তো দেখতেই পাচ্ছো! তোমার বাবাই মারা যাবার আগে মেরামতের জন্য আমাকে শেষ যা টাকা পাঠিয়েছিল– তারপর তোমরা তো আর এদিক মাড়ালেই নাও, তোমাকে বলতে ভুল হয়ে গিয়েছে, আজকাল তোমাদের বাড়ি দেখতে মাঝে মাঝে শহর থেকে লোক আসে, জানো? অপু নাকি বড়ো হয়ে কী সব বই লিখেছে, সেই বই পড়ে তারা আসে। আমাকে কত কথা জিজ্ঞেস করে। তা তোমার বাবা কী বই লিখত? ঠাকুর-দেবতার কথা?

কাজল হাসিয়া বলিল-না ঠাকুমা, এমনি গল্পের বই। লোক আসে বাড়ি দেখতে আজকাল?

www.bengaliebook.com

–তবে আর বলছি কী? সেদিনকার ছেলে অপু, এই তো সেদিন বইদপ্তর বগলে করে ইস্কুলে পড়তে যেত, সে নাকি আবার বই লিখে নাম করেছে। প্রায় ছুটির দিনেই লোকজন আসে

কাজল একটা হ্যারিকেন চাহিয়া লইয়া বাড়িতে ফিরিল। তেলিদের বাড়িতে জেলেপাড়ার একটি মেয়ে কাজ করে, সে গৃহিণীব নির্দেশে এরই মধ্যে আসিয়া দাওয়া ও ঘরঝট দিয়া নড়বড়ে তক্তাপোশটায় চাদর-বালিশ পাতিয়া দিয়া গিয়াছে। কাজলকে তেলি-গিন্নি বলিয়া দিয়াছে, যে কয়দিন থাকিবে তাহাদের বাড়ি দুইবেলা খাইতে। কাজেই আপাতত করিবার কিছু নাই। কাজল সুটকেস হইতে একখানি বই বাহির করিযা হ্যারিকেনের আলোয় বালিশে ভর দিয়া পড়িতে লাগিল।

তাহার একান্ত আপন মানুষেরা এই ঘরখানায় বাস করিত। রৌদ্র উঠিবার পর ঘাসের আগায় শিশিরবিন্দুর মতো তাহারা মহাকালেব নির্মম নির্দেশে কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই বাড়ির প্রত্যেকটি কোণে তাহাদের মমতার স্মৃতি মাখানো আছে। মায়ের কথাই বেশি করিয়া মনে আসে। ঠাকুমার সহিত নিশ্চিন্দিপুর ওতপ্রোতভাবে জড়িত, কিন্তু কেন যেন মনসাপোতার সহিত কেবলমাত্র মায়ের স্মৃতি মাখামাখি হইয়া আছে। এই ঘরে মা থাকিত, দরিদ্র ঘরের জিনিসপত্র সযত্নে গুছাইয়া রাখিত, কুলুঙ্গিতে রাখা আয়নার সামনে সাজিত, সিঁথিতে সিঁদুর দিত, বাবা কবে কলিকাতা হইতে আসিবে সেজন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিযা থাকিত। ঘরের চারদেয়ালে আরব্ধ পরিবেশে যেন সময় আর অগ্রসর হয় নাই, তেইশ বৎসব পূর্বের সেই দিনগুলিতেই আটকাইয়া গিয়াছে।

আচ্ছা, যদি হঠাৎ ফিরিয়া আসে? হয়তো আসলে মা বাঁচিয়া আছে, বাংলা উপন্যাসের গল্পের মতো কোনো রহস্যময় কারণবশত আত্মগোপন করিয়া আছে মাত্র, একদিন হঠাৎ স্বেচ্ছানির্বাসন হইতে প্রত্যাবর্তন করিবে। কিছুদিন

www.bengaliebook.com

আগে সে ওয়েলসের টাইম মেশিন পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। অমন একটি সময়-ভ্রমণের যন্ত্র পাইলে সে প্রথমেই তাহার মাকে দেখিতে যাইত।

কিন্তু তাহা যে হইবার নহে, প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে কে যাইতে পারে?

বই রাখিয়া কাজল দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। শুক্লপক্ষের চতুর্থীর চাঁদ এর মধ্যেই পশ্চিমদিকে নারিকেল গাছগুলির মাথায় নামিয়া পড়িয়াছে। উঠানের আগাছার জঙ্গলে ঝি ঝি ডাকিতেছে যেমনটি আজ হইতে তেইশ বৎসর পূর্বেও ডাকিত।

বাড়িটা সারাইতে হইবে। নিশ্চিন্দিপুরের বাড়িটা নতুন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। আর মৌপাহাড়ির বাড়িটাও ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না। আজ তেলি-গিন্নির কথায় সে বুঝিতে পারিয়াছে বিশ্বসাহিত্যে তাহার বাবার নাম স্থায়ী হইয়া থাকিবে। আজ আরও কয়জন আসিতেছে, শীঘ্রই এমন দিন আসিবে যখন দর্শনার্থীর জন্য তাহার বাবার স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলিতে গ্রন্থাগার, অতিথিশালা এবং মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। নিজের বাবার প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি এবং ভক্তিবশত সে যে বাবার সাহিত্যকে অহেতুক গৌরবান্বিত করিতেছে এমন নহে, সাহিত্যের ছাত্র হিসাবে এবং একনিষ্ঠ পাঠক হিসাবে সে নির্মোহ বিচার করিয়া বুঝিয়াছে অপূর্বকুমার রায়ের রচনা সততা, ঐকান্তিকতা ও মানবিকতার অনন্য প্রভায় উদ্ভাসিত। যুগে যুগে ইহার পাঠকের অভাব ঘটিবে না-এ সাহিত্য বাঁচিতে আসিয়াছে।

তিনদিন পর বাড়ি আসিবার সময় কাজল উঠানের চাপা গাছটা হইতে কয়েকটি পাতা সংগ্রহ করিয়া সুটকেসে ভরিয়া লইয়া আসিল।

কলেজ স্ট্রীটে একটি পত্রিকার স্টলে দাঁড়াইয়া কাজল মাসিকপত্রের পাতা উলটাইতেছিল। এই পত্রিকাতে সে কিছুদিন আগে একটি গল্প পাঠাইয়াছিল।

এত বড়ো কাগজে তাহার গল্প ছাপিবে কিনা কে জানে! ডাকে পাঠানো গল্প তো সম্পাদকেরা বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলিয়া দিয়া থাকেন বলিয়া শোনা গিয়াছে। বিজ্ঞাপনের পাতাগুলির পর সূচিপত্রে আসিয়া হঠাৎ তাহার চোখ এক জায়গায় আটকাইয়া গেল। অমিতাভ রায় নামে একজন লেখকের একটা গল্প ছাপা হইয়াছে। বাঃ, তাহার নামে আরও সাহিত্য-যোথা লোক আছে তাহা হইলে! কিন্তু কিন্তু গল্পের নামও এক হয় কী করিয়া? কম্পিতহস্তে সে গল্পটা খুঁজিয়া বাহির করিল।

তাহারই গল্প। এই ডাল-ভাত-তরকারির সাধারণ পৃথিবীতে এমন ঘটনা সম্ভব হইল কী করিয়া? পকেটে কয়েকটা টাকা ছিল, তাহা দিয়া সে চার কপি পত্রিকা কিনিয়া লইল।

মানুষ মাঝে মাঝে এমন অনেক কাণ্ড করে যাহা সে আগের মুহূর্তেও ভাবে নাই, এবং পরেও যাহার কোনও সম্যক ব্যাখ্যা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রথম শ্রেণির একটি পত্রিকায় তাহার গল্প বাহির হইয়াছে, এক্ষেত্রে প্রথমেই গল্পটা সে তাহার বন্ধুদের লইয়া দেখাইবে ইহাই সমীচীন। কিন্তু কিছুমাত্র না ভাবিয়া সে কলুটোলা পোস্ট অফিসে গিয়া বাহিরে যে পাবলিক রাইটার বসিয়া থাকে তাহার নিকট হইতে একটি কপি ভালো করিয়া র্যাপ করাইয়া লইল, পরে উপরে অপালার নাম লিখিয়া জিনিসটা পার্সেল করিয়া দিল।

গল্পটা লইয়া পাঠকমহলে বেশ আলোচনা হইল। একদল ভালো বলিল, একদল বলিলতেমন কিছু হয় নাই। কিন্তু পরিচিত এমন কিছু মানুষ, যাহাদের মতামতের উপর কাজল নির্ভর করে, তাহারা বলিল—রচনায় কিছু কিছু দুর্বলতা থাকিলেও গল্পের বিষয়বস্তু এবং ট্রিটমেন্ট একেবারে নতুন ধরনের। লেখক হিসাবে প্রশংসা পাইবার ব্যাপারটা কাজলের জীবনে নূতন, সে লক্ষ করিল খ্যাতির কেশ নেশা আছে।

www.bengaliebook.com

দিন দশেক বাদে সে অপালার নিকট হইতে একটি চিঠি পাইল। অপালা লিখিয়াছে—আপনি পাঠাবার আগেই গল্পটা আমি পড়ে ফেলেছি, কারণ ওই পত্রিকার আমি গ্রাহক। তবুও আমাকে মনে করেছেন বুঝে খুব ভালো লাগল। বড়ো কাগজে নিজের প্রথম রচনা প্রকাশ হবার আনন্দ কেমন, তা আমি কোনদিন জানতে পারব না, কারণ আমি লিখি না—কিন্তু আনন্দের তীব্রতাটার সামান্য আন্দাজ করতে পারি। কলকাতায় এ আনন্দ ভাগ করে নেবার মতো বন্ধুর আপনার অভাব নেই, তা সত্ত্বেও এক কপি কাগজ আমাকে পাঠিয়েছেন।

নিজের সৃষ্টির জন্য প্রশংসা পাইবার একটা নেশা আছে, কাজল তাহা বেশ অনুভব করিল। দম্ভ ও অসন্তুষ্টি না আসিলে এই নেশাই প্রেরণার কাজ করে, পরবর্তী সার্থক সৃষ্টির পথে স্রষ্টাকে অগ্রসর করিয়া দেয়। কাজল আবার লিখিতে বসিয়া গেল।

বিখ্যাত মানুষের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করাটা অন্যের নিকট যতখানি সুখের বিষয় বলিয়া মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে ততটা নহে। বস্তুবাদী দর্শনের প্রভাবে আচ্ছন্ন বর্তমান যুগে অপূর্বকুমার রায়ের বিশ্বমুখী মানবিকতা এবং গভীর প্রকৃতিপ্রেম পাঠকসমাজকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সময় কাটিবার সঙ্গে সঙ্গে সমসাময়িক সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতা প্রকট হইতেছে। অপুর রচনার প্রয়োজনীয়তাও বাড়িতেছে। কাজল যেখানেই যায় সবাই তাহার বাবার নামোল্লখ করা মাত্র চিনিতে পারে, কাজলকে খাতির করিয়া দুই-একটা মিষ্টি কথা বলে। এ বড়ো কম গৌরবের কথা নহে। কিন্তু সব প্রদীপের নিচেই ছায়ান্ধকার থাকে। এক্ষেত্রেও তাহায় ব্যতিক্রম হয় নাই। গৌরবজনক পিতৃপরিচয়টা ভালো, কিন্তু জগতের তাবৎ মানুষের আকাঙ্ক্ষাপণের দায় যখন বিখ্যাত মানুষের পুত্রের ঘাড়ে আসিয়া পড়ে, তখন সে বেচারির নিজের জীবনটায় ক্রমাগত বো বড়ো গোযোগ বাধিতে থাকে। কাজলের জীবনে এইবার সেই পর্যায় শুরু হইল।

www.bengaliebook.com

একদিন বিখ্যাত একটি বাংলা সংবাদপত্রের চিঠিপত্রের স্তম্ভে অপুর স্মৃতিরক্ষার প্রসঙ্গে একটি পত্র প্রকাশিত হইল। পত্রলেখক অপুর জনৈক ভক্ত। তিনি জানিতে চাহিয়াছেন আধুনিক বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক অল্প বয়েসে মারা গিয়াছেন বলিয়া কি সবাই তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে? তিনি সম্প্রতি নিশ্চিন্দিপুর গ্রাম দেখিতে গিয়াছিলেন, সেখানে লেখকের আদি বাসভবন প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। মৌপাহাড়িতে লেখকের মৃত্যু হয়–সেখানেও স্মৃতিরক্ষার কোনও ব্যবস্থা নাই। অপূর্ব রায়ের সাহিত্য চিরজীবী হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন, অবিলম্বে সকলে কাজে না লাগিলে ভবিষ্যৎ যুগের মানুষের নিকট গালি খাইতে হইবে।

এই চিঠি বাহির হইবার পর একই পত্রিকায় আরও কয়েকটি পত্র প্রকাশিত হইল। তাহাদের লেখক আলাদা হইলেও মর্ম এক।

মনসাপোতায় ঘুরিয়া আসিয়া কাজলেরও মনে হইয়াছিল বাড়িটার মেরামত প্রয়োজন। যাহারা তাহার বাবাকে ভালোবাসে, তাহাদের এরুপ দাবি করিবার অধিকার আছে বটে। হৈমন্তীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সে তেলি-গৃহিণী এবং রানুদিকে চিঠিসহ কিছু টাকা পাঠাইয়া দিল। ঠিক করিল, মৌপাহাড়িতে নিজে গিয়া বাড়িঘর সারাইয়া আসিবে।

রানুদিকে লিখিল বাবার কেনা সাম্প্রতিক বাড়িটাকে মেরামত করিতে। পুরানো ভিটা যেমন আছে এখন থাকুক।

পরীক্ষার একেবারে মুখে মুখে কাজল রানুদি এবং কুণ্ড-গৃহিণীর চিঠি পাইল। বাড়ির কাজ হইয়া গিয়াছে। কাজল যেন গিয়া দেখিয়া আসে।

রানুদিদি নিজেই তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল।

www.bengaliebook.com

ভালো করিয়া কান পাতিলে যেন হারানো মানুষগুলির কণ্ঠস্বর শুনিতে পাওয়া যাইবে।

বিকাল হইয়া আসিয়াছে। অপরাহের বিদায়ী সুর লাগিয়াছে দিবসবীণার তন্ত্রীতে। কোথাও কোনো শব্দ নাই, কেবল একটা নাম-না-জানা পাখি কিচমিচ্ করিয়া পাতার আড়ালে লুকাইয়া ডাকিতেছে। অকস্মাৎ বিচিত্র এক অনুভূতিতে কাজলের শিহরিয়া উঠিল। সময় অদ্ভুত জিনিস। মানুষের যা কিছু একান্ত প্রিয়, একান্ত আপন, সবই মহাকালের স্রোতে কেমন অনিবার্যভাবে বিস্মৃতিব মোহনাব দিকে বহিয়া যায়। আজ যাহা নিতান্ত বাস্তব, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ হাসিকান্না লইয়া যে বৃহৎ সংসারটা—আগামীকাল তাহা তাৎপর্যহীন ইতিহাসে পরিণত হয়। যদি না তাহার বাবার মতো হে একটা দাগ কাটিয়া যায়, তাহা হইলে কেহ তাহাকে মনে রাখে না। এই যে আজ পৈতৃক ভিটায় দাঁড়াইয়া তাহার পবিত্র অনুভূতি, রানুদিদির ভালোবাসা-হাজার বৎসর পরে কে মনে রাখিবে? চলিয়া তো যাইতেই হইবে, তবু ইহসর্বস্ব মানুষ অর্থ খ্যাতি প্রতিপত্তির জন্য কত লালায়িত হয়। কাজলের মহাভারতের শ্লোক মনে পড়িল—অহনহনি ভূতানি…।

বেলা একেবারেই পড়িয়া আসিয়াছে। তাহারা দুইজন বাড়ির দিকে ফিরিল।

এইবার নিশ্চিন্দিপুর ভ্রমণে কাজলের এমন একটা অভিজ্ঞতা হইল, যাহা আগে কখনোই হয় নাই। বস্তুত অপ্রত্যাশিত স্থান হইতে আঘাত পাইয়া তাহার মন হঠাৎ খুব দমিয়া গেল। এখন সে অন্যত্র থাকে বটে, কিন্তু এই গ্রামের মাটির সহিত তাহার অন্তরের নিগুঢ় যোগাযোগ আছে, এখানকার মানুষকে সে নিতান্ত আপন বলিয়া মনে করে। এইবার চলিয়া আসিবার পূর্বে সতু তাহাকে ডাকিয়া বলিল—তুমি কি আজই চলে যাচ্ছো নাকি?

www.bengaliebook.com

-হ্যাঁ সতুকাকা। সামনে আমার পরীক্ষা, পড়া আছে। নইলে আরও দু-একটা দিন থাকতে পারলে ভালো হত-

-হুঁ, তা আবার আসবে কবে?

—পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই একবার ঘুরে যাব। চাবি রানুপিসির কাছে রইল।

-চাবির কথা হচ্ছে না, তোমাকে একটা দরকারি কথা বলি শোনন, অপুর বইয়ের তো বাজারে খুব নাম, আজকাল তোমাদের ভিটে দেখতে বহু লোক আসে। কোনো একটা ছুটির দিন এলে দেখবে বাড়ির সামনে মেলা বসে গিয়েছে। আবার শুনছি মহকুমা শহরের ইস্কুলের ছেলেরা এক বছর তোমাদের ভিটেয় অপুর জন্মদিন পালন করবে। তা তোমার কর্তব্য এখন এখানে একটা পাকাপাকি রকমের কিছু ব্যবস্থা করা। চাবি তত দিয়ে যাচ্ছে, তার হ্যাপা সামলাবে কে? রোজ নিত্যিদিন লোক এসে যদি বাড়ি দেখতে চায়, আমি তো কাজকর্ম ফেলে দৌড়তে পারব না? তার কী ব্যবস্থা করে যাচ্ছো?

কথাগুলি শুনিতে কিঞ্চিৎ কটু হইলেও ন্যায়সঙ্গত বটে। কাজল গ্রামের মুখুজ্যেবাড়ি হইতে ঈশানীবালা নামে এক বৃদ্ধাকে খুঁজিয়া বাহির করিল। তাহার স্বামী পরেশনাথ কলিকাতায় চাকরি করিতেন, বছর দশেক হইল গত হইয়াছেন। জমিজমা বিষয়সম্পত্তি কিছুই নাই, চলাচলতির ভয়ানক কষ্ট। মাসিক ত্রিশ টাকার বিনিময়ে তিনি অপুর নবনির্মিত বাড়িতে থাকিয়া দেখাশুনা করিতে রাজি হইলেন। তাঁহার নিজের বাড়িও জীর্ণ প্রায়, বৃষ্টি হইলে ঘরের সর্বত্র হুহু করিয়া জল পড়ে। দেওয়ালেরও যা অবস্থা, বড়ো রকমের একটা ঝড় হইলেই ধসিয়া পড়িবে। এমতাবস্থায় ঈশানীবালার রাজি না হইবার কথা নহে। কাজল কিছুটা নিশ্চিন্ত হইল, পিতৃপুরুষের ভিটায় অন্তত সন্ধ্যাবাতি পড়িবে।

www.bengaliebook.com

রওনা হইয়া আসিবার সময়ে কাজল ব্যাগ হাতে একবার তাহাদের বাড়িটা দেখিয়া আসিতে গেল। সঁড়িপথের বাঁক ফিরিবার পূর্বেই শুনিল উঠানে দাঁড়াইয়া কাহারা কথা বলিতেছে। পথের মোড় ঘুরিয়া দেখিল তাহাদের বাড়ির দাওয়ায় তিন-চারজন লোক বসিয়া রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে একজন গ্রামেরই মানুষ, কাজল চেনে, কিন্তু নাম জানে না। তাহাবা চলিয়া যাইবাব পবে নিশ্চিন্দিপুরে অনেক নতুন লোক আসিয়া বসবাস করিয়াছে, সকলের সঙ্গে তাহার পরিচয় হয় নাই।

গ্রামের মানুষটি অন্য তিনজন ভদ্রলোকের দিকে তাকাইয়া কাজলকে দেখাইয়া বলিলেন-এই ইনিই অপূর্বাবুব ছেলে–

আগন্তুক ভদ্রলোক তিনজন যেন একটু কৌতূহলের সহিত কাজলের দিকে তাকাইলেন। কাজল বলিল-নমস্কার।

প্রতিনমস্কাব করিয়া তাহাদের মধ্যে একজন বলিলেন–আপনিই অপূর্বকুমার রায়ের ছেলে? আসুন, উঠে এসে এইখানটায় বসুন।

কাজলের মনে মনে হাসি পাইল, কাহাব বাড়িতে কে আমন্ত্রণ জানাইতেছে! পরমুহূর্তেই যেন কাজলের অন্তরের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া ভদ্রলোক বলিলেন–আমরা কিন্তু এখানে অতিথি নই। সেজন্যই আপনাকে ডেকে বসতে বললাম। অপূর্ববাবু শুধু আপনার বাবা নন, তিনি সমস্ত দেশের মানুষের সম্পত্তি। তা এখানে তার স্মৃতিরক্ষার কোনও ব্যবস্থা নেই?

কাজল সবিনয়ে জানাইল-চেষ্টা চলিতেছে, তবে কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই।

আগন্তুক বলিলেন—কিছু মনে করবেন না, এ বিষয়ে কিন্তু লেখকের ফ্যামিলি হিসেবে আপনাদের আর একটু উদ্যোগী হওয়া উচিত। মানুষ অনেক আশা নিয়ে এখানে আসে।

গ্রামের অচেনা ভদ্রলোক বলিলেন—আমিও তাই বলি। আপনার উচিত শহরের বাস ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে থাকা

কাজল অবাক হইয়া বলিল—তা কি সম্ভব? আমার পড়াশুনো আছে তো—

আগন্তুকদের একজন বলিলেন—আপনি কী পড়েন?

-আমি এইবার এম.এ. দেব।

-তাহলে তো প্রায় শেষ করে এসেছেন। তারপরে এখানে থাকতে বাধা কী?

কাজল বলিল—পড়া শেষ হলেই তো সবকিছু শেষ হয় না। বরং সেখান থেকেই জীবনের শুরু। গ্রামে থেকে আমার কাজকর্ম

—আপনার বাবার তো আটকায় নি। এ গ্রামের মানুষ হয়েও তিনি বড়ো লেখক হয়েছেন।

—আমার বাবার জীবনী বোধহয় আপনারা ঠিক জানেন না। খুব ছোটবেলায় তিনি এ গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তারপর সারাজীবন কেটেছে কলকাতায়, কাশীতে, মধ্যপ্রদেশের গভীর জঙ্গলে—আরও কত জায়গায়। গ্রামে আর কোনদিনই ফিরে আসতে পারেন নি। ভ্রমণ না করে নিশ্চিন্দিপুরে থেকে গেলে তিনি কী লেখক হতে পারতেন?

গ্রামের মানুষটি ঈষৎ রাগতস্বরে বলিল–তাহলে এই গ্রামের প্রতি আপনার যে একটা কর্তব্য এবং দায়িত্ব আছে সেটা আপনি অস্বীকার করতে চান?

আরও প্রায় আধঘণ্টা কাজল তাহাদের চাবজনকে বোঝাইবার চেষ্টা করিল– সে পলায়নপর উদাসীন নহে। মধ্যবিত্ত সংসারেব বিভিন্ন গ্রাস হইতে বাঁচাইয়া এই বাড়িটা নতুন করিয়া বানানো হইয়াছে। এরপর মনসাপোতার এবং মৌপাহাড়ির বাড়িটাও ঠিক করিতে হইবে। সে একমাত্র ছেলে, কত দিকে একসঙ্গে তাহার পক্ষে দৌড়ানো সম্ভব?

লোকগুলি বিশেষ বুঝিল বলিযা মনে হইল না। তাহাবা কাজলের প্রতি কথাব উত্তবে নানান সম্ভব-অসম্ভব যুক্তি দেখাইতে লাগিল। গ্রামেব ভদ্রলোকটি তো মনে হইল কাজলের উপব কোনো অজ্ঞাত কাবণে ভয়ানক চটিয়া বহিছেন। এইটাই কাজলের মনে বেশি করিয়া লাগিল। তাহার নিজের গ্রামের মানুষ কিনা তাহাকে ভুল বুঝিয়া তিরষ্কার করিতেছে! তাহাদেব স্বপ্নের নিশ্চিন্দিপুরের মানুষ! তাহার বাবার স্মৃতিরক্ষার প্রসঙ্গে তাহার দায়িত্বেব কথা সে ভালো করিয়াই জানে, এবং সে তাহা অস্বীকারও করিতেছে না। কিন্তু তাহার নিজেরও তো একটা জীবন আছে। সে বাবার মতো লেখক হইতে চায়, পৃথিবীটা ঘুরিয়া দেখিতে চায়। সবচেয়ে বড়ো কথা, নিজের মতো করিয়া বাঁচিতে চায়। অপূর্বকুমার রায় যেমন তাহার একাব বাবা নহে, সমস্ত দেশবাসীর গর্বের স্থল, তাহার স্মৃতিরক্ষার বিষয়েও তো দেশবাসীর মনোযোগী হওয়া উচিত।

www.bengaliebook.com

দশম পরিচ্ছেদ

এম.এ. পরীক্ষা হইয়া গেল। পরীক্ষা দিয়া কাজল বুঝিতে পারিল সে পাশ করিবে বটে, কিন্তু বিশেষ চমকপ্রদ ফল হইবে না। তেমন ফল করিতে গেলে যে পদ্ধতি অনুযায়ী সাধনা করা উচিত এবং যতখানি সময় দেওয়া প্রয়োজন, তাহার কোনোটাই কাজলের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তাহাতে দুঃখ নাই, জীবনে চলার পথেব দুই ধারে যে সৌন্দর্য এবং বিস্ময় ছড়ানো রহিয়াছে তাহাকে অনুভব করা এবং স্বীয় অস্তিত্বের কারণ সন্ধান—এই দুইটিই মানুষেব প্রধান কাজ। সেগুলি সুচারুভাবে সম্পন্ন করিতে পারিলেই জীবন অনেকখানি সার্থক।

আপাতত কী করা যায়? পরীক্ষা শেষ হইবার উল্লাসে প্রথম কয়েকদিন সে খুব বেড়াইল, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিল, বিভিন্ন বিষয়ে বেশ কিছু পড়াশুনাও কবিল। ইহার মধ্যে একমাত্র পড়াশুনা ছাড়া অন্য প্রসঙ্গে দিন-দশেকের মধ্যেই সে বিরক্ত হইয়া উঠিল। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গ ভালো জিনিস, কিন্তু কাঁহাতক অর্থহীন আড্ডা দেওয়া সম্ভব?

একদিন প্রভাতের সঙ্গে সারা দুপুর গল্প করিবার পর কাজল কলেজ স্ট্রীটে তাহার বাবার প্রকাশকদের কাছে গেল। দুই মালিকের নামে দোকানের নাম- বসু ও গুহ পাবলিশার্স। দুই বাল্যবন্ধু মিলিয়া ব্যবসা চালান। বাঙালির কোনোপ্রকার যৌথ উদ্যোগ সচরাচর বেশিদিন স্থায়ী হয় না। অংশীদারকে ছাড়াইয়া নিজের ব্যক্তিত্ব জাহির করিবার ব্যগ্রতায় এবং নানাবিধ ছোটবড়ো স্বার্থের সংঘাতে অচিরেই নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু এই দুই বন্ধু ব্যবসাক্ষেত্রে বাঙালি জাতির আরহমান ঐতিহ্যকে মিথ্যা প্রমাণ করিয়া বহুদিন পাশাপাশি অনড় বসিয়া আছেন। কলেজ-জীবন হইতেই কাজল সপ্তাহে অদ্ভুত একদিন এদের দোকানে গল্প শুনিবার লোভে গিয়া হাজির হয়। দুপুর হইতেই বাংলা

www.bengaliebook.com

সাহিত্যের বিখ্যাত মানুষেরা আড়ার নেশায় আসিয়া জমিতে শুরু করেন। মুড়ি, তেলেভাজা এবং চায়ের সদাব্রত খোলাই আছে। খবরের কাগজে মুড়ি ঢালিয়া হাতের ঠোঙা হইতে গরম বেগুনি তুলিয়া রাত আটটা অবধি গল্প চলিতেছে। এই আড্ডায় হোটবড়ো ভেদাভেদ নাই। এতগুলি বিখ্যাত লোকের সামনে প্রথম দিন কাজল সংকুচিত হইয়া একপাশে একটু সরিয়া বসিয়া ইঁহাদের কথা শুনিতেছিল। একজন তাহা লক্ষ করিয়া বলিলেনক হে, তুমি মুড়ি নিচ্ছ না যে? তেলেভাজা খাবে না?

কাজল লজ্জিত স্বরে বলিল—আজ্ঞে আমি—মানে-

-লজ্জার কিছু নেই, সাহিত্যের আড্ডায় অমন করে একপাশে সরে থাকলে কি চলে? নাও, মুড়ি তোল

আরগল্পই বা কত রকমের! সেকালের কাহিনী হইতে আরম্ভ করিয়া ভূতের গল্প, বিশ্বসাহিত্যের বিশ্লেষণ, নেপোলিযনের জীবনী, পাঁচমিশেলি খোশগল্প—তাহার তালিকা করাই

কঠিন। বসিয়া থাকিলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার কাজ হইয়া যায়।

বসু এবং গুহ দুইজনেই খ্যাতনামা সাহিত্যিক বটে। প্রখ্যাত সাময়িকপত্রগুলির যে কোন সংখ্যা খুলিলে তাহাদের রচনা চোখে পড়িবেই। বোধহয় স্বত্বাধিকারীদ্বয় নিজেবা শিল্পী হওযার জন্য এই সংস্থায় ব্যবসার শুষ্ক বৈষয়িক আরহাওয়াটা নাই। বিজনেস উইথ প্লেজার যাহাকে বলে-ইহা তাই।

রাস্তার উপরে দোকান। পাশেই একটি ছোট দরজা, সেখান দিয়া ঢুকিলে সৰু ইটবাঁধানো গলির শেষে একটি মাঝারি ঘর। এইটিই প্রকাশনের কার্যালয়। দরজার সামনাসামনি ঘরের অপরদিকে একখানি সবুজ গদিমোড়া

আরামকেদারা, কেদারার মাথার কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের অয়েল পেন্টিং। বসু ও গুহ পাবলিশার্সের একজন লেখক, যিনি শিল্পীও বটে, তিনি আঁকিয়া উপহার দিয়াছেন। আরামকেদারাটি কাহার দখলে থাকিবে তাহা লইয়া প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতা চলে। বসু মহাশয় আগে পৌঁছিলে তিনি হাত-পা ছড়াইয়া সেটিতে বসিয়া পড়েন, দেবিতে আগত অপর বন্ধু পাশের হাতলওয়ালা চেয়ারে বসিয়া সতর্কভাবে সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকেন। সামান্য কাজে বাহির হইতে দুই মিনিটের জন্য ঘুরিয়া আসিয়া বসু মহাশয় দেখেন সিংহাসন খালি রাখিলে সাধারণত যাহা হয় তাহা হইয়াছে—সেটি বেদখল হইয়াছে। এইবার প্রশান্তমুখে তাহার অপেক্ষা করিবার পালা। সামনেই একটি সোফা রহিয়াছে, অতিথিরা তাহাতে বসেন। অফিসের কাজের জন্য কয়েকটি চেয়ার-টেবিল আছে। আড্ডাধারীদের সংখ্যাধিক্য ঘটিলে সেগুলিও দখল হইয়া যায়। আড্ডাঘরে ঢুকিয়া কাজল দেখিল আজ এখনও সাহিত্যিক সমাগম আরম্ভ হয় নাই। প্রৌঢ় দ্বিজেন্দ্রকুমার গুহ আরামকেদারায় হেলান দিয়া আপনমনে কী ভাবিতেছেন, বজলকে দেখিয়াই তিনি হঠাৎ চমকাইয়া সোজা হইয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার কেদারায় হেলান দিলেন।

সামনের সোফায় বসিতে বসিতে কাজল বলিল—কী হল কাকাবাবু আমাকে দেখে অমন চমকে উঠলেন যে?

গুহ মহাশয় প্রথমে উত্তর দিলেন না। তারপর বলিলেন-তোমার চেহারাটা হয়েছে অবিকল তোমার বাবার মতন। হঠাৎ মনে হয়েছিল যেন অপুর্ববাবু ঢুকছেন। খেয়াল ছিল না মাঝখানে এতগুলো বছর কেটে গিয়েছে—সেসব সুখের দিন আর নেই-

www.bengaliebook.com

বাবার কথা মনে পড়িয়া কাজলেরও মন ভারি হইয়া উঠিল। পৃথিবীতে কত লোক কত বেশি বয়েস পর্যন্ত বাচিয়া থাকে, তাহার বাবা আর অন্তত দশ-বারোটা বছর বেশি বাঁচিলে কাহার কী ক্ষতি হইত?

গুহ মহাশয় বলিলেন—তোমার দুর্ভাগ্য, বাবাকে তুমি বেশিদিন পেলে না। আমি তোমাকে জোর গলায় বলছি, অমন মানুষ হয় না। সৎ, নির্লোভ, সবরকম আসক্তিহীন পুরুষ। বৈদিক যুগের ঋষিদের দেখিনি, কিন্তু বর্তমান যুগে জন্মালে হয়তো তারা এইরকমই হতেন। মনে মনে আমি নিজেকে অপূর্ববাবুর শিষ্য বলে মনে করি। জীবনের অনেক গভীর শিক্ষা আমি তার কাছ থেকে পেয়েছি। এখনই কী হয়েছে, এমন একটা দিন আসবে দেখো যেদিন লোকে তার ছবি টাঙিয়ে পুজো করবে।

এইসময় একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—এই যে দ্বিজেনবাবু, ভালো আছেন তো? আমার সে অনুবাদগুলো কই? আজ পাব তো?

গুহ মহাশয় টেবিলের টানা হইতে একতাড়া কাগজ বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন—একটা বাদে সবগুলো আছে। নিন-

-একটা বাদ? সর্বনাশ! কালই প্রেসে দেব যে! বাকি কপি কবে পাওয়া যাবে?

দ্বিজেনবাবু বলিলেন—যাকে দিয়ে করাবো তার হয়েছে জ্বর। আচ্ছা দেখি কী করা যায়—

—একটু দেখুন দয়া করে, নইলে বড্ড মুশকিলে পড়ে যাব।

ভদ্রলোক বিদায় লইলে গুহ মহাশয় বলিলেন-উনি বইপাড়ারই একজন নতুন প্রকাশক। সারা পৃথিবীর কিছু গল্প বেছে অনুবাদ করিয়ে বিশ্বসাহিত্যে সেরা

www.bengaliebook.com

গল্প নাম দিয়ে একটা সংকলন প্রকাশ করতে চান। নতুন ব্যবসায় এসেছেন, কাউকে তেমন চেনেন না। তাই গল্পগুলো অনুবাদ করিয়ে দেবার ভার দিয়েছেন আমাকে। শেষ গল্পটার জন্য কাজ ঠেকে থাকছে, দু-একদিনের মধ্যে না দিতে পারলে প্রেস দাঁড়িয়ে যাবে-

কথা থামাইয়া গুহ মহাশয় কাজলের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকাইয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন—তুমি তো ইংরেজির ছাত্র, কিছুদিন আগে কী পত্রিকায় তোমার একটা গল্পও দেখলাম। তুমি কাজটা করে দিতে পারবে না?

কাজল অবাক হইয়া বলিল—আমি? আমি করে দেব বলছেন?

-হ্যাঁ, কেন নয়? এমন কিছু কঠিন কাজ নয়-দশবারো পাতা ইংরেজি থেকে সরল বাংলায় তর্জমা করতে হবে। আর তোমার তো নিজের সাহিত্যিক প্রবণতাও রয়েছে। করবে?

ঢোঁক গিলিয়া কাজল বলিল—-আজ্ঞে করবো।

আবার টেবিলের টানা খুলিয়া কয়েক পাতা টাইপ করা কাগজ বাহির করিয়া গুহ মহাশয় কাজলের হাতে দিলেন। বলিলেন—তাহলে ওঠো, আজ আর বোসো না। বাড়ি গিয়ে কাজে লেগে যাও। পরশু কিংবা তরশুর মধ্যে অনুবাদটা চাই।

বাড়ি আসিবার সময় ট্রেনের কামরায় বসিয়া কাজলের নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস হইতেছিল না। হাতে লেখা পত্রিকায় গল্প প্রকাশ নয়, সাময়িকপত্রেও নয়, একেবারে বাঁধাই করা দুই মলাটের মধ্যে তাহার গল্প ছাপা হইবে? অবশ্য মৌলিক নয়, অনুবাদ গল্প এবং অন্য আরও গল্পের সহিত, কিন্তু তাহাতে কী আসে যায়? জীবন তো কোথাও না কোথাও শুরু করিতেই হইবে।

কে জানে, ইহাই হয়তো তাহার জীবনের প্রথম লাকি ব্রেক। কোথায় যেন পড়িয়াছিল-নাম করিতে হইলে প্রতিভার সহিত ঠিক সময়ে ঠিক জায়গাতে উপস্থিত থাকিবার যোগাযোগও ঘটা চাই। আজ সে বসু ও গুহ পাবলিশার্সে না ঢুকিয়া সরাসরি বাড়ি চলিয়া গেলে এই মোগাযোগটি ঘটিত না। যোগাযোগ ঘটিয়াছে, বাকিটা এবার তাহার হাতে।

ডদিনরাত পরিশ্রম করিয়া দুইদিনের মধ্যেই সে অনুবাদটি জমা দিয়া আসিল।

হাতে আবার কোন কাজ নাই। অখণ্ড অবসর। এক বন্ধুর বাড়ি হইতে আনা কারেনিনা চাহিয়া আনিয়াছিল। সমালোচকদের মতে পৃথিবীর দশটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের মধ্যে আনা কারেনিনা স্থান পাইবার যোগ্য। কিন্তু পড়িতে শুরু করিয়া কাজল কেবলই হোঁচট খাইতে লাগিল, বহু চেষ্টা সত্ত্বেও পঞ্চাশ-ষাট পৃষ্ঠার বেশি অগ্রসর হইতে পারিল না। ব্রাদার্স কারামাজোভ পড়িবার সময়ও তাহার এমনি হইয়াছিল। কিছুদিন বাদ দিয়া আবার আরম্ভ করিলে হয়তো শেষ করিতে পারিবে এই আশায় তখনকার মতো সে বইটি রাখিয়া দিল। আনা কারেনিনা সে আর শেষ করিতে পারে নাই, কিন্তু বছর দুয়েক পর ছিন্নপত্র পড়িতে পড়িতে হঠাৎ উল্লসিত হইয়া আবিষ্কার করিল–রবীন্দ্রনাথেরও আনা কারেনিনা ভালো লাগে নাই। আরম্ভ করিয়াও তিনি বইখানি অর্ধপঠিত রাখিয়াছিলেন। এতবড়ো মানুষকে দলে পাইয়া কাজল খুশি হইল। অন্তত কোনকিছু না পড়ার দিক হইতে রবীন্দ্রনাথের সহিত তাহার মিল আছে।

বরং ডিকেন্‌স্ চলিবে বলিয়া মনে হইল। আর সঙ্গে কিছু এইচ.জি. ওয়েলস এবং জুল ভার্নের গল্প ও উপন্যাস। বিজ্ঞানসুবাসিত গল্পের প্রতি তাহার পরিচিত অনেকেরই বিরূপ মনোভাব আছে। সায়েনস ফিকশনের পাঠকসংখ্যা এদেশে নিতান্তই কম। একদিন স্বয়ং গুহ মহাশয়, যাহার মতামতের উপর তাহার গভীর শ্রদ্ধা আছে, তাহাকে বলিয়াছিলেন–তুমি সায়েনস্ ফিকশন পড়ে সময় নষ্ট কর কেন? জানো কী, একজন মানুষ

সারাজীবন অন্য কিছু না করে কেবলমাত্র বই পড়লেও মাত্র চারপাঁচ হাজারের বেশি বই পড়তে পারে না। এদিকে পড়বার মতো ভালো বই রয়েছে এর দশগুণ। কাজেই পাঠকের সতর্ক নির্বাচক না হয়ে উপায় নেই। ক্লাসিক পড়– ক্লাসিক।

দ্বিজেনবাবুকে কাজল মনে মনে পিতার মতো শ্রদ্ধা করে, সে তাহার কথার প্রতিবাদ করিল। আসলে বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প পড়িতে সে ভালোবাসে, কারণ এই ধরনের লেখা তাহার মন ও চিন্তাকে প্রসারিত করে। মানুষ যে কেবল এই পৃথিবীটার বাসিন্দা এমন নহে। গ্রহতারকাখচিত সমগ্র বিশ্বজগৎটা তাহার জীবনের পটভূমি। এই সত্য একবার হৃদয়ের গভীরে যথার্থভাবে অনুভব করিতে পারিলে অনেক পার্থিব সমস্যা সরল হইয়া আসে। কারণ বেশিরভাগ সমস্যাই মানুষের লোভ, ক্ষমতার আকাঙক্ষা ও বাসনা কামনা হইতে সঞ্জাত। সংকীর্ণতা দূর করিয়া সমস্ত জীবনটাকে একসঙ্গে দেখিতে পাইলে নতুন আবিষ্কারের আনন্দে মন ভরিয়া ওঠে। অবশ্য আমেরিকায় আজকাল বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পের কতগুলি অবাস্তব, বাজে গল্পে ভরা পত্রিকা বাহির হইয়াছে, যাহাকে পাল ম্যাগাজিন বলে–তাহাতে প্রকাশিত লেখাগুলি প্রকৃতই গাঁজাখুরি। তবে খুঁজিলে তাহার মধ্যেও দুএকটা ভালো লেখা চোখে পড়ে।

একদিন রাত্রে খাইতে বাসিয়া বাবার গল্প হইতেছিল। হৈমন্তী বলিল–লোকে তোর বাবার কত প্রশংসা করে। আমি মনে মনে ভাবি, বেঁচে থাকলে সে আরও কত লিখতে পারত। প্রথম যে দুখানা বই লিখে তোর বাবা নাম করে, সে দুটো নিজের জীবন নিয়েই লেখা–তা তো জানিস। মারা যাবার কদিন আগে থেকে কেবলই বলছিল–আমার তো বয়েস বাড়ল, ও বইখানার তৃতীয় খণ্ড এবার লিখব। অনেক বলার কথা জমেছে। তা শুরু করার আগেই তার দিন ফুরোলো।

কাজল বলিলকীভাবে লিখবেন সে বিষয়ে বাবা তোমাকে কিছু বলেন নি?

www.bengaliebook.com

-নাঃ। সবে খসড়া করতে শুরু করেছিল, আর কিছুদিন সময় পেলে বলত হয়তো। তবে তোর কথা লিখত এটা আমি জানি, কারণ দ্বিতীয় উপন্যাসে তোর চরিত্র অনেকখানি আছে।

অনেক রাত্রে ছাদে পায়চারি করিতে করিতে কাজলের মনে হইল–বাবা যে উপন্যাসটা লিখিবে ভাবিয়াছিল সেটা শেষ করিয়া ফেলিলে কেমন হয়? অন্য কিছু না হলেও একটা সাহিত্যের অ্যাভেঞ্চার তো হইবে।

কিন্তু কী লিখিবে সে? বাবার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাহার নাই। দারিদ্রের সহিত তীব্র সংগ্রামও তাহাকে করিতে হয় নাই। পৃথিবীর সমস্ত মহৎ উপন্যাসের মূলবস্তু যে বঞ্চনা, দুঃখ এবং বিশাল আত্মিক অভিজ্ঞতা, সে তাহার আছে কী? খামোক একটা অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন সামাজিক উপন্যাস লিখিয়া কী লাভ? আরও দুই-একটা গল্প লিখিয়াই সে বুঝিয়াছে নিজস্ব জীবনসত্য অবলম্বন করিয়া কেবল বানাইয়া লিখিলে ভালো সাহিত্য হয় না। তাহা হইলে সে কী লিখিবে? বড়ো বড়ো বিশ্ববন্দিত সাহিত্যিকদের সহিত তাহার জীবনের যে কোনও মিলই নাই।

তাহার পরই মাথার উপরে বিরাট নৈশ আকাশটার দিকে তাকাইয়া তাহার মনে হইলনাই বা থাকিল অন্য কারও মতো অভিজ্ঞতা, জীবন কী সকলের একরকম হয়? এই যে আকাশটা তাহার মাথার ওপর রহিয়াছে, এই যে বর্ষার মেঘ ঘনাইয়া আসা দিনে সবুজ গাছপালার মধ্য দিয়া গ্রামের পথে বেড়াইবার গভীর আনন্দ–সেই আনন্দ সে পাইয়াছে। জীবন-মৃত্যুর রহস্য সম্বন্ধে চিন্তা কতদিন কতরাত্রি অবধি তাহাকে ঘুমাইতে দেয় নাই। নিকটতম মানুষের মৃত্যু তাহাকে চিরজীবনের মতো নিঃসঙ্গ করিয়া দিয়াছে, কোন ঐশ্বর্যেই যাহা আর পূর্ণ হইবার নহে। কত বিচিত্র মানুষের সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছে–আখের আলি, রামদাসকাকা, ব্যোমকেশনাঃ, জীবনটা একেবারে হেলাফেলায় কাটে

নাই। অভিনবত্বের ঘনঘটা না থাকিলেও এইসব সাধারণ কথাই সে লিখিবে, সে যদি ইহা হইতে আনন্দ পাইয়া থাকে তাহা হইলে সততার সহিত লিখিতে পারিলে পাঠকও নিশ্চয় সেই লেখা গ্রহণ করিবে।

পরের কয়েকদিন সে বাবার শেষদিকের দুই-তিন বছরের ডায়েরি ভালো করিয়া খুঁজিয়া দেখিল, কোথাও কোন পরিকল্পনা বা খসড়া পাওয়া যায় কিনা। না, সে রকম কিছুই নাই। বাবা যদি কিছু ঠিক করিয়া থাকে, সেটা তাহার মনের ভিতরেই ছিল। যাক, এক দিক দিয়া ভালোই হইল। সে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে লিখিতে পারিবে। বাবা নিজের জীবনের কথা লিখিয়াছিল, সেও শৈশব হইতে তাহার নিজের জীবনের কথা লিখিবে। পিতার আরব্ধ কর্ম সম্পন্ন করা এক ধরনের পিতৃতর্পণ, বাবা হয়তো স্বর্গ হইতে তাহাকে আশীর্বাদ করিবে।

কিছু কাগজ কিনিয়া একদিন সকাল হইতে কাজল লিখিতে বসিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

জলাশয়ের কেন্দ্রে ঢেউ উঠিলে সে ঢেউয়ের বৃত্ত ক্রমবিস্তীর্ণ হইয়া একসময় যেমন দুরতম কোণে অবস্থিত জলজ উদ্ভিদের ক্ষুদ্র পাতাটিতে কম্পন জাগায়, তেমনি সমগ্র পৃথিবীতে ঘটিয়া যাওয়া কয়েকটি ঘটনার প্রভাব মহাদেশ পার হইয়া কাজলকে স্পর্শ করিল। জাপানে পরমাণু বোমা পড়িয়া বিশ্বযুদ্ধ থামিলে পৃথিবীসুদ্ধ লোক হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে ব্যাপারটার নৃশংসতায় অবাক হইয়া গেল। যুদ্ধ যাহারা করে তাহাদের নিকট আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অনেক বাছা বাছা যুক্তি থাকে। আমেরিকা বলিল–এই শেষপর্বেও জাপান যেভাবে মরীয়া হইয়া যুদ্ধ চালাইতেছিল, তাহাতে পরমাণু বোমা ব্যবহার করা ছাড়া অবিলম্বে এই নিরর্থক লোকয় বন্ধ করিবার আর কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু কিছু লোক এই যুক্তি মানিল না, তাহারা বলিল–জাপান যেভাবে কোণঠাসা হইয়া আসিতেছিল, তাহাতে যুদ্ধ আর কয়েকদিন বাদে আপনিই থামিয়া যাইত। মৃতপ্রায়, হতবল একটা জাতির নিরস্ত্র ও অসামরিক জনগণের উপর এই মহাশক্তিশালী অস্ত্রের প্রয়োগ নিজের শক্তি দেখাইবার একটা অমানবিক পন্থা মাত্র। বার্ট্রান্ড রাসেল প্রমুখ শান্তিবাদী দার্শনিকেরা এই মতের পক্ষ লইলেন। যাঁহার বস্তু ও শক্তির অভেদ নির্ণায়ক সূত্র অনুযায়ী বোমা বানানো হইয়াছিল, সেই আইনস্টাইন স্বয়ং ধ্বংসদেবতার নির্মম রুপ দেখিয়া মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। এই ভয়ানক অস্ত্র ব্যবহার না করিবার জন্য তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ করিয়া চিঠি দিয়াছিলেন, সে চিঠি খোলাই হইল না। ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্ট বদল হইয়া গেল। যুদ্ধের উত্তেজনার মধ্যে কে খোঁজ রাখে কোথাকার একটা পাগলা বৈজ্ঞানিক কী বলিতেছে! প্রথমে নেভাদার মরুভূমিতে এবং পরে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমার জোরদার পরীক্ষা হইয়া গেল।

অনেকদিন আগে রেললাইনের ধারে একটা মরা গরুকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া কাজলের মনে ভয়ানক ধাক্কা লাগিয়াছিল। তখনও তাহার বাবা বাঁচিয়া আছে। তাহার ভীত, আতঙ্কিত মুখ দেখিয়া অপু সস্নেহে তাহাকে একহাত দিয়া জড়াইয়া বুকের কাছে আনিয়া অনেক সানা দিয়াছিল। এখন বাবা নাই, যেদিকে তাকানো যায় জীবনের কোনোক্ষেত্রে নির্ভর করিবার মতো একটা ব্যক্তিত্ব নাই। বীভৎসতার নগ্নরূপ দেখিয়া কাজল কেমন যেন দমিয়া গেল। তাহা হইলে কী কাব্য, দর্শন, সংগীত মিথ্যা? সম্পূর্ণ অর্থহীন? শৈশব হইতে মানবসভ্যতার শুভ প্রভাব সম্বন্ধে তাহার যে গভীর বিশ্বাস, তাহা কী কেবলই কথার কথা? বারবার তাহার মনে পড়িতেছিল ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা মা ইট গ্রিভ মাই হার্ট টু সি হোয়াট ম্যান হ্যাজ মেড অফ ম্যান!

কিছু ভালো লাগে না। কবিতা বিস্বাদ লাগে, ভালো গান শুনিতে ইচ্ছা করে না, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম আশাবাদী সাহিত্যকর্মকে হাসির গল্প বলিয়া মনে হয়। চোখের উপর দিয়া মিছিল করিয়া যায় তেজস্ক্রিয়তার কামড়ে আসন্ন মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষারত নিরপরাধ নরনারীর দল। কাহারও গায়ে দগদগে ঘা, কাহারও শরীর হইতে মাংস খসিয়া পড়িতেছে, কেহ বা কোটর হইতে বাহির হইয়া আসা নিজের গলিত চোখ হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কোথাও বা সোকাহত মা নর্দমা হইতে আঁচল ভিজাইয়া জল আনিয়া মৃত শিশুর মুখে দিয়া তাহার জ্ঞান ফিরাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। কোথাও নির্জনে গিয়া বসিলেই এইসব দৃশ্য চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে। মনে হয় পৃথিবী সম্পূর্ণ গ্লানিমুক্ত না হইলে এই পাখির ডাক, মায়াময় রঙে রাঙানো সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত, মালকোষের শিহরণ জাগানো আলাপ-কোনও কিছুরই কোনো মূল্য নাই। এই মুহূর্তে যখন বিধ্বংসী কামানের গর্জনে দিগন্ত কাঁপিতেছে, বোমারু বিমানের সার্চলাইটের আলোতে রাত্রির আকাশ শতধা বিভক্ত, তখন সেই সৌন্দর্যহীন, নিরাপত্তা ও বিশ্বাসহীন পৃথিবীতে সুকুমার বৃত্তির স্থান কোথায়?

www.bengaliebook.com

ভারতের স্বাধীনতা আসন্ন। সংবাদপত্রের খবরে বিভিন্ন মহলের তৎপরতায় সেই আশ্বাস ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, ইংরাজ যাইবার সময় ভারতকে দুইটি পৃথক রাষ্ট্রে ভাগ করিয়া দিয়া যাইবে। যে ঐশ্বর্য তাহারা নিজেরা ভোগ করিতে পারিল না, কুটিল ইংরাজ তাহা অপরকেও সুখে ভোগ করিতে দিবে না। দুই রাজ্য কীভাবে এবং কিসের ভিত্তিতে ভাগ হইবে তাহা লইয়া সর্বত্র জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হইল। দেশের ভিতর যেসব বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় এতদিন শান্তিতে বাস করিত, পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্য এবং সম্প্রীতির কোন অভাব ছিল না– এইবার সেই সহিষ্ণুতা ও বন্ধুত্বের শান্ত জলে ইংরাজ নিক্ষিপ্ত ঢিল আসিয়া পড়িল।

এম.এ. পরীক্ষার ফল বাহির হইলে নিজের নম্বর দেখিয়া কাজল অবাক হইল না, হতাশও হইল না। সে যেমন ভাবিয়াছিল তেমনই ফল হইয়াছে। সেনেট হাউসের দেয়ালে টাঙানো উত্তীর্ণ ছাত্রদের নামের তালিকায় নিজেদের নাম দেখিয়া প্রভাত ও কাজল গোলদীঘিতে আসিয়া বসিল। প্রভাত বলিল–তোকে স্যালুট করতে ইচ্ছে করছে, বুঝলি?

কাজল হাসিয়া বলিল–কেন রে, আমি কী দোষ করলাম?

-তুই দেখিয়ে দিলি কত কম পড়াশুনো করেও এম.এ. পাশ করা যায়। আমার রেজালট ধরাবাঁধা হিসেবের মধ্যেই হয়েছে কিন্তু তোরটা অ্যাচিভমেন্ট্। এখন কী করবি ভাবছিস?

গোলদীঘির জলে একটি কিশোর সাঁতার শিখিবার প্রচেষ্টায় আপ্রাণ হাত-পা ছুঁড়িতেছিল, সেইদিকে তাকাইয়া দেখিতে দেখিতে কাজল বলিল–মাকে গিয়ে খবরটা দেব–

-না, ইয়ার্কি নয়। কিছু ভেবেছিস এ বিষয়ে?

-নাঃ। আমাকে তো জানিস, ভেবে আমি কিছু ঠিক করতে পারি না। হঠাৎ কিছু শুরু করে দেব-

প্রভাত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল-তুই খুব ইমপালসিভু আমি জানি। কিন্তু আমাদের ছেলেমানুষি করার বয়েস গেছে। ঘোট হোক, বড়ো হোক—একটা কোন কাজ শুরু কর। কেবলমাত্র টাকা উপার্জনের জন্য বলছি না, জীবনে একটা স্থিরকেন্দ্র থাকা দরকার, তাই বলছি।

-তুই কী করবি?

—ম্যাথু আর্নল্‌ড্‌ সম্বন্ধে রিসার্চ করব ভাবছি। মনে আছে, বছরদুয়েক আগে তুই-ই আমার মাথায় আর্নলড় ঢুকিয়েছিলি? তারপর দেখি কী করা যায়—

কাজল অন্যমনস্কভাবে সেনেট হাউসের মাথার দিকে তাকাইয়াছিল, এবার প্রভাতেব দিকে চোখ নামাইয়া বলিল—একটা কথা মনে হচ্ছে-

-কী রে?

—এতদিন আমরা একসঙ্গে পড়াশুনো করছিলাম, রোজ দেখা হবার একটা ব্যাপার ছিল। এবার জীবিকা অর্জনের জন্য কে কোথায় ছিটকে যাবে তার ঠিক নেই। তুই কিন্তু আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবি, বুঝলি? একা মানুষ বাঁচে না-

উত্তরে প্রভাত কেবল একটু হাসিল।

www.bengaliebook.com

আরও কিছুক্ষণ গল্প করিবার পর প্রভাত ট্রামে উঠিয়া নিজের বাড়িতে পাশের খবর দিতে গেল। ট্রেন ধরিবার আগে কাজল বসু ও গুহের দোকানে ঢুলি তাহার খবর জানাইতে। আজ প্রথমে বসু আরামকেদারা দখল করিয়া গা এলাইয়া রহিয়াছেন। দ্বিজেনবাবু সম্ভবতঃ কিছু পরে আসিয়া বিপাকে পড়িয়াছেন। সম্প্রতি তিনি পাশেই একটি চেয়ারে বসিয়া কী একটা পত্রিকার পাতা ওলটাইতে ওলটাইতে পরিস্থিতির উপর সতর্ক নজর রাখিতেছেন। প্রমথবাবু কোনো কারণে একবার আরামকেদারা ছাড়িলেই তিনি তৎক্ষণাৎ সেটি দখল করিবেন। কিন্তু বসু ও গুহ পাবলিশার্সের অপর অংশীদারের নিশ্চিন্ত বিশ্রামের ভঙ্গি দেখিয়া মনে হইতেছে দ্বিজেনবাবুর প্রতীক্ষা কিছু দীর্ঘ হইবে।

কাজলের পাশের খবর শুনিয়া দুই বন্ধু যথার্থই খুশি হইলেন। দ্বিজেনবাবু একজন কর্মচারীকে তখনই সন্দেশ আনিতে পাঠাইলেন। পুরোনো দিনের অনেক গল্প হইল, অপু বাঁচিয়া থাকিলে ছেলের কৃতিত্বে সে আজ কত খুশি হইত সে কথা বলিয়া দুইজনে দুঃখ করিলেন। দ্বিজেনবাবু বলিলেনতোমাকে কেমন যেন বিমর্ষ দেখাচ্ছে। কেন বল তোতা?

কাজল প্রথমে বুঝিতে পারিল না নিজের মনের ভাব কী করিয়া গুছাইয়া বলিবে, তাহার পর মনে হইল বলিতে হইলে ইহাই সর্বাপেক্ষা ভালো স্থান। সে বলিল—আমার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, না? আসলে বর্তমান সময়টাই আমার খাপ খাচ্ছে না। পৃথিবী জুড়ে এতবড় একটা যুদ্ধ হয়ে গেল, কত লোক মারা পড়ল ভাবুন তো কাকা! হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ যে মূল্যবোধের অনুসরণ করে এসেছে, সব মিথো হয়ে গেল? যাই করতে যাচ্ছি, কেবলই মনে হচ্ছে—এসবের আসলে কোন মানে নেই। সাধারণ মানুষের শান্তিপ্রিয়তার কোন দাম নেই, তাদের জীবনেরও কোন মূল্য নেই। পৃথিবীর

শক্তিশালী রাষ্ট্রনেতারা ইচ্ছে করলেই যুদ্ধ বাধাতে পারে যে কোন সময়ে কোটি কোটি সাধারণ মানুষের ইচ্ছে-অনিচ্ছেয় কিছু এসে যায় না। তাহলে?

দ্বিজেনবাবু খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন–ঠিকই বলেছ, বর্তমান দুনিয়ার যা হালচাল তাতে আশাবাদ বাঁচিয়ে রাখা খুব কঠিন। কিন্তু জানো তো, সকালের আলো ফুটবার আগে রাত্রির অন্ধকার সবচেয়ে কালো হয়ে আসে? যুদ্ধ রাষ্ট্রবিপ্লব কিছু নতুন কথা নয়ইতিহাস খুললেই দেখবে যুগে যুগে এসব হয়ে আসছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ থেকে বর্গীর হাঙ্গামা পর্যন্ত শান্তির চেয়ে অশান্তিই বেশি। মানুষের যা কিছু শ্রেষ্ঠ কীর্তি, তা কিন্তু এসবের মধ্যে থেকেই উঠে এসেছে। রুপার্ট ব্রুক বা উইলফ্রেড ওয়েনের কথা ভাবো-তুমি দূর থেকে কাতর হচ্ছ, তারা রাইফেল হাতে যুদ্ধ করেছেন, হাত বাড়ালে ছোঁয়া যায় এমন দূরত্ব থেকে মৃত্যুকে দেখেছেন। তার মধ্যেই কিন্তু লিখেছেন অমর কাব্য। এখানেই মানুষের জয়-

তারপর কাজলের দিকে তাকাইয়া হাসিয়া বলিলেন-তুমিও তো লেখো, লেখকের অনেক দায়িত্ব। উদ্যত রাইফেলের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের গাইতে হবে জুঁইফুলের গান-

বাড়িতে আসিয়া কাজল দেখিল মায়ের শরীর ভালো নয়। দুপুর হইতে পেটে কেমন একটা ব্যথা হইতেছে। সম্প্রতি ব্যথাটা পিঠের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ছেলের এম.এ. পাশের খবর পাইয়া হৈমন্তী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল। কাজল বলিল–উঠছো কেন মা, শুয়ে থাকে। আমি বরং তোমার পাশে বসে গল্প করি-

হৈমন্তী শুনিল না, বলিল–না, আমার মানত ছিল তোর পাশের খবর এলে দাঁড়াহরির লুট দেবো। যা, মোড়ের দোকান থেকে কড়াপাকের সন্দেশ কিনে

নিয়ে আয়। আসবার সময় রায়বাড়ি, মুখুজ্যেবাড়ি আর অমিয়বাবুর বৌকে বলে আসবি, বলবি-মা বলেছে এক্ষুনি আসতে, হরির লুট হবে-

নিজের পাশের জন্য হরির লুটের নিমন্ত্রণ করিতে কাজলের লজ্জা করিতেছিল। কিন্তু মায়ের আগ্রহে পাড়াসুদ্ধ লোককে বলিয়া আসিতে হইল। সন্দেশ কিনিয়া বাড়ি ফিরিয়া দেখিল মা তখনও বসে নাই, সাধারণ শাড়ি ছাড়িয়া গরদের কাপড় পরিয়াছে এবং খাটের বাজু ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। হৈমন্তীর মুখ দেখিয়া মনে হয়, ব্যথার জন্য তাহার দাঁড়াইতে বেশ কষ্ট হইতেছে। মায়ের জন্য কাজলের হঠাৎ খুব মমতা হইল। ঠাকুরমার ঝুলি হইতে আধুনিক সামাজিক উপন্যাস পর্যন্ত সর্বত্র সত্মায়ের যে রক্তশীতলকারী চিত্র আঁকা হইয়াছে, ইহার সহিত সে বিভীষিকার কোনই মিল নাই। পাষণ্ড লেখকগুলিকে ডাকিয়া তাহার মাকে দেখানো উচিত।

দিন-দুই বাদে একদিন পথে স্কুলের মাস্টারমশাই কালিদাসবাবুর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। ইনি সেকালের গ্র্যাজুয়েট, ইংরাজি হইতে বিজ্ঞান পর্যন্ত সব বিষয়েই প্রয়োজন হইলে ক্লাস লইতেন। শোনা যায় পিরিয়ড কামাই যাইতেছিল বলিয়া একবার ড্রইংয়ের ক্লাসেও বক আঁকিয়া কাজ চালাইয়া দিয়াছিলেন। শিক্ষকতাকে যাঁহারা বৃত্তি না ভাবিয়া ব্রত হিসাবে লইয়াছিলেন, সেই বিরল মানুষদের ইনি একজন শেষ প্রতিভূ। এই টাইপটাই ধীরে ধীরে শেষ হইয়া আসিতেছে। ক্লাসে কালিদাসবাবু যে কেবলমাত্র পাঠ্যবিষয় পড়াইতেন তাহা নয়, মুখে মুখে ইতিহাসের গল্প শোনাইতেন, মহাপুরুষদের জীবনের কাহিনী বলিতেন। ইহাতেই শেষ নয়, ছুটির পর উৎসাহী কিছু ছাত্রকে স্কুলের পিছনের মাঠে লইয়া গিয়া কুস্তির প্যাঁচ শিখাইতেন। জামা ও গেঞ্জি খুলিয়া ঘাসের উপর রাখিয়া মালকোচা মারিয়া নিজে ছাত্রদের সঙ্গে কুস্তি লড়িতেন। কাজলও উৎসাহে পড়িয়া কিছুদিন এই দলে ভিড়িয়াছিল। সে

www.bengaliebook.com

একবার কালিদাসবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল–স্যার, আপনি জুজুৎসু জানেন, না? আমরা শিখতে চাই-

কালিদাসবাবু হাসিয়া বলিয়াছিলেন-বাপু হে, ভারতীয় কুস্তির রীতিতে এমন অনেক প্যাঁচ আছে যার কাছে জাপানী জুজুৎসু লাগে না। আগে সেগুলো শেখো, তারপর জুজুৎসুর কথা ভাবা যাবে।

কাজল পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল–ভালো আছেন স্যার?

–কে? অমিতাভ নাকি? অনেকদিন তোকে দেখি না-কী পড়ছিস এখন?

-আমি এবার এম.এ. পাশ করলাম স্যার, এই কদিন আগে রেজাল্ট বেরিয়েছে–

-বাঃ, খুব আনন্দের কথা। কী সাবজেকট যেন ছিল-ইংরিজি না?

-হ্যাঁ স্যার।

-কী করবি ভাবছিস এখন?

কাজল বলিল–কিছু ঠিক করিনি স্যার। এই তো সবে ফল বেরুল-

কালিদাসবাবু বলিলেন–তুই তো আজকাল কাগজে গন-টন লিখছিস। তোর দুটো গল্প আমি পড়েছি। বেশ ভালো লেখা। তোর লেখা নিয় মাস্টারমশাইদের মধ্যে আলোচনা হয়–

www.bengaliebook.com

কাজলের খুব আনন্দ হইল। ছোটবেলায় যে শিক্ষকদের কাছে পড়িয়াছে তাহারা তাহার লেখা পড়িয়া আলোচনা করিয়াছেন! মানুষের অহং তৃপ্ত হইবার মতো ব্যাপার বটে!

দিনদুয়েক বাদে সন্ধ্যাবেলা কাজল নিজের ঘরে বসিয়া লিভিংস্টোনের জীবনী পড়িতেছে, এমন সময়ে খট্ খট্ করিয়া বাহিরের দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল। দরজা খুলিয়া সে দেখিল কালিদাসবাবু দাঁড়াইয়া আছেন। সে অবাকও হইল, খুশিও হইল। সে যখন স্কুলের ছাত্র, তখনও মাস্টারমশাই কোনোদিন তাহাদের বাড়ি আসেন নাই। এই প্রথম।

ঘরে আসিয়া কালিদাসবাবু খাটের এককোণে বসিলেন, উপুড় করিয়া রাখা বইটা হাতে লইয়া বলিলেন–এই বইটা পড়ছিলি বুঝি? লিভিংস্টোনের জীবনী? খুব ভালো, বই পড়ার অভ্যেস মানুষকে মহৎ করে, মনটাকে বড় করে। দেখবি যারা বই পড়তে ভালোবাসে তারা কখনও ছোটাখাটো নীচতা করতে পারে না।

কাজল মাকে ডাকিয়া মাস্টারমশাইয়ের সহিত পরিচয় করাইয়া দিল। তিনি হাসিয়া বলিলেন—আলাপ হয়ে ভালোই হল বৌঠান, আপনার কাছ থেকে একটা অনুমতি নেবার আছে। সত্যি বলতে কী, সেজন্যেই আজ এসেছি। অমিতাভ তো এবাব এম.এ. পাশ করেছে, বর্তমানে কোন কাজও করছে না। ওকে আমি আমাদের স্কুলে শিক্ষক হিসেবে নিয়ে যেতে চাই। আপনার কোন আপত্তি হবে না তো?

কাজল শুনিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল, খুব আনন্দও হইল। স্কুলের মাস্টারমশাইদের শ্রদ্ধা করিতে হয়, দেখা হইলেই প্রণাম কবিতে হয় নিজেরও যে কোনদিন সেই শ্রেণিভুক্ত হওয়া সম্ভব তাহা যেন ঠিকঠাক বিশ্বাস হয় না।

কালিদাসবাবু কাজলকে বলিলেন–তোর যদি অসুবিধে না থাকে তাহলে এই সোমবার থেকেই কাজ শুরু কর। পৌনে এগারোটার ভেতর স্কুলে আসবি।অবশ্য প্রথম দিন সাড়ে দশটায় যাওয়াই ভালো। এখন তোকে স্কেল দিতে পারব না। থাউকে কিছু টাকা ধরে দেবো, কাবণ স্কুলে এখন কোনো পোস্ট খালি নেই, তোকে বাড়তি হিসেবে নিচ্ছি। আট-দশমাস পরে মণীন্দ্রবাবু রিটায়ার করবেন, সেই জায়গায় তোকে পাকাপাকিভাবে নিয়ে নেব

হৈমন্তী জলখাবারের ব্যবস্থা করিতে গেলে কালিদাসবাবু অনেক কথা বলিলেন। স্কুলে এখন কোন হেডমাস্টার নাই, সবচেয়ে সিনিয়ার টিচার হিসাবে তিনিই কাজকর্ম দেখিতেছেন। শিক্ষকদের মধ্যে নানাবুপ দলাদলি শুরু হইয়াছে। ভালোভাবে ইংবাজি পড়াইবাব মতো কেহ নাই। বয়স্ক শিক্ষক রাখিলে এ অবস্থায় উন্নতি ঘটানো যাইবে না। তরুণ এবং আদর্শবাদী শিক্ষক, যাহার ভিতর উৎসাহ ও স্বপ্ন এখনও মরিয়া যায় নাই, স্কুলকে বাঁচাইতে হইলে এখন তেমন একজনকে প্রয়োজন। কাজলের এইসব গুণ আছে বলিয়া তিনি মনে করেন।

প্রথমদিন স্কুলে যাইবার জন্য রওনা হইয়া কাজলের মনে হইল রাস্তায় যত লোক সবাই তাহার দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছে, সবাই যেন ধরিয়া ফেলিয়াছে সে স্কুলে ছাত্র পড়াইতে যাইতেছে। দশটা পনেরোতেই সে পৌঁছাইয়া গেল। এগারোটা হইতে ক্লাস শুরু, একমাত্র কালিদাসবাবু টিচার্স রুমে খাতাপত্র লইয়া কী যেন করিতেছেন, অন্য কেহই এখনও আসে নাই। কাজলকে দেখিয়া তিনি বলিলেন–এই যে অমিতাভ, এসে গিয়েছিস দেখছি। বোস ওই চেয়ারটায়। সবাই আসতে এখনও দেরি আছে। দাঁড়া, অ্যাটেনডেনস রেজিস্ট্রারে তোর নামটা তুলে দিই, তারপর সই কর

www.bengaliebook.com

টেবিলের উপর হইতে একটা মোটা খাতা লইয়া কালিদাসবাবু তাহাতে যথাস্থানে কাজলের নাম লিখিলেন, তাহার পর খাতাটা তাহার হাতে দিয়া বলিলেন–নে, সই কর–

কাজল নির্দিষ্ট খোপে জীবনে প্রথম চাকুরির হাজিরাজ্ঞাপক সই দিল।

-বোস না, দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

ছাত্রজীবনে এই ঘরে বিভিন্ন কারণে অজস্রবার আসিতে হইয়াছে এবং শিক্ষকদের সামনে তটস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছে, কেহ বসিতে বলেন নাই। সেই মজ্জাগত অভ্যাস ও মনোভাব অকস্মাৎ ত্যাগ করা কঠিন। সে লজ্জিত গলায় সংকুচিত হইয়া বলিল–ঠিক আছে স্যার, আমি কেশ আছি-

কালিদাসবাবু হাসিয়া বলিলেন-বুঝেছি। আচ্ছা তুই এক কাজ কর, লাইব্রেরি ঘরে চলে যা। ছোকরা টিচাররা ওই ঘরটায় বসার ব্যবস্থা করেছে–তুইও যা। প্রেয়ারের ঘণ্টা পড়লে এসে প্রেয়ারে যোগ দিবি। তারপর দেখি তোকে কী ক্লাস দেওয়া যায়-

লাইব্রেরির জন্য নির্দিষ্ট ঘরটি বিশেষ বড়ো নহে। চারিদিকের দেওয়াল ঘেঁষিয়া কয়েকটি কাঁচের পাল্লা লাগানো আলমারি। মাঝখানে একটি লম্বা টেবিল, তাহার দুইদিকে দুইটি বেঞ্চি এবং এদিক ওদিক ছড়ানো কয়েকটি চেয়ার। আলমারিগুলিতে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রের বেশ কিছু ভালো বই রহিয়াছে, কিন্তু সেগুলি পারতপক্ষে ছাত্রদের পড়িতে দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই। ছাত্ররাও যে সকলেই বিশ্বসাহিত্য পড়িবার জন্য ভয়ানক উৎসাহী এমন নয়, তবু দুই-একজন ছেলে বই পড়িতে চাহিলে লাইব্রেরির ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক শিবলালবাবু দেশলাইয়ের কাঠি দিয়া অর্ধনিমীলিত চোখে কান খোঁচাইতে

www.bengaliebook.com

খোঁচাইতে উদাস গলায় বলেন-বই পড়বি? কিনে পড়গে যা—এসব দামি বিলিতি বই, হাতে হাতে বেশি ঘুরলে নোংরা হয়ে যাবে-

অত্যুৎসাহী কেহ বলে-নোংরা হবে না স্যার, মলাট দিয়ে পড়ব—

-তাই? বাঃ, ভালো কথা। বেশ, হেডমাস্টারমশাইকে বলে দেখ—

হেডমাস্টার! কী সর্বনাশ! সাধ করিয়া কে আত্মহত্যা করে?

কাজল গিয়া বসিতে বসিতেই একজন অল্পবয়েসী শিক্ষক ঘরে ঢুকিল। কাজলকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল-আপনি কী কাউকে খুঁজছেন?

-না, আমি—মানে আজ থেকে কালিদাসবাবু বললেন এখানে বসতে-

দশমিনিটের মধ্যেই দুইজনের পরিচয় বেশ গাঢ় হইয়া গেল। ছেলেটির নাম রমাপদ, বছর দেড়েক হইল বি.এ. পাশ করিয়া এখানে পড়াইতেছে। বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার কী একটা গ্রামে। একলা একটি ছোট ঘর ভাড়া করিয়া থাকে ও নিজে রান্না করিয়া খায়। সাহিত্যে বেশ উৎসাহ। কাজলের নাম শুনিয়াই সে বলিল—ও আপনি অপূর্ব রায়ের ছেলে, না? আপনি নিজেও তো লেখেন? আপনার লেখা আমি পড়েছি

এমন সময়ে প্রার্থনার ঘণ্টা পড়িল। রমাপদ বলিল-চলুন, প্রেয়ারে যাওয়া যাক। পরে জমিয়ে গল্প করা যাবে। আপনি কী কোনো ক্লাস পেয়েছেন?

না এখনও কালিদাসবাবু কিছু বলেন নি- -

-বেশ, যতক্ষণ হাল্কা থাকবেন ততক্ষণই ভালো। চলুন—

www.bengaliebook.com

প্লেয়ারের পর সকল শিক্ষকেরাই টিচার্স রুমে আসিলেন। কালিদাসবাবু বলিলেন—অমিতাভ, তুমি সেভেন বি-র খাতাটা নিয়ে ক্লাসে যাও, ওটা দুলালবাবুর বাংলা গদ্যের রাস—তিনি এখনও আসেন নি। তারপর দেখি আর কী দেওয়া যায়-

শিক্ষকজীবন শুরু হইয়া গেল।

ইংরাজ শাসকের উদ্দেশ্য সফল হইল। স্বাধীনতা আসিয়া পড়িল বটে, কিন্তু দেশের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক অসন্তোষের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কাজল প্রথমে ব্যাপারটার গুরুত্ব ঠিকঠাক উপলব্ধি করিতে পারে নাই। খবরের কাগজে কলিকাতার নানা সংবাদ প্রকাশিত হইতেছিল বটে, কিন্তু সেই বিবরণ নিতান্তই গুটিকয়েক অক্ষরের সমষ্টি মাত্র। পৃথিবী এত সুন্দর, জীবন এত মধুর-এখানে খারাপ কিছু ঘটিতে পারে না। মানুষ কখনও মানুষের প্রতি এতটা নির্মম হইতে পারে না।

অথচ সে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ দেখিয়াছে, হিরোশিমার তাণ্ডব দেখিয়াছে, জার্মান কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ইহুদীদের উপর আইখম্যানের অমানবিক অত্যাচারের কথা সে জানে। মানুষের মানবিকতার উপর এই বিশ্বাস নিষ্ঠুর বাস্তবকে ভুলিয়া থাকিবার জন্য তাহার মনের একটা কারসাজি মাত্র। মানুষ সব মিলাইয়া মোটের উপর ভালোই, কারণ তাহার সভ্যতা অনেক ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়াও আজ এত হাজার বছর টিকিয়া আছে। কিন্তু তাহারই মধ্যে মাঝে মাঝে এক-একটা উন্মত্ততার যুগ আসে, পৃথিবীব্যাপী অশান্তির অন্ধকার ঘনাইয়া আসে। কাজলের কেমন মনে হয়, আসলে দুই পক্ষের মানুষগুলি কেহই খারাপ নহে, অদৃশ্য এক তৃতীয়পক্ষ নিজেদের কূট স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য দুইজনকে লড়াইয়া দিয়াছে।

নানাবিধ গোলযোগের মধ্যে দেশ স্বাধীন হইল। স্বাধীনতা আনিতে যে রক্তপাতের প্রয়োজন হয় নাই, নিরর্থক ভ্রাতৃবিরোধে সেই রক্ত দেশের মাটিতে ঝরিয়া পড়িল। তবু তো এখন দেশ স্বাধীন। জাতীয় জীবনে নতুন একটা উদ্দীপনার জোয়ার আসিয়াছে। কেবল প্রভাত একদিন মির্জাপুর স্ট্রীটে তাহাদের পরিচিত চায়ের দোকানে আড্ডা দিতে দিতে কাজলকে বলিল- স্বাধীন হয়ে সবাই খুব খুশি, কিন্তু ইট ইজ টু আর্লি টু রিজয়েস–

বিস্মিত কাজল জিজ্ঞাসা করিল–কেন?

-এতদিন সবকিছু অসুবিধের জন্য আমরা ইংরেজকে দায়ী করে এসেছি। এবার দায়িত্ব আমাদের নিজেদের ঘাড়ে–সামনে অনেক সমস্যা অমিতাভ, সেখানে ব্যর্থ হলে কাকে দায়ী করব? এবারই আসল পরীক্ষা শুরু হল–

কাজল রাজনীতি বোঝে না, কিন্তু প্রভাতের কথাগুলি তাহার যথার্থ বলিয়া মনে হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

এ বছর ঘোর বর্ষা নামিয়াছিল। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতের বহর দেখিয়া সকলে মনে করিয়াছিল এবার বন্যা না হইয়া যায় না, দুর্গাপূজাও বোধহয় নিতান্তই মাটি হইল। কিন্তু পূজার দিনদশেক আগেই বর্ষা শেষ হইয়া ঝকঝকে শরতের আকাশ বাহির হইয়া পড়িল। সারাদিন সুনীল আকাশে খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে, বাতাসে আসন্ন উৎসবের আনন্দময় স্পর্শ। কাজলের আর পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া ঠাকুর দেখিয়া বেড়াইবার বয়েস নাই, তবু তাহার মনে অদ্ভুত আনন্দ ছড়াইয়া পড়িল। ঘরের বাহির হইতেই হইবে তাহার কোনো মানে নাই, চারিদিকে ঢাকের শব্দ আর অনেক মানুষের আনন্দকোলাহলের মধ্যে ভালো একখানি বই হাতে জানালার পাশে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে মন্দ লাগে না।

মহালয়ার দিন সকালে স্নান করিয়া মায়ের পূজা করিবার শাড়িটি ধুতির মতো করিয়া পরিয়া কাজল ভিতরের বারান্দায় তর্পণ করিতে বসিল। পরলোক এবং আত্মার অবিনশ্বরতা ইত্যাদি বিষয়ে কাজল অন্যান্য সাধারণ মানুষেরই মতাবলম্বী—অর্থাৎ আগনস্টিক। তাহার বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কোনোটাই খুব প্রবল নহে, কিন্তু চিরাচরিত জাতীয় ঐতিহ্য পালন করিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভালোই লাগে। কে জানে সত্যিই মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে কিনা, কিন্তু তাহার জ্ঞানের সীমানার বাহিরেও তো জগৎটা অনেকখানি প্রসারিত। যদি কিছু থাকে, যদি সন্তানের উৎসর্গ করা জল সত্যিই কোনোভাবে স্বর্গত, পিতার তৃষ্ণা নিবারণ করে—আর কিছু না হোক, অন্তত এইভাবে বৎসরে একদিন তো পূর্বপুরুষদের নাম সংসারে উচ্চারিত হইতেছে। তর্পণের মাধ্যমে পারিবারিক ইতিহাসের সহিত বর্তমানের সুন্দর একটা গৌরবময় সেতু প্রস্তুত হয়।

আর কী সুন্দর মন্ত্রগুলি! পিতা পিতামহ এবং পিতৃমাতৃকুলের সকল স্বর্গত মানুষেরা তো বটেই, তাহা ছাড়া পৃথিবীতে যেখানে যত বান্ধবহীন মানুষ মৃত্যুবরণ করিয়াছে, তৃষ্ণার্ত বা অগ্নিদগ্ধ হইয়া প্রাণবিসর্জন করিয়াছে, তাহারা সবাই যেন আমার প্রদত্ত এই জল পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করে। জল প্রকৃতই কোথায় পৌঁছায় কে জানে, কিন্তু তাবৎ বিশ্বজনের সহিত আত্মীয়তা অনুভব করিবার জন্য অনুষ্ঠানটি সহায়তা করে।

কোথায় স-তিল গঙ্গাজল লইয়া বাবার নাম উচ্চারণ করিবার সময় যেমন উদার আনন্দ হয়, তেমনই একটা চাপা অভিমানে বুক ভরিয়া ওঠে। সে জানে, বাবা ইচ্ছা করিয়া অসময়ে চলিয়া যায় নাই। তবু বাবার উপর অবুঝের মতো রাগ হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা বিশ্বসংসারের দুর্দঘ্য নিয়মের প্রতি অসহায় আক্রোশ মাত্র।

দুপুরবেলা কাজল কী একখানা বই লইয়া নিজের ঘরে শুইয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল, এমন সময় বাহিরের দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল।

কাজল একটু অবাক হইল। এখন বেলা আড়াইটা হইবে, এই সময়টা সাধারণত গৃহস্থবাড়িতে অতিথি আসে না। তবে পিওন হইতে পারে।

একান্ত বিস্ময়ের কিছু ঘটিলে মানুষের মস্তিষ্কে জোর ঝাকুনি লাগে, সামনে যাহা ঘটিতেছে তাহা চোখে দেখিলেও তাহার মর্মার্থ হৃদয়ে প্রবেশ করিতে সময় লাগে। দরজা খুলিয়া কাজলেরও ঠিক তাই হইল।

অপালা আসিয়াছে।

কিছুক্ষণ বিহ্বলভাবে তাকাইয়া থাকিবার পর কাজল বলিল—তুমি! আমার বাড়ির ঠিকানা পেলে কী করে? আগে কোনো খবর দাওনি তো!

www.bengaliebook.com

অপালা হাসিয়া বলিল—ইচ্ছে করেই দিইনি। কেমন সারপ্রাইজ হল, বলুন তো?

কাজল কিছুটা সামলাইয়া বলিল—এসো এসো, ভেতরে এসো-

হৈমন্তী নিজের ঘরে ঘুমাইতেছে। ইদানীং তাহার শরীর ভালো যাইতেছে না। দুপুরে খাইবার পর একটা বই লইয়া শুইলে আপনিই চোখের পাতা খুঁজিয়া আসে। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে কাজল এই সময়টা মাকে ডাকে না।

একমুহূর্ত দ্বিধা করিয়া কাজল অপালাকে নিজের ঘরেই আনিয়া বসাইল।

অপালা আঁচল দিয়া গলার ঘাম মুছিয়া ঘরের চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল। বলিল—পড়ুয়া লোকের ঘর যে সেটা বোঝা যায়-

-কী করে বুঝলে? বই দেখে?

-না, বই অনেকের বাড়িতেই থাকে, সবাই কী পড়ে? ও সাজানোই থাকে। আসলে যারা সত্যি বই পড়ে তাদের বইপত্র অগোছালো হয়। এইরকমই ভালো—আপনি যেন আবার গোছাতে গিয়ে ঘরের শ্রী নষ্ট করবেন না। আপনার মা কই? আজ কিন্তু মায়ের সঙ্গে আলাপ করবো বলেই আসা-

কাজলের বিস্ময়ের ঘোরটা তখনও ঠিকঠাক কাটে নাই। নির্জন দুপুরে একজন সুন্দর তরুণী তাহার ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছে—এ অভিজ্ঞতা তাহার জীবনে একেবারেই নতুন। সে বলিল—মা শুয়ে আছেন, বোধহয় ঘুমোচ্ছন। মার শরীর কিছুদিন ধরে ভালো যাচ্ছে না। একটু পরে উঠলে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। তুমি আমার বাড়ি চিনলে কী করে? অনেক খুঁজতে হয়েছে?

অপালা কাজলের দিকে তাকাইয়া বলিল—ভালো।

অবাক হইয়া কাজল বলিল—কী ভালো?

নিজেদের খ্যাতি সম্বন্ধে উদাসীন থাকা ভালো। একমাত্র মহতেরাই পারে—

-কী বলছে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

অপালা বলিল-আপনার বাবার নাম কত জানেন? সমস্ত দেশের লোক আজ তাকে পুজো করছে। স্টেশনে নেমে একজনকে জিজ্ঞাসা করতে সে একেবারে বাড়ির দরজায় এনে পৌঁছে দিয়ে গেল।

অপালা দেখিতে আরও সুন্দর হইয়াছে। আগে শুধুই সুন্দর ছিল, এখন সৌন্দর্যের সহিত নবোমেষিত ব্যক্তিত্ব মিশিয়া তাহাকে একটি দুর্লভ মহিমা দান করিয়াছে। চোখে চোখ পড়িলে

লজ্জিত হইবে জানিয়াও কাজল মুগ্ধচোখে অপালাকে দেখিতেছিল।

বাতাসে জানালার বাহিরে গাছের পাতায় মর্মরশব্দ উঠিল। অপালা জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

—এটা কী গাছ, টগর না?

কাজল বলিল—হ্যাঁ। খুব ফুল ফোটে, জ্যোৎস্নারাত্তিরে ঘরের আলো নিভিয়ে গাছটার দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে ভারি ভালো লাগে।

—আপনার লেখার খবর শোনান, নতুন কিছু লিখছেন না?

www.bengaliebook.com

নিজের লেখা সম্বন্ধে কাজল সাধারণত কাহারও সঙ্গে আলোচনা করে না। কিন্তু অপালার সামনে তাহার সমস্ত সংকোচ কাটিয়া গেল, বলিল—একটা উপন্যাস লিখছি। সবে ধরেছি, শেষ হতে দেরি আছে—

অপালা আগ্রহের সহিত বলিল—কী নিয়ে লিখছেন? বলবেন গল্পটা?

—গল্পটা বলা কঠিন, কারণ সেই অর্থে এতে কোন নাটকীয়তা নেই। একজন ছেলের একটু একটু করে বড়ো হয়ে ওঠার গল্প। কেউ ছাপবে কিনা, ছাপলেও পাঠকরা পড়বে কিনা তা জানি না। তবে তুমি দেখতে পারো ইচ্ছে করলে-

পাণ্ডুলিপিটি আনিয়া অপালার হাতে দিতে সে গভীর মনোযোগের সহিত পড়িতে শুরু করিল। কাজল হাসিয়া বলিল-চল্লিশ-পঞ্চাশ পাতা লেখা হয়েছে, সবটাই এখন বসে পড়বে নাকি? কথা বলবে না?

অপালার মুখে বিভিন্ন আবেগ স্পষ্ট হইয়া ফোটে। সে সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের সঙ্গে বলিল—আমি এর আগে কখনও কোন লেখকের পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে দেখিনি, জানেন? এই প্রথম। তাও আবার অপ্রকাশিত রচনা, কেউ দেখার আগেই আমি পড়ছি! অদ্ভুত লাগছে। এই দেখুন, আমার গায়ে কাঁটা দিয়েছে—

-তোমার চেয়ে আমার অদ্ভুত লাগছে বেশি। আমি এখনও একটা লেখকই নই, গুটি চারপাঁচ গল্প এখানে-ওখানে ছাপা হয়েছে মাত্র, আমার লেখা কেউ আগ্রহ করে পড়ছে, এটা আমার কাছে একটা নতুনত্ব। তুমি বোসো, আমি আসছি একটু।

হৈমন্তীর সবে ঘুম ভাঙিয়াছে। কাজল আসিয়া খাটের ধারে বসিয়া বলিল—মুখে-চোখে জল দিয়ে একবার আমার ঘরে চলো মা, একটি মেয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে

www.bengaliebook.com

অবাক হইয়া হৈমন্তী বলিল–মেয়ে? কে এসেছে রে?

-তুমি চিনবে না মা। আমার এক বন্ধুর বোন–

এরপরে যে দুই-তিনটি প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই আসিয়া পড়ে সেগুলি হৈমন্তী চাপিয়া গেল। কাজল নিজেই যেন কিছুটা কৈফিয়তের সুরে বলিল–একবার পিকনিক করতে গিয়ে আলাপ হয়েছিল। বাংলাদেশে থাকেনা মা-বাইরে মানুষ হয়েছে বলে একা একা চলাফেরা অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। বাবার লেখার খুব ভক্ত, তাই আর কি

হৈমন্তী বলিল–এসেছে সে তত ভালোই। তুই গল্প কর গিয়ে, আমি কাপড়টা বদলে আসছি–

ঘরে ফিরিয়া কাজল দেখিল জানালার ধারে হাতলওয়ালা চেয়ারটা টানিয়া বসিয়া অপালা একমনে তাহার লেখা পড়িতেছে। তাহাকে দেখিয়া মুখ তুলিয়া একবার হাসিল, তারপর আবার পড়িতে লাগিল।

মায়ের আসিতে অন্তুত মিনিট দশ-পনেরো দেরি আছে। কাজল একটা সিগারেট ধরাইয়া সামনের সরু বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। এখান হইতে অপালাকে স্পষ্ট দেখা যায়। টগর গাছের পাতায় বৈকালী রৌদ্র পড়িয়াছে, পাঠিকার মুখে তাহার আভা। এক-একটা এমন চমৎকার বিকালও আসে জীবনে!

হৈমন্তীর সহিত অপালা অনেক গল্প করিল। কলেজে পড়া মেয়ে, যে একা একা ট্রেনে চড়িয়া পরিচিত মানুষের বাড়ি বেড়াইতে আসিতে পারে, তাহার সম্বন্ধে হৈমন্তী একধরনের মিশ্র মনোভাব লইয়া কাজলের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাকে দেখিয়াই অপালা যেভাবে পায়ে হাত দিয়া

প্রণাম করিল এবং পরে তাহার একখানা হাত নিজের কোলে লইয়া পাশে বসিয়া কথা বলিতে লাগিল, তাহাতে শিক্ষিতা এবং স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে এমন মেয়েদের সম্বন্ধে হৈমন্তীর ধারনা আমূল বদলাইয়া গেল। বিশেষ করিয়া অপালা যখন অপুর রচনা হইতে পংক্তির পর পংক্তি মুখস্ত বলিয়া যাইতে লাগিল, তখন হৈমন্তী মুগ্ধ বিস্ময়ে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ গল্প করিবার পর হৈমন্তী বলিল–ঐ যাঃ, কথা বলতে বলতে তোমাকে কিছু খেতে দেবার কথা মনেই নেই। দাঁড়াও, তোমাকে কখানা লুচি ভেজে দিই–

অপালা সংকুচিত হইয়া বলিল–কিছু দরকার নেই মা, আমার ফিরতেও দেরি হয়ে যাবে–

কাজল বলিল–এমন কিছু দেরি হবে না। সন্ধের আগেই তোমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবোখন। সাড়ে ছটার মধ্যে শেয়ালদায় পৌছে যাবে।

অপালা সেই বিরল মেয়েদের মধ্যে একজন, যাহাদের কোন বিষয়ে রাজি করাইতে দীর্ঘসময় ধরিয়া অনুরোধ করিতে হয় না। সে বলিল–ঠিক আছে, আমার সাতটায় পৌঁছলেও চলবে। তাছাড়া খিদেও পেয়েছে সত্যি। চলুন মা, রান্নাঘরে বসে আপনার সঙ্গে গল্প করি

কিছুক্ষণ বাদে কাজল দেখিল রান্নাঘরের চৌকাঠের উপর বসিয়া অপালা গভীর মনোযোগের সহিত লুচি বেলিয়া দিতেছে, তাহার মা তোলা উনুনে ছোট অ্যালুমিনিয়ামের কড়াইতে আলুর চচ্চড়ি রাঁধিতেছে। সমগ্র দৃশ্যটায় বেশ একটা তৃপ্তিদায়ক সংসার-সংসার গন্ধ।

স্টেশনে যাইবার পথে অপালা বলিল–সেই কোন্ ছোটবেলার পর আর বাংলাদেশে পুজো দেখিনি। এবার আমার জন্যই বাবা এলেন। বাইরে বাইরে থাকলে কী হবে, বাবা মনেপ্রাণে একজন খাঁটি বাঙালি। আপনি পুজোয় কী করছেন?

-কিছুই না। শুয়ে শুয়ে কুঁড়েমি করবো আর বই পড়বো–

–এক কাজ করুন না, আপনি আমাদের কাছে একটা দিন কাটান।

–তোমাদের কাছে? কোথায়?

অপালা বলিল–বুগলির নারায়ণশিলা গ্রামে বাবার মামাবাড়ি। পুজোর চারদিন আমরা সেইখানে থাকব। তাঁদের বনেদি পরিবার, প্রায় দুশো বছরের পুরোনো দুর্গাপূজা হয় বাড়িতে। আপনি অষ্টমী কি নবমীর দিন আসুন না, ঠিকানা বলে দিচ্ছি-খুব ভালো লাগবে।

কাজল বলিল–শুনে তো যেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু সেখানে কেউ আমাকে চেনে না-

–সে চিন্তা করবেন না। তারা তোক খুব ভালো, চট করে এমন আপন করে নেবেন যে আপনার মনেই হবে না আপনি নতুন লোক। তাছাড়া-

অপালা চুপ করিয়া গেল। কাজল বলিল–তাছাড়া কী?

অপালা তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল-তাছাড়া আমি তো আপনাকে চিনি। আমি আপনার সঙ্গে থাকবো।

www.bengaliebook.com

বাড়ি ফিরিবার পথে চৌমাথার মোড়ের দোকান হইতে কাজল এক প্যাকেট সিগারেট কিনিল। পথে আজ কী কারণে যেন লোজন কম। বাতাসে কিসের নেশা, প্রতিদিনকার সাধারণ দৃশ্যই চোখে অপূর্ব ঠেকিতেছে। অনেক কিছু যেন বলিবার আছে, এখুনি কাছাকাছি কোন বন্ধুকে পাইলে তাহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলা চলিত। কিন্তু কী যে বলিত কাজল তাহা অনেক ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিল না।

একটা সিগারেট ধরাইয়া কাজল হাঁটতে শুরু করিবে, পিছন হইতে দোকানী ডাকিল-বাবু, খুচরা পয়সা তো লেকে যাইয়ে

-ওঃ, হা-পয়সা ফেরত লইতে হইবে বটে।

নদীর ধারে সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়াছে। বাড়ি যাইতে গিয়া কাজল কেন যে এখানে আসিল তাহা সে নিজেই জানে না। বৈকালী বায়ুসেবনকারীর দল বেশ কিছুক্ষণ হইল চলিয়া গিয়াছে। আরছা অন্ধকারে বাবলাগাছের সারি বিভিন্ন ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া আছে। নদীর ওপারে পশ্চিম দিগন্তে সন্ধ্যাতারার অগ্নিময় ইশারা। পাড়ের কাছে ছলাৎ ছলাৎ করিয়া ঢেউ আসিয়া লাগিতেছে। কাজল বেশ বুঝিতে পারিল জীবন বদলাইয়া যাইতেছে, নতুন দিকে বাঁক নিতেছে। এতদিন যেমন চলিতেছিল তেমন আর চলিবে না। তাহার পছন্দ-অপছন্দ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস আর এতদিন যাপন কৰা একক জীবনের বিভিন্ন ছোট-বড় ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া একটা বিশেষ ধরনের পরিবর্তনের সুর জাগিয়া উঠিতেছে। নদীর জলের শব্দে, এই সান্ধ্য নির্জনতায় আর পশ্চিমাকাশের নক্ষত্রের দীপ্তিতে যেন আসন্ন সেই পরিবর্তনের সুস্পষ্ট সংকেত।

রাত্রে খাইবার সময়ে হৈমন্তী বলিল–অপালার কথা শুনে মনে হল তোর সঙ্গে ওর অনেকদিনের যোগাযোগ। অথচ তুই বললি এই নাকি তোদের দ্বিতীয়বার দেখা। ব্যাপারটা কী?

কাজল আমতা আমতা করিয়া বলিল-না, মানে-মাঝে-মধ্যে চিঠিপত্র দিত আর কি

-তুই দিতিস না?

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর কাজল বলিল—দিতাম।

হৈমন্তী বলিল—আমি একটা কথা বুঝতে পেরেছি। মেয়েটা তোকে পছন্দ করে। তোর কথা আমি জানিনে—এসব নিয়ে খেলা নয়, ভালো করে নিজের মন বুঝে দেখতেমন বুঝলে সময় থাকতে সরে আসা ভালো। নইলে তোর চেয়ে মেয়েটা কষ্ট পাবে বেশি। সবদিক বিচার করে দেখার আগে বেশি ঘনিষ্ঠতা করে ফেলিস না।

জীবনে এই প্রথম মা তাহার সহিত বড়োদের মতো সমানে সমানে কথা বলিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

নারায়ণশিলা গ্রামটি বনেজঙ্গলে পূর্ণ। মাত্র ত্রিশ মাইল দূরের কলিকাতা শহরে যে বিংশ শতাব্দী তাহার আধুনিক ভাবনাচিন্তা এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার লইয়া মহাপ্রতাপে রাজত্ব করিতেছে, এ গ্রামের গভীর বাঁশবন, ছায়াচ্ছন্ন আম-কাঠালের বাগান আর অধিবাসীদের নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রা দেখিয়া তাহা আন্দাজ করিবার কোন উপায় নাই। নিকটবর্তী রেলওয়ে স্টেশন হইতেও গ্রামটি মাইল চারেক দূর। অপালা গরু বা ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা রাখিতে চাহিয়াছিল, কাজল হাসিয়া বলিয়াছিল–আমি গ্রামেরই ছেলে, চার মাইল হাঁটার ভয়ে কাবু হই না। তাছাড়া ধরো যদি কোনও কারণে না যেতে পারি, তাহলে আমোক অতদূর এসে গাড়ি ফিরে যাবে। কিছু দরকার নেই–

ছোট সুটকেসটা হাতে লইয়া ধুলায় ভরা পথে হাঁটিতে হাঁটিতে কাজল ভাবিল-কীটস কী সত্যি কথাই লিখে গিয়েছেন। শহরের সেই ধোঁয়া আর ময়লা, গাড়িঘোড়ার আওয়াজ-আই হ্যাভ ল বীন ইন এ সিটি পেন্ট! এমন সবুজ গাছপালা না দেখলে মানুষ বাঁচে?

পথটা এক জায়গায় আসিয়া দু-ভাগ হইয়া গিয়াছে। এখানে একবার জিজ্ঞাসা না করিয়া লইলে পথ ভুল হইবার খুবই সম্ভাবনা। কিন্তু জায়গাটা সেইমুহূর্তে একেবারেই জনমানবশূন্য। কাজল সুটকেসটা নামাইয়া সিগারেট ধরাইল, এখানে একটু বিশ্রাম করিয়া লওয়া যাইতে পারে। পৌঁছাইবার এমন কিছু তাড়া নাই। শহরে সকাল হইতেই কর্মব্যস্ততা শুরু হইয়া যায়। সব কাজেরই পৃথিবীতে প্রয়োজন আছে কিনা কে জানে, কিন্তু দুনিয়াসুদ্ধ লোক সারাদিন খাঁটিয়া খুন হয়। এমন কি ছুটির দিনেও প্রকৃত বিশ্রাম পাওয়া কঠিন। সবাই যত কাজ জমাইয়া রাখে আর ছুটির দিনে তাহার কাছে আসিয়া হাজির হয়। এইরকম বাহির হইয়া পড়িলে তবে ইচ্ছামতো কিছু করিবার সুযোগ মেলে।

রাস্তার ধারেই মাদারগাছের ডালে কিকি করিয়া শালিক ডাকিতেছে। ঝিরঝিরে বাতাসে মুক্তির স্বাদ। বর্ষার জলে সতেজ হইয়া গাছপালা গভীর সবুজ সাজ পরিয়াছে। পৃথিবীর অনেক স্থানে ব্যবসায়িক লাভের জন্য এমন সুন্দর অরণ্যশোভা কাটিয়া নষ্ট করিতেছে ভাবিলেও মনের মধ্যে কেমন করে! তেমন ঝাকালো একখানা গাছ বড় হইতে লাগে পঞ্চাশ-ষাট কী একশো বছর। আর কাটিতে বড়জোর একদিন। বিলাত-আমেরিকায় বৈদ্যুতিক করাত দিয়া আধঘণ্টায় পনেরো ফুট বেড়ের গাছ কাটিয়া ফেলিতেছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় জেনারেল শেরম্যান নামে নাকি একটি বিশাল রেডউড গাছ আছে, তাহার বয়েস প্রায় চার-পাঁচ হাজার বছর। ভাবিলে অবাক লাগে, ওই গাছটি যখন একশো-দেড়শো বছরের তরুণ, তখন মানুষ সবে কিছুকাল গুহা হইতে বাহির হইয়া সভ্যতা গড়িতেছে—মেসোপটেমিয়ায় বর্ণলিপির অভ্যুদয় ঘটিতেছে, মিশরে ফারাও খুফুর পিরামিড তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। মানবসভ্যতার সেই অস্পষ্ট ঊষাকালের সাক্ষী পাঁচহাজার বৎসরেব ওই রেডউড গাছ। কিন্তু হইলে কী হইবে, কাঠের লোভে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য ব্যবসায়ীর দল উহা কাটিল বলিয়া। আধুনিক যুগ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তিই সত্য, সাধে কী আর লোকে তাহাকে ঋষি বলে! কমলাকান্ত আফিংয়ের ঘোরে যাহা বলিতেছে, তাহা বঙ্কিমেরই হৃদয়ের কথা। কমলাকান্তের জিজ্ঞাসা—এই যে মানুষ এত টাকা করিতেছে, রেলগাড়ি বানাইতেছে, টেলিগ্রাফের কল বানাইতেছে, মানুষে মানুষে প্রণয়ের একটা কল অবিষ্কার করা যায় না? নহিলে আর সব কলই যে বেকল হইয়া যাইবে।

আজও হয় নাই। কে জানে কোনোদিন হইবে কিনা।

কাজলের সিগারেট শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে দূরে পথে উপব একজন লোক দেখা দিল। লোকটা স্টেশনের দিক হইতেই আসিতেছে। কাছে আসিতে বোঝা গেল মানুষটি পুববাহিত শ্রেণির। তাহার পরনে হাঁটু পর্যন্ত ধুতি, গায়ে

www.bengaliebook.com

নামাবলী, ছোট ছোট কবিযা চুল ছাঁটা। কপালে এবং নাকে চন্দনের ছাপ। খালি পা, হাতে একখানি পিতালের সাজি—তাহাতে পূজার কিছু উপকরণ। সে হনহন করিয়া হাঁটিায় আসিল এবং কাজলের সামনে দাঁড়াইয়া পড়িয়া অমায়িকভাবে একগাল হাসিল।

কাজল তাহাকে আদৌ চেনে না, কাজেই এ ঘনিষ্ঠ হাসির মর্মোদ্ধার করিতে না পারিয়া সে কী বলিবে ভাবিতেছে, এমন সময় লোকটিই তাহাকে প্রশ্ন করিল—বাবু কী কোথাও যাবেন? এখানে দাঁড়িয়ে আছেন যে?

কাজল তাহার গন্তব্যের কথা বলায় সে বলিল—খুব চিনি, আপনি আমার সঙ্গে চলুন। আমিও তো সেখানেই যাচ্ছি। আপনার বুঝি সেখানে নেমন্তন্ন?

লোকটির বয়েস বেশি নয়, কাজলেরই সমান হইবে। বাকি পথটা সে আপনমনে গল্প করিতে করিতে চলিল। তাহার কথাবার্তা শুনিয়া মনে হয় সে পুরাপুরি পাগল না হইলেও কিছুটা ছিটগ্রস্ত বটেই।

কাজল বলিল—আপনি কী এই গ্রামেই থাকেন?

উত্তরে লোকটি জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কী ব্রাহ্মণ?

কাজল বলিল—হাঁ। কেন বলুন তো?

-তাহলে আমাকে আপনি বলবেন না। বয়েসে আমি আপনার চেয়ে কিঞ্চিৎ ছোটই হব—

বলিয়া সে নিচু হইয়া খ করিয়া কাজলের পায়ের ধুলা নিতে গেল। কাজল ব্যস্ত হইয়া বলিল—আরে না না, থাক। আচ্ছা তুমিই বলবো এখন-

পথ চলিতে চলিতে লোকটি বলিল—আমার নাম নন্দলাল-নন্দলাল চক্রবর্তী। থাকি এখান থেকে চারক্রোশ দূরে নাটাবেড় গ্রামে। সকালবেলা উঠে পুজোআচ্চা সেরে এতটা পথ হেঁটে আসতে বেলা হয়ে গেল। আসবার সময় আবার মহেন্দ্র বিশ্বাসের আড়তে গণেশের নিত্যপুজাটা করে আসতে হল কিনা—ওরা মাসে তিন টাকা করে দেয়, আর এই পুজোর আগে একখানা কাপড়। এই দেখুন না, তাদের দেওয়া কাপড়ই তো পরে রয়েছি। কেমন, ভালো না?

কাজল বলিল—হাঁ, বেশ সুন্দর।

-হবে না কেন বলুন! বিরাট বড়োলোক তাঁরা, বাবার আমল থেকে আমাদের যজমান। বাবা বাতের ব্যথায় চলাফেরা করতে পারে না, তাই এখন আমিই পুজো সারি। তবে বড়োলোক হলেই হয় না, দেবার মনও থাকা চাই। লালু মুখুজ্জের বাড়ি গত তিনবছর ধরে প্রতি পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণ পুজো কবছি-তা ববাবর সেই একসিকি দক্ষিণা আর দেড়সের চাল! এবার কত বললাম আমার পুজো করার কাপড় ছিঁড়ে গিয়েছে, একখানা কিনে দাও। শেষ অবধি কী দিলো, জানেন?

-কী?

-একখানা গামছা। তাও আবার কেমন, ষষ্ঠীর দিন সেইটে পরে চান করেছি—তারপর দেখি রঙ উঠে কোমরের নিচে থেকে হাঁটু অবধি একদম সবুজ। বুঝুন কাণ্ড!

কাজল বলিল—তোমারও বুঝি পুজোবাড়িতে নেমন্তন্ন?

www.bengaliebook.com

নন্দলাল সহজভাবেই বলিল—না, আমায় কী আর আলাদা করে চেনে যে নেমন্তন্ন করবে? পুজোয় ভালো খাওয়ায় শুনে গতবছরও এসে খেয়ে গিয়েছিলাম। ব্রাহ্মণের এতে কোন অপমান নেই, বলুন! আমাদের পেশাই হল ভিক্ষা। ওই যে, পুজোবাড়ি দেখা দিয়েছে

রাস্তা হইতে একটু ভিতরে ঘন সবুজ গাছপালার ছায়ায় বাড়িটা। জায়গায় জায়গায় পলেস্তাবা খসিয়া সেকেলে পাতলা ইট দেখা যাইতেছে। ঢুকিবার দরজার দুই পাশে পূর্ণঘট এবং কলাগাছ বসানো। দরজা পার হইলেই বিশাল বাঁধানো উঠান, উঠানের প্রান্তে ঠাকুরদালান। সেখানে ডাকের সাজ দেওযা দেবীপ্রতিমার সামনে কয়েকটি বালক-বালিকা বসিয়া কলরব করিতেছে। লালপাড় গরদের শাড়ি পরা ফরসা একজন প্রৌঢ়া মহিলা হাতে একটি তামার পাত্র লইয়া কী কাজে ঠাকুরদালানে আসিতেছিলেন, কাজলকে দেখিয়া তিনি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেনতুমি কে বাবা? কাউকে খুঁজছো?

কাজল উত্তর দিবার আগেই কোথা হইতে অপালা আসিয়া হাজির হইল।

-ওমা! সত্যি এসেছেন তাহলে আসুন, বাড়ির ভেতরে আসুন-পথ চিনতে অসুবিধে হয়নি তো?

নন্দলালের বোধহয় আরও গল্প করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কাজল বাড়ির ভিতর চলিয়া যাওয়ায় সে ঠাকুরদালানের একদিকে দুপুরবেলা খাওয়ার ডাক পড়িবার আশায় বিমর্ষমুখে একা বসিয়া রহিল।

অপালার দাদু-দিদিমা মানুষ ভালো, তাঁহারা কিছুক্ষণের মধ্যেই কাজলকে একান্ত আপন করিয়া লইলেন এবং অপালার সহিত তাহার সম্পর্ক লইয়া নানাবিধ ইঙ্গিতপূর্ণ রসিকতা করিয়া আসর জমাইয়া তুলিলেন। অপালার বাবা স্বল্পবাক মানুষ কিন্তু তাহার সংযত ব্যক্তিত্বের মধ্য হইতে একটা সহৃদয়তার

www.bengaliebook.com

প্রভাব ফুটিয়া বাহির হয়। তিনি অপুর বইয়ের পরম ভক্ত, অপুর ছেলেকে দেখিয়া প্রকৃতই খুশি হইলেন।

দুপুর ঠাকুরদালানের ডানধারে লম্বা বারান্দায় চাটাইয়ের আসন পাতিয়া খাইবার জায়গা হইল। এক সঙ্গে প্রায় পঞ্চাশজন লোক দুই সারিতে বসিয়া খাইতেছে। কাজলের মুখোমুখি নন্দলাল বসিয়াছে, চোখে চোখ পড়িতে সে খুশির হাসি হাসিল। খাইবার পদের বিশেষ বাহুল্য নাই। নিজেদের চাষের ঈষৎ মোটা চালের ভাত, কুমড়োভাজা, ডাল, দুইরকম তরকারি, চাটনি ও পায়েস। কাজলের পাতে চাটনি পড়িবার সময় সে তাকাইয়া দেখিল নন্দলাল তৃতীয়বার ডাল চাহিয়া লইয়া ভাত মাখিতেছে।

খাইবার পর অপালা সমস্ত বাড়িটা ঘুরিয়া দেখাইল। বলিল—এটা কিন্তু নতুন বাড়ি, দাদুদের আদি বাড়ি ওইদিকে, আসুন দেখাই

আম-জাম-কাঁঠাল গাছের সারি পার হইয়া একটা বহু পুরাতন পাকাবাড়ির ধ্বংসস্তূপ আগাছার জঙ্গলের মধ্যে পড়িয়া আছে। ছাদ ভাঙিয়া পড়িয়াছে অনেকদিন, ইট বাহির হওয়া দেওয়ালগুলি কোনমতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। খসিয়া পড়া কড়ি-বরগা এমনভাবে ছড়াইয়া আছে যে, তাহা পার হইয়া ভিতরে যাওয়া অসম্ভব।

অপালা বলিল—প্রায় একশো বছর ওই বাড়ি এমনি পড়ে রয়েছে, দাদুর ঠাকুরদার আমলের বাড়ি। তখন আমরা এই অঞ্চলের জমিদার ছিলাম, জানেন?

অপালা তাহার বংশের পূর্ববৃত্তান্ত বলিতেছিল। শুনিতে শুনিতে কাজল অন্যমনস্ক হইয়া গেল। বিশাল বাড়ির ভগ্নস্তূপটা তাহাকে কেমন যেন মুগ্ধ করিয়াছে। কেমন ছিল একশত বৎসর আগের সেই মানুষগুলি? যাহারা এই

www.bengaliebook.com

বাড়িতে বাস করিত, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করিত? তাহাদের কাছে একান্ত বাস্তব সেই বর্তমান আজ এক শতাব্দী পিছাইয়া পড়িয়াছে-যেমন সে নিজে একদিন অতীত ইতিহাসে পর্যবসিত হইবে।

সান্ধ্য-আরতি ও ভোগের আয়োজনে সাহায্য করিতে অপালা বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল। দুই-একজন ছাড়া কাজল এ বাড়ির অন্যদের এখনও ভালো করিয়া চেনে না, অচেনা মানুষের ভিড়ের মধ্যে ঢুকিবার ইচ্ছা না করায় সে আমবাগানের ওপাশে দীঘির বাঁধানো ঘাটের উপর আসিয়া বসিল। একেবারে উপরের ধাপে বসিবার জন্য দুই দিকে বেদি করা আছে, তাহারই একটিতে নন্দলাল চক্রবর্তী অঘোরে ঘুমাইতেছে। দীঘির জলে প্রাচীন গাছেদের শান্ত ছায়া। অপরাহ্ণ গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, গাছের ডালে ডালে বাসায় ফিরিয়া আসা পাখিদের কলরব। এই শান্তির আবাস ছাড়িয়া লোভী মানুষ শহরে চলিয়া গিয়াছে। ভুল বুঝিয়া যখন ফিরিবে, এই পরিবেশ আর থাকিবে কি?

নন্দলাল ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া বসিল, আড়ামোড়া ভাঙিয়া চারদিকে তাকাইয়া বলিল—যাঃ, বেলা গিয়েছে দেখছি।

কাজল বলিল-ভালো ঘুম হল? তোমার বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যাবে-

- আজ আর ফিরবো না ভাবছি। শুনলাম ঠাকুরবাড়ি রাত্তিরে লুচি-ভোগ হবে। জনাই থেকে মণ্ডা এনেছে, তাও দেবে। আমরা গাঁয়ের মানুষ, এসব তো বড়ো একটা খেতে পাই না-আমাদের এদিকে পুজোর প্রসাদ বলতে দুটো আখের টিকলি, একমুঠো কুচোনো ফলমূল আর কয়েকটা পিপড়েধরা ফোপরা বাতাসা। থেকে যাই রাতটা-

কাজল জিজ্ঞাসা করিল—না ফিরলে বাড়ির লোক ভাববে না? বলে এসেছো?

–কে ভাববে বলুন! আমার মা নেই, ছোটবেলাতেই মরে গিয়েছে। বাবা একজন সেবাদাসী রেখেছে–সে আমাকে দুচক্ষে দেখতে পারে না। ভাববে কে?

কাজল অবাক হইয়া বলিল–সেবাদাসী মানে?

নন্দলাল নির্বোধের মতো হাসিয়া বলিল–মানে যা, তাই। বিয়ে করা বউ নয়, তবু বারো বছর আমাদের সংসারে রয়েছে। নিজের বাবার কথা নিজে বলতে লজ্জা করে। এখন বাবার শরীর খারাপ হয়ে গিয়েছে, সংসারের সবকিছু সেই সেবাদাসীর হাতের মুঠোয়। আমি ফিরলাম কী ফিরলাম না কেউ খোঁজও করবে না হয়তো–

পুকুরের জলের দিকে তাকাইয়া কিছুক্ষণ নন্দলাল কী ভাবিল, তারপর কাজলকে জিজ্ঞাসা করিল–আপনি কখনও জনাইয়ের মণ্ডা খেয়েছেন?

কাজল হাসিয়া বলিল–কী জানি, মনে পড়ছে না–

–তাহলে খাননি। ও জিনিস খেলে মনে থাকত। ওপরে পাতলা চিনির রসের পলেস্তারা থাকে, তার ভেতরে নরম সন্দেশ। নাম হচ্ছে-কী যেন বলে-মনোহরা। চৌধুরীদের ছোট মেয়ের বিয়েতে খাইয়েছিল। ওই একবারই খেয়েছি। তা আজ যখন শুনলাম–পুরুতমশাইও দালানের একদিকে থাকতে দিতে রাজি হয়েছেন–থেকেই যাই

মুখ-হাত ধুইবার জন্য নন্দলাল ঘাটের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। সেদিকে তাকাইয়া এই সুখাদ্যলোলুপ দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তানটির জন্য কাজলের মায়া হইল। একবার ইহাকে তাহাদের বাড়ি নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলে হয় না?

www.bengaliebook.com

সন্ধ্যাবেলা আরতির পর কাজল আবার দীঘির ঘাটে গিয়া বসিল। বাঁধানো ঘাটে নবমীর জ্যোৎস্না পড়িয়াছে। ওপারের নারকেল গাছের পাতায় চাঁদের আলো পড়িয়া চিকচিক করিতেছে। খানিকক্ষণ এমন জায়গায় বসিলেই মনের সব ঢেউ শান্ত হইয়া আসে। সুটকেস হইতে খাতা আর কলমটা লইয়া আসিলে চাদের আলোয় কবিতা লেখা যাইত।

হঠাৎ ছোট্ট হাসির শব্দে চমকাইয়া কাজল দেখিল কখন ঘাটের উপর অপালা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

—আমি ঠিক ভেবেছি আপনি এইখানে এসে বসে আছেন।

কাজল বলিল-শহরে থাকি তো, এমন জ্যোৎস্না, পুকুরঘাট, এমন নির্জনতা—এ সবই আমার কাছে নতুন। বেশ লাগছিল বসে থাকতে।

অপালা বলিল—আমার কাছেও। বাংলার গ্রাম তেমন করে দেখিই নি। লোকে পয়সা খরচ করে দূর দেশে বেড়াতে যায় কেন বলুন তো? যা আমি আগে কখনও দেখিনি, তাই তো আমার কাছে রহস্যময় নতুন দেশ, না?

কাজল অপালার সহিত একমত হইল।

বাড়ি হইতে দূরে পুকুরঘাটে রাত্রিবেলা অবিবাহিতা কোন মেয়ের অনাত্মীয় যুবকের সহিত এভাবে বসিয়া গল্প করাটা সমীচীন নয়, বাঙালি সমাজে মানুষ না হওয়ায় অপালা তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। কিন্তু তাহার নিষ্পাপ সারল্যে আঘাত করিতে কাজলের বাধিল। সে বলিল—একটু একটু হিম পড়তে শুরু করেছে, না? চলো বরং বাড়ির ভেতরে গিয়ে বসি—

অপালা প্রখর বুদ্ধিমতী, কিন্তু জীবনের ব্যবহারিক দিকগুলিতে তাহার কোনো অভিজ্ঞতাই নাই। সে কাজলের ইঙ্গিত বুঝিতেই পারিল না, বলিল—আপনি

ভারী শীতকাতুরে তো! কোথায় হিম? আমার মতো ছোটবেলা থেকে হিমালয়ের কাছাকাছি থাকলে বুঝতেন শীত কাকে বলে! বসুন না আর একটু, গল্প করি-

বাধ্য হইয়া কাজল বসিল। সামাজিকতার হানি ঘটে বলিয়া মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি থাকিলেও অপালার মতো মেয়ের সহিত জ্যোৎস্নায় একান্তে বসিয়া কথা বলিবার নেশা আছে। দুইজনে অনেক গল্প করিল। বেশির ভাগ গল্পেরই তেমন কোন প্রাসঙ্গিকতা নাই। কিন্তু প্রথম যৌবন, শরতের আশ্চর্য জ্যোৎস্না সামনে বিস্তৃত, পথের সবটা দেখা যায় না কে জানে তাহার অদৃষ্টে বাঁকে বাঁকে কত রোমাঞ্চ ও শিহরণ অপেক্ষা করিয়া আছে—প্রাসঙ্গিকতার খোঁজ কে করে, তারুণ্যই আসল, তারুণ্যের আনন্দই মানুষকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখে।

চন্দ্রালোকিত এই রাত্রির কথা সে কোনোদিন ভোলে নাই।

পরের দিন বিদায় লইয়া চলিয়া আসিবার সময় নন্দলাল আবার সঙ্গী হইল। কিছুদূর হাঁটিবার পর নন্দলাল হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল। কাজল বলিল-কী হল? থামলে যে?

নন্দলাল ঘাড় চুলকাইয়া লজ্জিতমুখে বলিল—আপনি একটু এগিয়ে ওই পথের মোড় একটু বসুন, আমি এক্ষুনি আসছি-

কাজল প্রথমে বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেন, তুমি কোথায় যাচ্ছো?

—এইখানে পথের ধারে জল আছে, সুবিধে হবে। আপনি বসুন, আমি এক্ষুনি আসব।

রাস্তার পাশে নয়ানজুলিতে জল জমিয়া আছে বটে। সেদিকে তাকাইয়া কাজল ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল। গতরাত্রে অপরিমিত লুচি ও মণ্ডা খাইয়া নন্দ বেসামাল হইয়াছে। লোকটাকে ফেলিয়া আসা যায় না, তাহাকে কিছুক্ষণ বসিতেই হইল।

তাহার ট্রেন আসা পর্যন্ত নন্দলাল প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া রহিল। কাজল তাহাকে ঠিকানা দিয়া বলিল–সুযোগ করে একদিন আমার বাড়ি যেয়ো, আমার মা খুব ভালো রান্না করেন, তোমাকে পেট ভরে খাওয়াব–

নন্দলাল কৃতজ্ঞতার হাসি হাসিল।

বিজয়ার দিন সন্ধ্যাবেলা কাজল নদীর ধারে প্রতিমা বিসর্জন দেখিতে গেল। অন্যদিন এই সময়ে জায়গাটা নির্জন হইয়া আসে। আজ সেখানে বহু লোকের চেঁচামেচি। মানুষের কাঁধে করিয়া, লরি করিয়া ঠাকুর আসিতেছে। সব দলই সঙ্গে করিয়া পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠন আনিয়াছে, কেহ কেহ আবার মশাল জ্বালাইয়া হাতে লইয়াছে। কোন ঠাকুর ঘাটের ধাপে দাঁড়াইয়াই বিসর্জন হইল, কোন দল নৌকায় চাপাইয়া মাঝনদীতে প্রতিমা লইয়া চলিল, সেখানে বিসর্জন দেওয়া হইবে। ঘাটের উপর কোলাহলরত জনতার দিকে তাকাইয়া কাজলের বছর চারেক আগের এমনই একটি বিজয়ার দিনেব কথা মনে পড়িল।

সে তখন সবে বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হইয়াছে। আজকের মতোই একা ঘুরিতে ঘুরিতে নদীর ধারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ঠিক সেই সময়টা নদীর ধার নির্জন, কোন প্রতিমা নাই। কাজলের হঠাৎ নদীর জলে একটু হাত ডুবাইতে ইচ্ছা করিল। কোন বিশেষ কারণে নয়, প্রবহমান জল দেখিলেই মানুষের স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করে, তাই। আস্তে আস্তে সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া গিয়া সে ঠাণ্ডা জলে আঙুল দিয়া রেখা কাটিয়া খেলা করিতে লাগিল। ভেজা হাত লইয়া মুখে বুলাইয়া দিল। কিছুক্ষণ বসিবার পর হঠাৎ ঢাক-ঢোলের শব্দে উপরে

তাকাইয়া দেখে প্রতিমা লইয়া একটি বিসর্জনের দল আসিয়া হাজির হইয়াছে। সে সন্ত্রস্ত হইয়া একপাশে সরিয়া গেল। যাহারা বিসর্জন দিবে তাহারা দাঁড়াইয়া রহিল। সম্ভবত কাহাদের বাড়ির পূজার ঠাকুর, বাড়ির মহিলারাও সঙ্গে আসিয়াছেন। উপরে উঠিতে গিয়া কাজল থামিয়া গেল।

দলের মধ্যে একটি মেয়ে দাঁড়াইয়া বিসর্জন দেখিতেছে। বছর সতেরো-আঠারো বয়েস। পরনে লালপাড় সাদা শাড়ি। ঘনকুঞ্চিত লম্বা চুল কোমর ছাড়াইয়া নামিয়া আসিয়াছে। পাশেই কাহার হাতে মশাল জ্বলিতেছে, মেয়েটির মুখে সেই আলোর প্রভা। গোল মুখখানি, টানা-টানা দুই চোখ-মশালের আলো পড়িয়া যেন দুর্গাপ্রতিমার মুখে ঘামতেল চকচক করিতেছে।

দৃশ্যটা ভারি সুন্দর লাগিয়াছিল। কাহাদের মেয়ে কে জানে? হয়ো কবেই বিবাহ হইয়া গিয়াছে, কতদূরে চলিয়া গিয়াছে হয়তো বা। তবু চার বছর আগের ঘটনাটা সে ভুলিতে পারে নাই।

আজ আবার মনে আসিল।

বাড়ি ফিরিয়া মাকে বিজয়ার প্রণাম করিতেই হৈমন্তী বলিল—তুই এসে গিয়েছিল, ভালো হয়েছে। এত দেরি করলি কেন? একটা রিকশা ডেকে নিয়ে আয় দেখি, মার কাছে যাব

কাজল বলিল—আজ রাত্তিরে আর কেন মা? কাল সকালে বরং

-না রে, এখুনি একবার যেতেই হবে। তুই বাড়ি ছিলি না, প্রতাপ এসে খবর দিয়ে গেল মায়ের খুব শরীর খারাপ। আমি আজই একবার যাব।

দিদিমার শরীর খারাপ শুনিয়া কাজলের চিন্তা হইল। দাদু মারা যাইবার পর হইতেই দিদিমা কেমন একরকম যেন হইয়া পড়িয়াছেন। আগেই হৃদযন্ত্রের

www.bengaliebook.com

গোলমাল ছিল, আজকাল বিছানা ছাড়িয়া ওঠা দূরের কথা, নিজে পাশও ফিরিতে পারেন না। সেবা ও পরিচর্যার জন্য সবসময়ে কাহাকেও কাছে থাকিতে হয়। কাজল সপ্তাহে অন্তত দুইদিন গিয়া দিদিমাকে দেখি আসে।

মামাবাড়ির বারান্দায় পুরাতন চাকর ভূষণ বসিয়া আছে। তাহারা রিকশা হইতে নামিতেই সে মেজদি এসেছেন? বলিয়া হৈমন্তীকে প্রণাম করিল।

—ভালো আছো ভূষণ? মা কেমন আছে?

-খুব ভালো না। আজ একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে। যান, ভেতরে যান-

ঘরে ঢুকিয়া কাজল দেখিল দিদিমা চোখ বুঁজিয়া শুইয়া আছেন। দুই অবিবাহিত মাসি সীতা ও প্রভা পাশে বসিয়া হাওয়া করিতেছে ও কপালে জলপটি দিতেছে। হৈমন্তীকে দেখিয়া প্রভা মায়ের কানের কাছে মুখ লইয়া বলিল—মা, ও মা-মেজদি এসেছে

বার-দুই বলিবার পর দিদিমা একবার তাকাইয়া দেখিলেন। উদাসীন নিস্পৃহ দৃষ্টি। তারপব আবার চোখ বন্ধ করিয়া পড়িয়া রহিলেন।

হৈমন্তী খাটের এককোণে বসিয়া বলিল—কবে থেকে এমন হয়েছে?

প্রভা বলিল—আজই সকাল থেকে। নইলে তো তোকে আগেই খবর দিতাম। তাও এতটা বাড়াবাড়ি হবে বুঝতে পারিনি। সকালে বলছিলেন মাথায় ব্যথা কবছে, মাথা ঘুরছে। দুপুবেব পর থেকে দেখি আর বিশেষ কথাবার্তা বলছেন না—

—প্রতাপ কোথায়?

সীতা বলিল–দাদা হেমন্তবাবুকে খবর দিতে গিয়েছে–

হেমন্তবাবু আজ বহুদিন মামাবাড়ির পারিবারিক চিকিৎসক। হঠাৎ কোন ছোটোখাটো প্রয়োজনে পাড়াব সুরেশ ডাক্তারকে ডাকা হইলেও বিপদ ঘোরালো হইলে হেমন্তবাবুই ভবসা। বেঁটেখাটো কিন্তু বিপুলায়তন মানুষটি। পোশাকে নিখুত পবিচ্ছন্নতা আছে। সমস্ত ব্যক্তিত্বে সহৃদয় বহুদর্শিতার ছন্দ। হেমন্তবাবু সেই বিবল চিকিৎসকের একজন, যাঁহারা ঘরে ঢুকিলেই বোগী আশ্বাস পাইয়া বালিশে ভর দিয়া উঠিয়া বসে।

এই সময়েই প্রতাপ হন্তদন্ত হইয়া ফিবিয়া আসিল। সঙ্গে ডাক্তারবাবু আসিয়াছেন। ধপধপে সাদা শার্ট সাদা প্যান্টের নিচে খুঁজিয়া পরা, লোমশ মোটা হাতে গোল বড়ো ডায়ালেব ঘড়ি, চলাফেরায় একটা অ-ত্বরিত বিচক্ষণতা। তিনি ঘরে ঢুকিতেই সবাই দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল। হৈমন্তী জিজ্ঞাসা করিল-ভালো আছেন ডাক্তারবাবু?

হেমন্তবাবু হাসিয়া বলিলেন–ভাল আছি। আপনি ভালো তো?

হৈমন্তী ছাড়া এ বাড়ির সকলকে তিনি তুমি সম্বোধন করেন। অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও হৈমন্তীকে আপনি বলা ছাড়িতে পাবেন নাই। হেমন্তবাবু অপুর বইয়ের ভক্ত পাঠক। সম্ভবত অপুর প্রতি শ্রদ্ধাবশত তাহার স্ত্রীকে কন্যার বয়েসী হওয়া সত্ত্বেও সম্মান জানানো উচিত মনে করেন।

দিদিমাকে দেখিয়া ডাক্তারবাবু হাত ধুইবার জন্য বারান্দায় আসিলে কাজলও সঙ্গে আসিল। প্রতাপ জিজ্ঞাসা করিল-কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু?

সীতার কাছ হইতে তোয়ালে লইয়া হাত মুছিতে মুছিতে হেমন্তবাবু বলিলেন–বিশেষ ভালো নয়। এখুনি হয়তো কিছু হবে না, আমি ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি,

www.bengaliebook.com

আপাতত সামলে যাবেন এখন। কিন্তু হার্ট খুব উইক। তোমাদের মন প্রস্তুত করো

প্রতাপ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

-তাছাড়া কি হয়েছে জানো? তোমার বাবা মারা যাবার পর ওঁর বাঁচার ইচ্ছেটাই উনি হারিয়ে ফেলেছেন। সি উইল টু লিভ–এইটে খুব বড়ো কথা। শুধু ওষুধে রোগ সারে না, সঙ্গে ওটাও দরকার হয়। মাকে আর বেশিদিন রাখতে পারবে না

আজ দিদিমাকে দেখিয়া কাজলেরও সেই কথা মনে হইয়াছিল।

বাড়ি ফিরিবার সময় হৈমন্তী বলিল-মার যেমন অবস্থা দেখলাম–তুই একটু ঘন ঘন এসে খবর নিয়ে যাবি, কেমন?

কাজল সংক্ষেপে বলিল–যাবো।

জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মা গিয়াছে। শৈশবে বাবা। এখন দিদিমা চলিয়া গেলে পুরাতন দিনগুলির সহিত একটা সত্যকারের বিচ্ছেদ ঘটিয়া যাইবে।

কিন্তু ইহাই নিয়ম। ইহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ খাটে না।

স্কুলে পড়াইতে গিয়া কাজল একটা জিনিস লক্ষ করিল। বেশির ভাগ ছাত্রই ইংরেজিতে ভয়ানক কাঁচা। এ বিষয়ে কিছু ব্যবস্থা করিতে গেলে প্রথমেই রুটিনে ইংরেজির ক্লাস কিছু বাড়ানো প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে একদিন সে হেডমাস্টারের সঙ্গেও কথা বলিল। উত্তরে হেডমাস্টার বলিলেন, প্রতিবারের মতো এই বৎসরও সিনিয়র টিচাররা অনেক মাথা খাটাইয়া রুটিন তৈরি করিয়াছেন, নতুন ক্লাস দিবার মতো কোন ফাঁক তাহাতে নাই।

www.bengaliebook.com

কাজল বলিল—ওপরের ক্লাসগুলোয় হপ্তায় দু-তিনদিন এইটথ পিরিয ইনট্রোডিউস্ করে দেখলে হয় না স্যার?

হেডমাস্টার নিজের বিরলকেশ মস্তকে একবার হাত বুলাইয়া মৃদু হাসিলেন, তারপর বলিলেন—আমি অবশ্য এই স্কুলে কয়েকমাস হল এসেছি, শিক্ষক বা ছাত্রদের মানসিকতা সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা হয়তো উচিত নয়। কিন্তু তবু আমার অভিজ্ঞতা বলে, ওটা সর্বত্রই এক। আপনার এই প্রস্তাব শিক্ষকমহলে সমর্থিত হবে বলে আমি মনে করি না। এমনিতেই তারা মনে করেন তারা ওভারবার্ডেনড়—নিজেদের রুটিনের ক্লাস ছাড়াও অনুপস্থিত শিক্ষকদের ক্লাস ভাগ করে নিতে হচ্ছে। এর ওপরে আর ক্লাস বাড়ালেন অমিতাভবাবু, আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনার উদ্যোগ অ্যাপ্রিসিয়েট করছি, কিন্তু আপনার প্রস্তাব খুব প্রাকটিক্যাল নয়—

-স্যার, আমি যদি নাইন আর টেনের ছাত্রদের নিয়ে ছুটির পর স্পেশাল ক্লাস করি?

হেডমাস্টার আবার হাসিলেন। বলিলেন—ইনডমিটেবল ইয়ুথ, আঁ! তা চেষ্টা করে দেখতে পারেন। ছাত্রদের ভালোর জন্য কিছু করলে আমি তাতে বাধা দেব কেন? তবে আমার পরামর্শ এই—ও কাজ করতে যাবেন না। অফিসিয়াল রুটিনের ক্লাস না হলে অনেকেই স্পেশাল ক্লাসে থাকবে না, কিছু একটা অজুহাত দেখিয়ে পালিয়ে যাবে। আপনিও তাদের শাস্তি দিতে পারবেন না। কিছুদিন পর স্পেশাল ক্লাস আপনিই বন্ধ হয়ে যাবে। তাতে আপনার এবং স্কুলের সুনামের হানি হবে।

কাজল বিমর্ষ হইয়া ফিরিয়া আসিল।

www.bengaliebook.com

রুটিন বাড়ানো সম্ভব নয়। স্পেশাল ক্লাস নেওয়াও হেডমাস্টার সমীচীন মনে করেন না। কিন্তু কী করিলে ছাত্রদের উন্নতি হয় সে বিষয়ে তো আলোচনা হইল না? ছাত্রদের কৃা অবস্থা, কিছু বাড়তি পড়াশুনা না করিলে বার্ষিক পরীক্ষায় ইংরেজির ফল বিভীষিকাময় হইবে। ইংরেজির অপর দুইজন শিক বহুদিন ধরিয়া কাজ করিতেছেন। নতুন কিছু করিবার উৎসাহ অনেককাল হইল ফুরাইয়াছে। তাঁহারা নির্দিষ্ট ক্লাসগুলি সারিয়া টিচার্স রুমে আসিয়া নস্য লন এবং ভাগাভাগি করিয়া খবরের কাগজ পড়েন। ছাত্ররা চরিয়া খায়।

ভাবিয়া ভাবিয়া কাজল একটা উপায় বাহির করিল। ক্লাস লইতে গিয়া নাইন ও টেনের ছাত্রদের সে বলিল—আমি তোমাদের কিছু কিছু করে হোম-টাস্ক দেব। এর জন্য তোমরা একটা আলাদা খাতা করবে। কেবল ব্যাকরণ মুখস্থ করে ভালো ইংরেজি শেখা যায় না, বাড়িতে তোমরা সোজা ইংরেজিতে লেখা ছোট ছোট বই পড়বার চেষ্টা করবে। যারা উৎসাহী, তারা আমার বাড়িতে গেলে আমিও এ ধরনের বই দিতে পারব। ক্লাসেও আমি সহজ ইংরেজিতে মাঝে মাঝে গল্প বলব। তারপর তার থেকে প্রশ্ন লিখতে দেব। তোমরা বাড়িতে তার উত্তর লিখে ক্লাসে আমাকে এনে দেবে। আমি অবসর সময়ে কারেকট করে ফেরত দেব। দেখবে এতে তোমাদের উপকার হবে

কাজলের প্রস্তাবে ছাত্রদের মধ্যে খুব উৎসাহ দেখা গেল। সকলেই কিছু ফাঁকিবাজ ছাত্র নয়। অনেকেই সন্ধ্যাবেলা কাজলের বাড়ি গিয়া বই লইয়া আসিতে লাগিল। তাহার ক্লাসে টেবিলের উপর হোম-টাস্কের খাতার পাহাড় জমিয়া যায়। অফ পিরিয়ডে সে লাইব্রেরি ঘরে বসিয়া সেগুলি দেখে। পরের দিন টিফিনের সময় ছেলেরা ফেরত লইয়া যায়।

একদিন টিফিন পিরিয়ডে লাইব্রেরি ঘরে ছোকরা টিচারদের আড্ডা জমিয়া উঠিয়াছে। দপ্তরী কেশব ঘরের কোণে স্টোভ জ্বালিয়া চা বানাইয়া দুইটি বিস্কুটসহ সকলকে দিতেছে। মাঝে মাঝে দুএকজন ছাত্র আসিয়া কাজলের

www.bengaliebook.com

নিকট হইতে খাতা ফেরত লইয়া যাইতেছে। এমন সময় প্রৌঢ় ইতিহাসের শিক্ষক রামনাথবাবু দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ভিতরে উঁকি দিলেন। ছোকরারা একটু সন্ত্রস্ত হইয়া গুঞ্জন বন্ধ করিল, যাহারা ধুমপান করিতেছিল তাহারা সিগারেট লুকাইয়া ফেলিল। বিশ্বেশ্বর ভট্টচার্য বলিল–কিছু বলবেন নাকি রামনাথদা? আসুন ভেতরে আসুন

-না, তোমরা বসো। এ ঘরে টিফিনের সময় আজ কদিন ধরে ছাত্ররা খুব যাতায়াত করছে, তাই দেখতে এলাম কী ব্যাপার-

উত্তরে কেহ কিছু বলিল না। রামনাথবাবু আর একবার দৃষ্টিপাত করিয়া চলিয়া গেলেন।

পরদিন থার্ড পিরিয়ড অফ থাকায় কাজল বসিয়া ক্লাস নাইনে হোম-টাস্কের খাতা দেখিতেছে, রামনাথবাবু আবার আসিলেন।

-কী হে, অমিতাভ, কী করছো?

কাজল দাঁড়াইয়া বলিল–আসুন রামদা। এই একটু খাতা দেখছি আর কি-

-খাতা? কিসের খাতা? প্রাইভেট টিউশনির?

–আজ্ঞে না। উঁচু ক্লাসগুলোয় একটু স্পেশাল কোচিং দেবার চেষ্টা করি, যাতে রেজাল্টটা– এবার ইয়ারলি পরীক্ষার অবস্থা দেখেছেন তো?

রামনাথবাবু কোনো কথা না বলিয়া কিছুক্ষণ টেবিলের উপর স্তূপীকৃত খাতার দিকে তাকাইয়া থাকিলেন, তারপর বলিলেন-বাঃ, বেশ ভালো! নিজের সময় নষ্ট করে ছেলেদের উপকার এসব আজকাল আর দেখা যায় না–

www.bengaliebook.com

–না দাদা, আসলে নিজের চর্চাটাও থাকে, ছাত্রদেরও কাজ এগোয়–

–ভালোই তো। চালিয়ে যাও। একটা মহৎ দৃষ্টান্ত-

রামনাথবাবু চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু কাজলের আর কাজে মন বসিল না। পরপর দুইদিন ভদ্রলোকের আসাটা কেমন যেন সন্দেহজনক। এমনিতে সিনিয়র টিচাররা লাইব্রেরি ঘরে বড়ো একটা আসেন না। ব্যাপার কী?

ব্যাপার কয়েকদিন বাদেই পরিষ্কার হইয়া গেল।

ফিফথ পিরিয়ডে কাজল আর রমাপদ দুইজনেরই একসঙ্গে অফ পড়িয়াছে। কাজল খুসিডিডিস-এর পেলোপনেশিয়ান ওয়ার পড়িতেছিল, রমাপদ একটা সিগারেট ধরাইয়া উমুখে ধোয়া হাড়িয়া বলিল-বই রাখুন, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে। নিন একটা সিগারেট ধরান আগে

সিগারেট ধরাইয়া কাজল বলিল–কী কথা?

-রামনাথদা কাল দুপুরে এসেছিলেন এ ঘরে?

-হ্যাঁ, কেন বলো তো?

–আপনি তখন কী করছিলেন?

ছাত্রদের হোম-টাস্কের খাতা দেখছিলাম। কেন, কী হয়েছে তাতে?

রমাপদ ধোয়ার রিং করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে করিতে বলিল–হয়েছে অনেক কিছু। রামনাথদা সবাইকে বলে বেড়াচ্ছেন এটা প্রকৃতপক্ষে প্রাইভেট টিউশনি জোগাড় করার জন্য আপনার একটা কায়দা-

www.bengaliebook.com

কাজল স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার কোন সৎ প্রচেষ্টার যে এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে তাহা সে আদৌ ভাবে নাই। সে বলিল—কী বলছো তুমি? রামনাথদা এই কথা রটাচ্ছেন? প্রাইভেট টিউশনি আমি চেষ্টা করলে তো এখুনি দশটা নিতে পারি কত ছেলে আমার বাড়ি গিয়ে সাধাসাধি করে। কিন্তু আমার সময় কোথায় বলো তো? টিউশনি করতে গেলে আমার লেখাপড়ার সময় আর থাকে না। সেজন্যই তো স্কুলে বসে অফ পিরিয়ডে ছেলেদের খাতা দেখি-

রমাপদ বলিল—আমার কাছে আপনার সাফাই গাইতে হবে না, আমি তো জানি আপনি কী ধরনের লোক। ভুলটা আপনিই করেছেন অমিতাভদা-

—কী রকম?

—এসব ছাত্রকল্যাণমূলক কাজকর্ম শুরু করে ভালো কবেন নি। বাইরে থেকে শিক্ষকতা বেশ একটা মহৎ ব্রত বলে মনে হয়, এব ভেতরে যে কত ঈর্ষা আর গোলমাল রয়েছে তা আপনি জানেন না। স্কুলের প্রায় কেউই আপনার এই কাজ ভালো চোখে দেখছে না-

কাজল জিজ্ঞাসা করিল-কালিদাসবাবুও?

জিভ কাটিয়া রমাপদ বলিল—উনি বাদে। কালিদাসবাবু অন্যরকম লোক—

কাজল জিজ্ঞাসা করিল—এ নিয়ে রামনাথদার সঙ্গে একবার কথা বলব নাকি? উনি যদি ভুল বুঝে থাকেন, সেটা ভেঙে দেওয়াও তো উচিত।

-পাগল নাকি? আপনি নিজে কিছুই শোনেননি, রামদা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করবেন একথা আপনাকে কে বলেছে? উনি যাদেব বলেছেন তারাও কেউ

আপনার কাছে স্বীকার করবে না। মাঝ থেকে আপনি ফেঁসে যাবেন। তাছাড়া রামদা মোটেই ভুল বোঝেন নি, রাগে উনি অমন বলছেন–

–রাগ কিসের?

-বলা কঠিন। নিজের যে কাজ করা উচিত অথচ করতে পারছি না, অন্যে তা করছে–এটা থেকে অকারণ রাগ আসতে পারে। প্রফেশনাল জেলাসি হতে পারে

কাজল আশ্চর্য হইয়া বলিল–কী রকম?

–আপনি বিনাপয়সায় এরকম পরোপকার করে বেড়ালে ওঁদের টিউশনি কমে যাবে। অন্তত ওঁরা ছাত্রদের কাছে হেয় হবেন। যে কাজ ওঁরা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে করে থাকেন, সেটা আপনি বিনাপয়সায় করে দিলে ছাত্রদের কাছে ওঁদের দর কমে যাবে

বাহিরের জগৎটা সম্পর্কে কাজলের ধারণা বাবার বই পড়িয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। পৃথিবীর মানুষ মোটর উপর সবাই ভালো, বিশ্বসৃষ্টির ভিতর দিয়া প্রবাহিত একটা শুভাক্তি সমাজ-সংসারকে চালিত করিতেছে–এই বিশ্বাস তাহাকে এতদিন নানা বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও আশাবদী রাখিয়াছিল। আজ প্রথম সেই বিশ্বাসটায় বোরকমের ধাক্কা খাইল।

কিন্তু অনেক রাতে নিজের ঘরে বিছানায় শুইয়া হথর্নের স্কারলেট লেটার পড়িতে পড়িতে তাহার হতাশার বোধটা কাটিয়া গেল। নতুন অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়াই জীবনের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপিত হয়। মানিয়া লইতে যতই কষ্ট হউক, তবু বাস্তবকে স্বীকার করিতেই হইবে।

কত রাত এখন? বারোটা? একটা? গত পাঁচ-ছয়দিন সে কিছু লেখে নাই, উপন্যাসখানি কিছুদূর অগ্রসর হইয়া থামিয়া রহিয়াছে। আচ্ছা, আজ বাকি রাতটুকু সে যদি না ঘুমাইয়া শুধু লেখে?

আউট অফ কেওস কেম দি কসমস! বিশৃঙ্খলা হইতে, আদর্শ ভাঙিয়া যাইবার বেদনা হইতেই প্রকৃত সাহিত্য উঠিয়া আসে। অপূর্ণতার যন্ত্রণাই সমস্ত শিল্পের মূল কথা। সংসারে সবকিছু ঠিকঠাক চলিলে কে আর ছবি আঁকিয়া বা গান গাহিয়া ফাঁকটুকু পূরণ করিবার চেষ্টা করিত?

সারারাত জাগিয়া কাজল লিখিতে লাগিল।

www.bengaliebook.com

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

শীতের সকাল। বারান্দায় রোদ্দুরে বসিয়া কাজল খবরের কাগজ পড়িতেছে, এমন সময় হাসিমুখে নন্দলাল আসিয়া উপস্থিত হইল।

-এসো নন্দলাল। ভালো আছ? সত্যিই এলে তাহলে?

নন্দলালের সাজ একই। পরনে খাটো ধুতি, খালি গায়ের উপর নামাবলী জড়ানো, পায়ে সস্তা দামের চটি, হাতে পূজার উপকরণসহ পিতলের সাজিখানি। বারান্দার নিচে চটি ছাড়িয়া সে উপরে উঠিল এবং নিষেধ না শুনিয়া কাজলের পায়ের ধুলা লইল।

-তারপর খবর কী বলে?

নন্দলাল আকর্ণ হাসিয়া বলিল—আমাদের আর খবর কী থাকবে দাদা? ওই কেটে যাচ্ছে একরকম। সত্য খুব বাড়িয়েছে, বুঝলেন? বাবার সেই সেবাদাসী! গত জগদ্ধাত্রী পুজোর দিন বাবা ডেকে বলল—নন্দ, আজ পুজোর দিনটা তুই বাড়িতেই খাবি। ইদানীং আর বাড়িতে খাই না, জানেন তো? তা খেতে খেতে দুটো ভাত চেয়েছি, সত্য বলল—আর ভাত নেই। তখনও আমার অর্ধেক খাওয়া হয়নি। বললুম—মানুষকে খেতে বললে একটু বেশি করেও তো চাল নিতে হয়। উত্তরে সৎমা কী বললে জানেন? বললে—তোমার ওই হাতির খোরাক জোগানো সম্ভব নয়। আরও চাল নিলে আরও চাল সেঁদিয়ে যেত। শুনে কেমন যেন রাগ হয়ে গেল, বললুম—আমার বাবার বাড়িতে বসে আমি ভাত খাচ্ছি, তুমি ফোপরদালালি করবার কে? তাতে সৎমা তেড়ে এসে লোহাব খুন্তি দিয়ে—এই দেখুন না, সামনের দাঁতের আধখানা ভেঙে গিয়েছে

www.bengaliebook.com

কথা শেষ করিয়া নন্দ আবার হাসিল। হাসিটা তাহার স্বভাব। মনের বিষাদ বা হর্ষের সহিত ইহার কোনো সম্পর্ক নাই।

কাজল বলিল—বোসোনন্দ, মাকে তোমার কথা বলে আসি। দুপুবে আমার এখানেই খেযে যাবে, কেমন?

—জানি দাদা এই কথা বলবেন—সেজন্যেই তো সকাল সকাল এলুম। আপনাদের রান্না হয়ে গেলে অসুবিধে হত। কিছু জলখাবার হবে কী দাদা?

কাজল হাসিয়া বলিল-পরোটা আর কুমড়োর তরকারি চলবে?

-খুব, খুব! তবে দু-খানা বেশি করে বলবেন। আমরা গাঁয়ের মানুষ, বুঝলেন তো?

হৈমন্তী বরাবরই লোকজনকে খাওয়াইতে ভালোবাসে। নন্দলালের অন্নলোপ সারল্য, অর্থহীন আকর্ণ হাসি এবং অগোছালো চালচলন তাহার মাতৃত্বের কাছে গভীর আবেদন লইয়া উপস্থিত হইল। ভিতরের বারান্দায় আসন পাতিয়া হৈমন্তী নন্দলালকে যত্ন করিয়া জলখাবার খাওয়াইল। নন্দলালও সেই যত্নের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করিল না। তরকারি সহযোগে বাবোখানি বড়োবড়ো পরোটা খাইয়া ফেলিবার পর হৈমন্তীর প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল—আরও দেবেন মা? আচ্ছা আপনি বলছেন যখন দিন গোটাচারেক, তবে তার বেশি নয়—সকালে একগাদা খেয়ে পেট ভরিয়ে ফেলা কোনো কাজের কথা না। তরকারি আর দেবেন না, বরং গুড় যদি থাকে-

সামান্য জলযোগ করিয়া নন্দলাল বাহিরের বারান্দায় রৌদ্রে পিঠ দিয়া বিশ্রাম করিতে গেল।

www.bengaliebook.com

হৈমন্তী কাজলকে ডাকিয়া বলিল—হ্যাঁরে, লোকটা দুপুরে খাবে তো বললি এখনই ও যোলোখানা পরোটা খেল, আবার দুপুরে যেতে পারবে?

বুঝাইয়া বলিতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়। কাজল সংক্ষেপে বলিল-পারবে।

-পেট-টেট খারাপ করবে না তো?

কাজল হাসিয়া বলিল—কিচ্ছু হবে না মা, তুমি ওকে চেনো না-

বাস্তবিকই দুপুরে খাইবার সময় নন্দলাল ভেলকি দেখাইল। মাত্র ঘণ্টাদুই আগে খাওয়া যোলোখানি পরোটা সে জঠরের কোন দুর্গম গহনে পাচার করিল কে জানে! প্রথমদিকে হিং দেওয়া কলাইয়ের ডাল, পালংশাকের চচ্চড়ি আর পোস্তর বড়া দিয়া সে দুই থালা ভাত খাইয়া ফেলিল। কালোজিরা-কাঁচালঙ্কা ফোড়ন দিয়া ট্যাংরা মাছের ঝোল হইয়াছিল। মাছের ঝোল দিয়া আরও দুই থালা ভাত। মুখে পরিতৃপ্তির ছাপ লইয়া সে উঠিতেছিল, হৈমন্তী তাহাকে বলিল—একটু দুধ খাবে? ভালো পাটালি গুড় আছে, তাই দিয়ে খাও—

নন্দলাল আবার বসিয়া পড়িল। বলিল—দুধের মধ্যে অমনি দুটো ভাতও ফেলে দেবেন মা, শুধু দুধ যেন কেমন লাগে-

সন্ধ্যাবেলা যখন ঘরের ভিতর অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিল, তখনও বারান্দার বেঞ্চির উপর শুইয়া নন্দলাল নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। সাড়ে-ছয়টা নাগাদ সে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া অপ্রতিভমুখে বলিল—এঃ, বড্ড অন্ধকার হয়ে গেল। ডেকে দিলেন না কেন দাদা?

-তাই কী ডাকা যায়? একটা মানুষ ঘুমোচ্ছে—তুমি বরং আজকের রাতটা আমার এখানে থেকেই যাও, কেমন?

মাথা চুলকাইয়া নন্দলাল বলিল—আজ্ঞে তা যখন বলছেন—এত রাত্তিরে যাওয়াটাও-

-এবেলা মাংস খাবে নন্দ?

উৎসাহে নন্দলাল যেন কেমন হইয়া গেল। বলিল-মাংস? নিশ্চয়। আপনি খেলে আমিও একটু-মাংস খেতে আমি খুবই-বাবা প্রায়ই আনতেন। মধ্যে অনেকদিন—ওই সৎমা, বুঝলেন না?

মাংস কিনিতে হইলে চৌমাথার মোড়ের বাজারে যাইতে হয়। নন্দও কাজলের সঙ্গী হইল, ফিরিবার সময় তাহার বারণ না শুনিয়া বাজারের থলি বহিয়া দিল। বাড়ি ঢুকিবার সময় চুপিচুপি বলিল-দাদা, একটা কথা বলবো?

—কী?

—আপনারা কী রাত্তিরে রুটি খান? শহরের দিকে সবাই তাই খায়—

-কেন বলো তো? তুমি কী বুটি খাও না?

-খাবো না কেন দাদ? আমার এখন যা অবস্থা, সবই খাওয়া অভ্যেস করতে হয়েছে। তবে কী জানেন, রুটি জিনিসটা ঠিক পোষায় না। মাকে বলে দেবেন দুটো ভাত করতে?

কাজল বলিল—আচ্ছা, তুমি ভাতই খেয়ো-

রাত্রে একসের মাংসের মধ্যে কাজল দুই টুকরা মাংস এবং এক টুকরা আলু খাইয়াছিল। কিন্তু নন্দলাল থাকিতে বাকি এককড়াই রান্না ফেলা যাইবে তাহা

www.bengaliebook.com

হইতেই পারে না। নিজের উপর সমস্ত ঝুঁকি লইয়া নন্দ অপচয়ের হাত হইতে গৃহস্থকে রক্ষা করিল।

পরদিন সকালে নন্দলাল বিদায় লইল বটে, কিন্তু হৈমন্তীর আদর্য তাহার উপর যাদুপ্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। দুই-তিনমাস পরপরই সে বিশ্বের ক্ষুধা লইয়া আসিয়া হাজির হইত।

উপন্যাস শুরু করিয়া কাজল বুঝিয়াছিল সাহিত্যের ক্ষেত্রে কোনো শিক্ষানবিশীর ব্যবস্থা নাই। ভাস্কর গুরুর কাছে হাতুড়ি-বাটালি ধরিয়া প্রস্তরখণ্ড হইতে মূর্তি বাহির করিবার কৌশল শেখে, চিত্রশিল্পীও হাতেকলমে কাজ শেখে, গায়ক ওস্তাদের কাছে তালিম নেয়। কিন্তু যাহারা লেখক হইতে চায়, তাহাদের জন্য তেমন কোনো নিয়ম নাই। পূর্বসুরীদের রচনাপাঠ কিছুটা সাহায্য করে মাত্র, নিজের জীবনে লব্ধ অভিজ্ঞতা সম্বল করিয়া বাকি পথটা হাঁটিতে হয়।

লিখিতে আরম্ভ করিবার পর প্রথমটা কাজল কী নিয়া লিখিবে ঠিক করিতে পারিল না। উপন্যাসে কী একটানা একটি গল্প থাকে, নাকি ছোটোছোটো ঘটনার টুকরা দিয়া একটি অখণ্ড সম্পূর্ণতা গড়িয়া ওঠে? বলিবার কথা কী কিছু একটা থাকিতেই হইবে, নাকি কেবল গল্প বলিলেও চলে? জীবনদর্শনের কথা ছাড়িয়াই দেওয়া যাক, শুধুমাত্র একটি নিটোল গল্প জমাইয়া তোলাও যে কত কঠিন, তাহা কাজল মর্মে মর্মে টের পাইল। অথচ কলেজে বা ইউনিভার্সিটিতে পড়িবার সময় সহপাঠীদের কাছে বুদ্ধিজীবী বলিয়া পরিচিত হইবার লোভে যাঁহারা নিটোল গল্প লিখিয়াছেন, সেইসব লেখকদের সে কত তাচ্ছিল্য করিয়াছে। প্রভাতকুমার-শরৎচন্দ্রের ভক্ত হওয়া একটা লজ্জার কথা বলিয়া পরিগণিত হইত। এখন নিজে লিখিবার সময় পূর্বসূরীদের শ্রেষ্ঠত্ব সে অনুভব করিতে পারিল।

কিন্তু গল্প তো জীবন হইতেই উঠিয়া আসে। তাহার জীবনে কী কিছুই ঘটে নাই? নিশ্চিন্দিপুরে ফিরিয়া যাইবার জন্য তাহার মনে যে আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে, একটু একটু করিয়া বড়ো হইবার সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে পৃথিবীর রূপটা যেভাবে বদলাইতেছে, গভীর রাতে আকাশের দিকে তাকাইয়া অস্তিত্ব সম্বন্ধে মনে যে প্রশ্ন জাগিয়াছে–সেসব লইয়া কী গল্প হয় না?

লেখা ছাড়া আর কোন বিষয়ে তাহার দক্ষতা নাই। সে আর কিছু জানে না। কেই পড়ুক বা পড়ুক, তাহাকে লিখিতেই হইবে। সততার সহিত নিজের অনুভূতিগুলিকে সে লিপিবদ্ধ করিয়া যাইবে। পুরস্কৃত হওয়া-না-হওয়া ভাগ্যের হাতে। সে অন্তত ফাঁকি দিবে না।

উপন্যাস ধীরে ধীরে শেষ হইতে চলিল।

ফাল্গুনের ঈষত্তপ্ত বাতাস নিমগাছের পাতায় ঝিরঝির শব্দ তোলে। ঋতু পরিবর্তনের এই মনোরম অলৌকিক মুহূর্তে আজকাল কাজলের মন ছটফট করিতে থাকে। সময় চলিয়া যাইতেছে। পত্রমর্মরে যেন মহাকালের অদৃশ্য ঘটিকাযন্ত্র হইতে বালি ঝরিয়া পড়িবার শব্দ। জীবন ক্রমেই ফুরাইয়া আসিতেছে। কিছুই ঠিকঠাক করা হইল না।

কিন্তু কী করিবার ছিল? কতদুর পরিপূর্ণতা আসিলে তাহাকে সার্থকতা বলে?

এসব প্রশ্নের কোনো সঠিক উত্তর নাই।

কেবল সময়ের ঘড়ি হইতে বালি ঝরিয়া যায়।

নিজের মনের কথাটা ঠিকমতো বুঝাইতে না পারাও ভয়ানক কষ্ট। অধিকাংশ মানুষের জীবনেই কোনো প্রশ্ন নাই। পিপাসাও যেটুকু আছে তাহা আরও ভালো খাইবার-পবিবার কিংবা আরও বেশি টাকা রোজগার করিবার।

এই মানসিক অবস্থায় সে পরপর বিভিন্ন পত্রিকায় কয়েকটি গল্প লিখিল। কেহ বলিল–খুব ভালো হইয়াছে। জীবনের দার্শনিক ব্যাখ্যা খুঁজিবার জন্য লেখকের প্রচেষ্টা আছে। কেহ বলিলঅনেক গালভরা কথা বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু গল্পটা কই? আবার কেহ বলিল-ওরিজিনালিটি নেই। একদম অপূর্ব রায়ের নকল-বাপের নাম ভাঙিয়ে নাম করিতে চাহিতেছে। কেবল দ্বিজেনবাবু একদিন বলিলেন–কারও কথায় কান দেবে না। তোমার হাতে ভালো বাংলা গদ্য আছে। কিছুর পরোয়া না করে অনেস্টলি লিখে যাও। তোমার বাবা বলতেন–মশায়, যদি লেখায় নিজেকে ফাঁকি না দিয়ে থাকেন, তাহলে গ্যাট হয়ে বসে থাকুন। আপনার লেখা শাশ্বত হবে।

একান্ত মুহূর্তে কাজল নিজে ভাবিয়া দেখিল-সে কেন লেখে? কেহ প্রশংসা করিলে ভালো লাগে সত্য, কিন্তু কেবলমাত্র সেজন্যই কী দিনরাত এত পরিশ্রম করা? চব্বিশ ঘণ্টাই যে সে লিখিতেছে এমন নহে, কিন্তু সবসময়েই লেখার কথা ভাবিতেছে একথা সত্য। নিজের বলিবার কথাগুলির একটা নিজস্ব তাগিদ আছে, সেই শক্তিই ভিতর হইতে ধাক্কা দেয়। পাঠক পড়িয়া কী বলিবে এ কথা ভাবিয়া সে অদ্ভুত লেখে না।

পাঠকে যাহাই বলুক, ক্রমাগত লিখিতে থাকিলে নিজের রচনা সম্বন্ধে একধরনের আত্মপ্রত্যয় জন্মায়। কাজলও তাহার ব্যতিক্রম নহে। কিন্তু একটা ঘটনা অকস্মাৎ তাহাকে রীতিমতো বিষণ্ন করিয়া দিল।

‘খুশি ও খেলা’ নামে প্রখ্যাত কিশোর পত্রিকায় সে একটি গল্প দিয়া আসিয়াছিল। নিষ্পাপ শৈশব চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনের যে এক অমূল্য ঐশ্বর্য চিরতরে অন্তর্হিত হয়তাহাই গল্পের বিষয়বস্তু। একজন অল্পবয়েসী কল্পনাপ্রবণ কিশোর স্কুল পালাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে নির্জন দুপুরবেলা একটি ভাঙা পাঁচিলের ফোকর গলিয়া ওপারে এক আশ্চর্য দেশে

গিয়া হাজির হইল। সেখানে রুপকথা ও লোকায়ত কাহিনীর বিখ্যাত চরিত্রগণ বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সারাবেলা পান্তাবুড়ি, ডালিমকুমার, মন্ত্রীপুত্র-কোটালপুত্র, পক্ষীরাজ ও মধুসুদনদাদার সঙ্গে মেলামেশা করিয়া, স্বয়ং ঈশপের কুটিরের বারান্দায় বসিয়া তাহার মুখে গল্প শুনিয়া সন্ধ্যাবেলা মায়ের জন্য মন-কেমন করায় সে বাড়ি ফিরিয়া গেল। বড়ো হইয়া কলেজে পড়িবার সময় ছেলেটি একদিন সেই আশ্চর্য রাজ্যে আর একবার যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল—কিন্তু পাঁচিলের ফোকরটা কিছুতেই খুঁজিয়া পায় নাই। এই গল্প।

গল্পটা লিখিয়া কাজলের ভালো লাগিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল সম্পাদক পড়িয়া নিশ্চয় অবাক হইয়া যাইবেন এবং অবিলম্বে প্রেসে দিবেন। গল্প দিতে যাওয়ার দিন সম্পাদক ছিলেন না। দপ্তরের একজন কর্মচারী লেখাঁটি রাখিয়া বলিয়াছিল-মাসখানেক বাদে খোঁজ করবেন

কাজল একটু আশাহত হইল। খ্যাতনামা কাগজগুলিতে গল্প প্রকাশ হওয়ায় অন্তত পত্রিকার অফিসগুলিতে লোকে তাহার নামটা চিনিতে পারে। কিন্তু এই ভদ্রলোক তাহার পাণ্ডুলিপি ডানদিকের একটা দেরাজে রাখিয়া গম্ভীরভাবে প্রফ সংশোধন করিতে লাগিলেন। একটু ইতস্তত করিয়া সে বলিল—তাহলে-

ভদ্রলোক কিছুটা বিরক্ত হইয়া মুখ তুলিয়া বলিলেন-বললাম যে, মাসখানেক পর!

বাহিরে আসিয়া কাজলের ভারি দুঃখ হইল। মানুষ তো একটু বসিতেও বলে! আহত মর্যাদাবোধ বড়ো খারাপ জিনিস। সারা দিনরাত কাজল বিষণ্ন হইয়া রহিল। তারপর ভাবিয়া ভাবিয়া ঠিক করিল—লোকটা আমার লেখাটা নিয়েই ড্রয়ারে ঢুকিয়ে ফেলল, নাম-টাম কিছুই পড়বার সুযোগ পায়নি। নাম দেখলে

www.bengaliebook.com

কী আর চিনতে পারত না? ও বেচারীর আর দোষ কী? ওদের অফিসে সারাক্ষণ লোকে বিরক্ত করছে, আমাকে তো আর চিনে রাখেনি

মাসখানেক কাটিবার পর একদিন কাজল খুশি ও খেলা-র দপ্তরে খোঁজ করিতে গেল। বাহিরের ঘবে পূর্বদিনের সেই ভদ্রলোক আজ নাই। একজন বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করিয়া

জানিতে পারিল সম্পাদক মহাশয় নিজের ঘরে কাজ করিতেছেন। সে বলিল– একটু দেখা করা যায় না?

–কী দরকার বলুন?

–এমনি একটু প্রয়োজন ছিল–

লোকটি সামান্য ভাবিয়া বলিল–আচ্ছা যান। ওই যে, ওই ঘর-

নির্দেশ দিবার দরকার ছিল না, কারণ সুইং ডোরের ঘষা কাঁচের গায়ে সম্পাদক লেখা কাগজ সাঁটা আছে। সে দরজা ঠেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল– আসতে পারি?

ধুতি এবং খন্দরের পাঞ্জাবি পরা সম্পাদক, মাথায় কাঁচাপাকা লম্বা চুল, বিশাল টেবিলের অপর প্রান্তে বসিয়া কী লিখিতেছিলেন। দেখামাত্র কাজল তাহাকে চিনিতে পারিল। ইনি বর্তমান বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব– আধুনিক কবি হিসাবেও খুব নাম করিয়াছেন। সম্প্রতি ছোকরা কবিযশঃপ্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই ইঁহার অনুকরণে লম্বা চুল রাখিতেছে এবং কাঁধে ঝোলা লইয়া ঘুরিতেছে। জলদমন্দ্র কণ্ঠে সম্পাদক জিজ্ঞাসা করিলেন- কী চাই?

কাজল ঘরের ভিতর কিছুটা অগ্রসর হইয়া বলিল–আজ্ঞে, আমি একটা গল্প দিয়ে গিয়েছিলাম। আমাকে বলা হয়েছিল মাসখানেক বাদে খবর নিতে–

-তা। এখানে কী?

ভদ্রলোকের আচরণে হৃদ্যতার লেশমাত্র নাই। কাজল বলিল–লেখাটার বিষয়ে জানতে–

–যাঁকে দিয়েছিলেন তার কাছেই খোঁজ করা নিয়ম। এখানে কেন?

–বাইরে কাউকে দেখলাম না, তাই–

–তাই ঢুকে পড়লেন?

বিরক্তমুখে সম্পাদক ঘন্টি বাজাইতেই বেয়ারাটি আসিয়া হাজির হইল।

–এঁকে ভেতরে ঢুকতে দিয়েছে কে? রবিবাবু কোথায়?

-আজ্ঞে, উনি টিফিন করতে গিয়েছেন–

-তার টেবিলে বসালে না কেন? যাও, গল্পেব ফাইলটা নিয়ে এস-

সম্পাদক আবার কী লিখিতে লাগিলেন। কাজল দাঁড়াইয়াই রহিল। এই অফিসে কেহ অতিথিকে বসিতে বলে না দেখা যাইতেছে।

বেয়ারা ফাইল আনিয়া দিল। বক্স ফাইলের ঢাকনা খুলিয়া সম্পাদক জিজ্ঞাসা করিলেন– গল্পের নাম কী?

www.bengaliebook.com

কাজল নাম বলিল। এইবাব গল্প বাহির করিয়া সম্পাদক তাহার নাম দেখিবেন–এবং নিশ্চয় চিনিতে পারিবেন। চিনিতে পারিলেও সম্পাদক মহাশয়ের ব্যবহারে তাহার কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না। ফাইল হইতে লেখাঁটি বাহির করিয়া বলিলেন–ও, এই গল্প! নিয়ে যান।

কাজল অবাক হইয়া বলিল–নিয়ে যাব?

-হ্যাঁ। এটা কোনো গল্পই হয়নি। আমি নিজে পড়ে দেখেছি। তাছাড়া বাংলা ভাষার আপনি কিছুই জানেন না। আপাতত লেখা বন্ধ রেখে ভাষার ব্যবহার শিখুন

কিছুটা যেন ছুঁড়িবার ভঙ্গিতে সম্পাদক পাণ্ডুলিপিটি টেবিলের এ প্রান্তে কাজলের সামনে ফেলিয়া দিলেন।

মানুষটির আচরণে এক ধরনের রূঢ় ঔদ্ধত্য আছে যাহা কাজল আগে কখনও দেখে নাই। লজ্জায় অপমানে তাহার কান গরম হইয়া উঠিল। কাগজগুলি হাতে লইয়া সে কোনোরকমে বাহির হইয়া আসিল।

রাস্তায় সবাই যেন তাহার দিকেই তাকাইয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছে। সবাই কী করিয়া জানিয়া ফেলিয়াছে এইমাত্র সে পত্রিকার দপ্তর হইতে অপমানিত হইয়া বাহির হইল! বাড়ি ফিরিবার সময় ট্রেনে জানালার ধারে বসিয়া সে মান-অপমানের নিরর্থকতা এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে অবিচল থাকিয়া নিজের কর্তব্য করিবার বিষয়ে মহাপুরুষদের অনেক ভালো ভালো কথা স্মরণ করিল। কিন্তু দেখিল তাহাতে অপমানের জ্বালা কমে না।

ভদ্রলোক নিজে একজন কবি। কবিদের সম্বন্ধে কাজলের মনে বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধার আসন ছিল। তাহারা কী সবাই এমন হয় নাকি? অকারণে তাহার সহিত

এরূপ ব্যবহারের কারণ কী? লেখা পছন্দ না হইলে সে কথাটা মধুর করিয়াও তো বলা যাইত।

অনেকদিন পরে বাট্রান্ড রাসেলের প্রবন্ধ পড়িতে গিয়া কাজল ইহার উত্তর পাইয়াছিল। রাসেল বলিয়াছেন ক্ষমতার ব্যবহারেই ক্ষমতা অর্জনের সুখ। দুইটা মাথাই যদি না কাটিতে পারিলাম তাহা হইলে ধারালো তলোয়ারের মালিক হইয়া কী লাভ? মানবসভ্যতা নামক ব্যাপারটি এই ক্ষমতা দখলেরই ইতিহাস। নিতান্ত উচ্চকোটির মহাপুরুষ না হইলে এ প্রলোভন এড়ানো কঠিন।

সম্পাদকগণ সকলেই কিছু মহাপুরুষ নহেন।

ঘটনার দার্শনিক এবং মনস্তাত্তিক ব্যাখ্যা যাহাই হোক, কাজল পরিষ্কার বুঝিতে পারিল, লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করা খুব সহজ কাজ হইবে না।

কোনো না কোনো ঘটনা অবলম্বন করিয়া মানুষের জীবনে পরিবর্তন সূচিত হয়। দিদিমার মৃত্যুতে কাজলের জীবনে সেই পরিবর্তন শুরু হইল। দিদিমা অনেকদিন ধরিয়াই ভুগিতেছিলেন, বিশেষ করিয়া দাদুর মৃত্যুর পর তাহার বাঁচিবার ইচ্ছাটাই চলিয়া গিয়াছিল। একদিন অনেক রাত্রে কাজল শুইয়া বই পড়িতেছে, দরজায় কে কড়া নাড়িল। দরজা খুলিয়া কাজল দেখিল প্রতাপ আসিয়াছে।

-কী ব্যাপার মামা? এত রাত্তিরে?

-মায়ের শরীর খুব খারাপ হয়েছে, রাত কাটে কিনা সন্দেহ। তাই মেজদিকে নিয়ে যেতে এসেছি–

www.bengaliebook.com

হৈমন্তী চট করিয়া তৈয়ারি হইয়া লইল। কাজল বলিল—আমিও সঙ্গে যাই মা? যদি ওষুধপত্র বা ডাক্তারের দরকার হয়—

প্রতাপ বলিল—তুই থাক। বাড়ি খালি রেখে যাওয়া ঠিক হবে না। সকালে উঠে চলে যাস এখন। তার মধ্যে দরকার হলে কাউকে দিয়ে খবর দেব-

দিদিমা মারা গেলেন পরদিন বিকাল পাঁচটা নাগাদ।

পাড়ার লোকজন এবং কাজলের বন্ধু-বান্ধবরা আসিয়া রাত আটটার মধ্যে সব ব্যবস্থা করিযা ফেলিল। পাড়ার মাতব্বর বৈদ্যনাথ সরকার বলিলেন—আর দেরি কিসের? চল, চল-ওদিকে অনেক সময় লেগে যাবে

কেষ্ট মুখুজ্যের ঘাটে ল্যাম্পপোস্টের মাথায় মিটমিট করিয়া একটা ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বলিতেছে। তাহারই ঘোলাটে আলোয় দিদিমার শেষ শয্যা প্রস্তুত হইল। ঊনসত্তর বছর বাঁচিয়া এইমাত্র এক প্রিয়জন পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া যাইবে। মুখাগ্নি করিবার জন্য ওই ধারে প্রতাপ প্রস্তুত হইতেছে। পুরোহিত মহাশয় ল্যাম্পপোস্টের নিচে বসিয়া নাকে চশমা লাগাইয়া অনুচ্চস্বরে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পড়িতেছেন। শ্মশানবন্ধুদের কয়েকজন নিজেদের মধ্যে গতকাল পাড়ায় ঘটিয়া যাওয়া কী একটা মুখরোচক ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিতেছে। এ সমস্তই থাকিবে, আগামীকাল সকাল হইলেই পৃথিবী আবার আপন কর্মের স্রোতে ভাসিয়া যাইবে। মেঘ গোয়ালা যথাসময়ে দুধ দিতে আসিবে, গলির মুখে খোঁড়া নাপিত ইটের উপর বসাইয়া ব্রিজনাথ ভরতের দাড়ি কামাইয়া দিবে। তাহার দিদিমা হেলেন কেলার, মাদাম কুরি বা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ছিলেন না, কেহ তাহাকে মনে করিয়া রাখিবে না। এমন কী আত্মীয়স্বজনেরাও প্রথমে কিছুদিন শোক করিবে তারপর ভুলিয়া যাইবে।

অথচ দিদিমা কী স্নেহপ্রবণই ছিলেন, সবাইকে লইয়া বাঁচিতে ভালোবাসিতেন। তাহারও আলো-বাতাস সকাল-সন্ধ্যা হাসিকান্না লইয়া একটা আস্ত জীবন ছিল। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সবই যদি এমনভাবে মুছিয়া যাইবে তাহলে বাচিবার সার্থকতা কী?

কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, দিদিমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শৈশবের সহিত তাহার যোগসূত্র প্রায় সবটাই ছিন্ন হইয়া গেল। এইভাবেই বোধহয় যুগ শেষ হইয়া যায়।

ঘাট হইতে ফিরিতে রাত প্রায় আড়াইটা বাজিয়া গেল। ঝুমুর বেড়ালটা পাঁচিলের উপর লম্বা হইয়া ঘুমাইতেছে। বাহিরের দরজা খোলা, ভূষণ সেখানে একটা ভাজ করা শতরঞ্চির উপর বসিয়া ঝিমাইতেছে। সবকিছু কেমন স্বাভাবিক, কেবল দিদিমা নাই।

দিদিমার ঘরের কাছে গিয়া কাজল হঠাৎ চমকইয়া উঠিল। চিরপরিচিত খাটটা আর নাই, এরই মধ্যে তুলিয়া ফেলা হইয়াছে। ওইখানে দিদিমা দরজার দিকে মাথা দিয়া শুইয়া থাকিতেন। কে জানে পুনর্জন্ম আছে কিনা, এই সুন্দর পৃথিবীতে মানুষের আত্মা আর ফিরিয়া আসে কিনা। দিদিমার সঙ্গে সত্যই চিরকালের মতো ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল।

দিনরাত পরিশ্রম করিয়া সে উপন্যাস প্রায় শেষ করিয়া আনিল। একদিন সে উপন্যাসের প্রথমদিকের শখানেক পাতা সইয়া দুরু দুরু বক্ষে বসু ও গুহ-এর দোকানে গিয়া হাজিব হইল।

দ্বিজেনবাবু কেদারায় হেলান দিয়া উদ্বোধন পত্রিকা পড়িতেছিলেন। তাহাকে দেখিয়া বলিলেন-কী খবর? অনেকদিন তোমায় দেখিনি, ভালো আছ তো? মা কেমন আছেন?

প্রণাম করিয়া কাজল বসিল। কিছুক্ষণ নানা বিষয়ে কথাবার্তা বলিবার পর ইতস্তত করিয়া কাজল বলিল—আমি একটা বড়ো লেখায় হাত দিয়েছি, প্রায় শেষও হয়ে এসেছে। আপনি যদি একটু পড়ে দেখেন-

-বড় লেখা? কী ধরনের বড়লেখা উপন্যাস?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

-কী বিষয় নিয়ে লিখছো?

কাজল বলিল-বাবার প্রথম উপন্যাসখানা ওঁর আত্মজীবনীমূলক। উনি যেখানে শেষ করেছেন, সেখান থেকে আমি ধরেছি। বাবা নিশ্চিন্দিপুরে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন ওঁর জীবনদর্শন ছেলের মধ্যে সঞ্চারিত হোক। সে আশা কতখানি সফল হল তাই নিয়ে আমার লেখা।

দ্বিজেনবাবু বলিলেন—মানে তোমার নিজের জীবন?

কাজল দৃঢ়গলায় বলিল-না। গ্রামের মাটিতে যার উৎস, অথচ শহরের জটিলতায় যে বড়ো হয়ে উঠেছে—এমন একজন বাঙালি ছেলেব জীবন।

দ্বিজেনবাবু কিছুক্ষণ কাজলের দিকে তাকাইয়া থাকিলেন, তারপর হাত বাড়াইয়া বলিলেন-লেখাটা দাও। চার-পাঁচদিন পর আমার সঙ্গে দেখা করবে-

পাণ্ডুলিপি দিয়া কাজল চলিয়া আসিতেছিল, দ্বিজেনবাবু ডাকিলেন—শোন।

-আজ্ঞে?

-আমি কিন্তু তোমাকে কোনো প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি না। লেখাটা পড়ে মতামত জানাবো, এটুকু কেবল জানালাম। লেখা যেমনই হোক, আমি ছাপিয়ে দিতে পারি, কিন্তু তাতে তোমার সর্বনাশ করা হবে-

কাজল হাসিয়া বলিল–ঠিক আছে। মোপাসা আর ফ্লোবেয়ারের গল্প আমি জানি।

হপ্তাখানেক বাদে কাজল দ্বিজেনবাবুর মতামত জানিতে গেল। তিনি বলিলেন–পড়লাম তোমার লেখা। আর কতদূর বাকি আছে?

–আজ্ঞে দশ-পনেরো দিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।

-লেখা ভালো হয়েছে। তোমার গদ্য সুন্দর তা তো আগেই বলেছি। অপূর্ববাবুর বইখানা জনপ্রিয়। তাঁর উপন্যাসের পরবর্তী পর্ব তারই পুত্র লিখেছে–এতে পাঠকদের মনে আগ্রহ জাগা স্বাভাবিক। আমার বিশ্বাস-এ বই পড়ে তারা নিরাশ হবে না।

কাজল যেন কিছুটা অবিশ্বাসের সুরে বলিল–তার মানে আপনি-

-বইখানা আমি ছাপাবো। যত তাড়াতাড়ি পাররা শেষ করে আমাকে কপি দাও–

ঝুঁকিয়া দ্বিজেনবাবুকে প্রণাম করিতে গিয়া কাজল কাঁদিয়া ফেলিল।

বাহিরে আসিয়া কাজল দেখিল হ্যারিসন রোডে ট্রাম চলিতেছে। অফিস-ফেরত লোকের ভিড় চলিয়াহে শিয়ালদহ স্টেশনের দিকে। জ্ঞানবাবুর চায়ের দোকানে চা-রস-প্রত্যাশীদের সান্ধ্য সমাগম আরম্ভ হইয়াছে। ফুটপাথের উপর কাপড় বিছাইয়া একজন খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা লোক যশোরের

চিরুনি বিক্রি করিতেছে। সবই অবিকল ঠিক অন্য অন্য দিনের মতো। কেবল তাহার জীবনে অনতিদূর ভবিষ্যতে এক আশ্চর্য পরিবর্তন আসিতেছে। সবাইকে কথাটা জানাইয়া দিলে হয় না?

বই বাহির হইবার দশ-বারোদিন আগে বিখ্যাত সাময়িক পত্রগুলিতে তাহার উপন্যাসের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইল। হৈমন্তী দেখিয়া ভারি খুশি। বলিল- সেকালে বাণভট্টের ছেলে ভূষণভট্ট বাবার আরব্ধ কাজ শেষ করেছিলেন, তুইও তাই করলি-

কিন্তু রাত্রে শুইয়া কাজলের মনে হইল—বাবার কাজ আমি শেষ করিনি, ও কাজ তো শেষ হয় না। বাবা বিশ্বাস করতেন জীবন অনন্ত, পথের কোন আরম্ভও নেই, শেষও নেই। তিনি যেখানে থেমেছিলেন, আমি সেখান থেকে শুরু করে কিছু পথ হাঁটলাম মাত্র। পথ তো পড়ে রইল সামনে-হয়তো ভবিষ্যতে এখান থেকে কেউ আরম্ভ করবে-

বই প্রকাশিত হইবার পর পাঠকমহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। কেহ বলিল—চমৎকার হয়েছে। অপূর্ববাবুর ফিলজফির সঙ্গে অদ্ভুতভাবে সঙ্গতি রেখে লিখেছেন লেখক। অথচ নকলনবিশী নয়—ভাষায় স্পষ্ট স্বকীয়তা আছে। কেহ বলিল-প্রথম থেকেই লক্ষ করা যাচ্ছিল লেখক বাবার নাম ভাঙিয়ে খেতে চান, এই উপন্যাস রচনা সে পথেই আর একটি পদক্ষেপ।

সমালোচনা যেমনই হোক, প্রথম মাসে উপন্যাসটির পাঁচশত কপি বিক্রয় হইয়া গেল। তাহার পর বিক্রি কিছুটা কমিলেও মোটামুটি কাটতি বজায় রহিল। দ্বিজেনবাবু বলিলেন—বিরূপ সমালোচনায় ভেঙে পড়বে না। মনে রেখ, বিরূপ সমালোচনাও একটা প্রচার। আসল মতামত দেবে পাঠকেরা— দেখা যাক তারা কী বলে?

www.bengaliebook.com

প্রথমদিকের দ্রুত বিক্রিব কাছাকাছি আর না পৌঁছাইলেও বইখানা একেবারে গুদামে পড়িয়া রহিল না, কিছু কিছু বিক্রি হইতেই লাগিল।

এইসময় ডাকে তাহার নামে একদিন একখানা খাম আসিল।

কলিকাতা হইতে একটি মেয়ে চিঠি লিখিয়াছে। তাহার পরিবাবের সকলে কাজলের বই পড়িয়া অবাক হইয়া গিয়াছে। ভূমিকার শেষে যে ঠিকানা ছিল সেই ঠিকানা ব্যবহাব করিয়া চিঠি লিখিতেছে। তাহারা কী একবার বাড়িতে আসিয়া লেখকের সহিত আলাপ করিতে পারে?

পারে বইকি, নিশ্চয় পারে। ব্যস্ত হইয়া কাজল স্নান-খাওয়া না সারিয়াই বাহির হইয়া পোস্ট অফিসে গেল এবং সেখানে দাঁড়াইয়াই পত্রের উত্তর দিযা আসিল।

দিনদশেক বাদে এক রবিবার সকালে একজন মধ্যবয়স্ক সৌম্যমূর্তি ভদ্রলোক দুই মেয়ে লইয়া আসিয়া হাজির হইলেন। মেয়েরা স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়ে, তাহাদের আচরণ সহজ ও সপ্রতিভ। ভদ্রলোক সরকারি চাকরি হইতে সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাহারা সকলেই অপুর্বকুমার রায়ের লেখার পরম ভক্ত। বিজ্ঞাপন দেখিয়া প্রথমে বিশ্বাস করেন নাই যে অপূর্ব রায়ের ছেলের উপন্যাস বিশেষ কাজের কিছু হইবে। যাহা হৌক, কৌতূহল হওয়ায় কিনিয়া পড়িয়াছেন এবং আশ্চর্য হইয়া গিয়াছেন।

মেয়ে দুটি মুগ্ধ চোখে কাজলের দিকে তাকাইয়া ছিল। ভদ্রলোক থামিতে তাহাদের মধ্যে বড়োজন বলিল—আমাদের দুইবোনে ঝগড়া হত আপনার বইখানা কে আগে পড়বে তাই নিয়ে। তারপর ঠিক করে নিলাম—একঘণ্টা আমি পড়বো, একঘণ্টা বোন পড়বে—

www.bengaliebook.com

ছোটজন বলিল—আমরা আগে কখনও এত কাছে থেকে লেখক দেখিনি, জানেন? বাবা দেখেছেনবাবার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আলাপ ছিল-

ভদ্রলোক সবিনয়ে বলিলেন-না না, আলাপ নয়। আমার এক বন্ধুর বাবা নামকরা কবিরাজ ছিলেন। তিনি শরৎচন্দ্রের চিকিৎসা করতেন। তার সঙ্গে একবার শরৎবাবুর বাড়ি গিয়েছিলাম। তখন তিনি বেশ অসুস্থ, বসে গল্প করার মতো অবস্থা ছিল না। তবে হ্যাঁ, কাছে বসে ছিলাম ঘণ্টাখানেক। সেটাও কম কথা নয়, বলুন-

—তা তো বটেই, বড়ো মানুষের কাছে বসে থাকাই আনন্দ

—আমার তো মনে হয় শরৎবাবুর পর আপনার বাবার মতো সাহিত্যিক বাংলা ভাষায় আর আসেন নি। তার ছেলে আপনি-বইখানা পড়ে সত্যিই আমরা-

ছোটমেয়ে তাহার বইখানি এককপি লইয়া আসিয়াছিল। সেটি বাড়াইয়া ধরিয়া বলিল-আমাদের দুজনের জন্য এতে কিছু লিখে আপনার সই দেবেন দয়া করে?

অটোগ্রাফ! জীবনে ইহাও সম্ভব হইল!

অপুর প্রথম উপন্যাসের শেষপাতা হইতে দুইটি প্রিয় লাইন লিখিয়া নিচে কাজল নিজের নাম স্বাক্ষর করিল। জীবনের প্রথম অটোগ্রাফ।

জলখাবার খাইয়া পিতা-পুত্রীরা চলিয়া গেল বটে, কিন্তু ব্যাপারটার অনুরণন সারাদিন কাজলের মনের মধ্যে বাজিতে লাগিল।

আরও অনেক লিখিতে হইবে। অনেক-অনেক ভালো লেখা।

www.bengaliebook.com

তাহার সময় হঠাৎ খুব কমিয়া গেল। স্কুল তো আছেই, তার উপর অপুর বইগুলির ব্যাপারে নানা কাজে ব্যস্ত থাকিতে হয়। নিজের লেখার জন্য যতখানি সময় দেওয়া প্রয়োজন তত সময় হাতে পাওয়া কঠিন হইয়া পড়িতে লাগিল। প্রায় প্রতিদিনই কয়েকজন করিয়া লোক আসে সাহিত্যিক অপূর্ব রায়ের স্ত্রী-পুত্রের সহিত আলাপ করিতে। ছুটির দিনে তাহার সংখ্যা বাড়ে। লিখিতে লিখিতে মাঝপথে উঠিয়া অতিথিসৎকার করিতে হয়। দেড়ঘণ্টা বাদে আবার লিখিতে বসিয়া সে আবিষ্কার করে গল্পটা মাথা হইতে অতিথিদের সহিত বিদায় লইয়াছে। অনেক প্রচেষ্টায় সেটিকে ফিরাইয়া আনিয়া দশলাইন লিখিতে না লিখিতে আবার দরজাব কড়া নড়িয়া ওঠে।

কিছুদিন আগে একদল ফিলমের লোক আসিয়াছিল। তাহারা অপুর প্রথম উপন্যাসখানি অবলম্বনে একটি ফিল্ম তুলিতে চায়। একজন মধ্যবয়স্ক বিরলকেশ সতর্ক চেহারার মানুষ তাহাদের দলপতি। তিনিই নাকি ডিরেকশন দিবেন। ভদ্রলোক মাথা চুলকাইয়া কিঞ্চিৎ ইতস্তত করিয়া বলিলেন– অপূর্ববাবুর লেখা তো এখন খুবই পপুলার। তবে কিনা, জানেন তো– সাহিত্যের ভাষা আর ফিল্মের ভাষায় কিছুটা পার্থক্য আছে। অপূর্ববাবু ছিলেন খাঁটি সাহিত্যিক, উনি তো আর ওঁব গল্প ফিল্ম হবে এ ভেবে লেখেন নিকাজেই ছবির খাতিরে গল্পের কয়েকটা জায়গা–মানে খুব সামান্যই– অদলবদল করতে হতে পারে। আমি এইরকম ভাবে ভেবেছি।

পরের পনেরো মিনিট ধরিয়া ভদ্রলোক কাজল ও হৈমন্তীকে যে কাহিনী শোনাইলেন, তাহা তাহার নিজের অপ্রকাশিত রচনা হইতে পারে, আজারবাইজানের উপকথা হইতে পারে কিন্তু কোনোমতেই অপুর উপন্যাস নহে।

হৈমন্তী নরম স্বভাবের হইলেও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তেজ প্রকাশ করিতে পারে। সে দৃঢ়স্বরে বলিল–এ একেবারে অন্যরকম গল্প বলে মনে হচ্ছে, আমি এতে

www.bengaliebook.com

মত দিতে পারি না। তাছাড়া আমার স্বামীর ধারণা ছিল ওঁর এই লেখাঁটির চলচ্চিত্র হতে পারে না। তবু আপনারা অতিথি, কষ্ট করে এসেছেন, তাই আপনাদের কথা শুনলাম। কিন্তু ছবি করবার অনুমতি আমি দেব না।

পরিচালক বলিলেন—আমরা কিন্তু ভালো টাকা দেব-

হৈমন্তী বলিল—আপনার একথা অত্যন্ত অপমানজনক। আমার স্বামী তার বইগুলিকে নিজের সন্তান বলে মনে করতেন। আমিও তাই। টাকার জন্য কেউ নিজের সন্তানকে বিক্রি করে না। আচ্ছা নমস্কার—আমি ভেতরে যাচ্ছি। ডাল বসিয়ে এসেছিলাম, পুড়ে যাবে-

ভিতরের ঘরে যাইবার মুখে দরজার কাছে ফিরিয়া হৈমন্তী কাজলকে বলিল—তুমি এঁদের মিষ্টি আর চা দেবার ব্যবস্থা করো-

পরিচালক রুমাল দিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া বলিলেন—আপনি যদি দয়া করে আপনার মাকে একটু বুঝিয়ে বলতেন—

কাজল বলিল-কিছু মনে করবেন না, মায়ের কথাই শেষ কথা। তাছাড়া আমিও মায়ের সঙ্গে একমত। আমার কিছু করবার নেই।

ফিমের দল একপ্রকার রাগ করিয়াই জলখাবারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়া গেল।

www.bengaliebook.com

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

প্রগাঢ় বসন্তে কাজল বিমলেন্দু রায়চৌধুরীর চিঠি পাইল।

বিমলেন্দু বিদেশ হইতে আস্তানা গুটাইয়া দেশে ফিরিয়াছেন এবং কলিকাতায় বাড়ি ভাড়া লইয়া আছেন। কাজল কী তাহার সঙ্গে একবার দেখা করিতে পারে? তাহার বিশেষ প্রয়োজন।

অনেক ভাবিয়া কাজল চিঠির ব্যাপারটা আপাতত মাকে জানাইল না। দেখা যাক বিমলেন্দু কী বিষয়ে আলোচনা করেন। প্রয়োজন বুঝিলে পরে মাকে বলা যাইবে।

কিছুটা খুঁজিয়া বাড়ি বাহির হইল। ভবানীপুরে বড়ো রাস্তা হইতে ভিতরে গলির মধ্যে বাড়ি। ঢুকিবার দরজা দেখিয়া বোঝা না গেলেও ভিতরে বেশ অনেকখানি জায়গা। চতুষ্কোণ উঠানের বাঁদিকে বসিবার ঘর, কয়েকধাপ সিমেন্ট বাঁধানো সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে হয়। কাজল লক্ষ করিল, কাশীতে সে যে আসবাবগুলি দেখিয়াছিল তাহার মধ্যে কয়েকটি এই ঘরে রহিয়াছে। কাশীর বাড়ি কী ইহারা বিক্রি করিয়া দিল নাকি?

একজন পরিচারিকা তাহাকে বসাইয়া বাড়ির ভিতরে খবর দিতে গেল।

কাজলের বুকের ভিতর অদ্ভুত অনুভূতি হইতেছিল। তুলি এখানে আছে কী? বোধহয় আছে। বিমলেন্দু এতদিন পরে দেশে ফিরিয়া কী আর তাহাকে দূরে রাখিবেন? থাকিলেই বা কী? উহারা তো আর তুলিকে সাজাইয়া গুছাইয়া কাজলের সঙ্গে গল্প করিবার জন্য বাহিরের ঘরে পাঠাইয়া দিবে না। ওসব কথা ভাবিয়া লাভ নাই।

www.bengaliebook.com

এমন সময় বিমলেন্দু ঘরে ঢুকিলেন। কাজল দেখিল তিনি বিদেশ হইতে সাহেব হইয়া ফেরেন নাই। তাহারা পরনে ধুতি ও হাতকাটা ফতুয়া গোছের জামা। তবে মানুষটি সুন্দর, সাধারণ পোশাকেও তাহার ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।

কাজল উঠিয়া তাহাকে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে তিনি তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। প্রাথমিক আবেগ কমিলে কাজলকে বসাইয়া নিজেও একখানি চেয়ারে বসিলেন। বলিলেন–এবার একেবারে বরাবরের মতো ওদেশের পাট তুলে দিয়ে এলাম, বুঝলে? যতই যা বল, নিজের দেশের মতো কিছু না। তোমার মা ভালো আছেন?

নিজের বিদেশে বসবাস এবং ভবিষ্যতে কী করিতে চান সে বিষয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করিবার পর বিমলেন্দু বলিলেন–তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কিছু মনে করবে না তো?

কাজল বলিল–না না, মনে করব কেন? আপনি বলুন–

–তোমার মা কী রকম মানুষ?

প্রশ্ন শুনিয়া কাজল অবাক হইল। হঠাৎ এ প্রশ্নের অর্থ কী? সে বলিল–আজ্ঞে, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আপনি কী জানতে চাইছেন। মা খুবই ভালো মানুষ–

–আমি আসলে ঠিকভাবে প্রশ্নটা করতে পারছি না। নো অফেন্স–আমি আজ তোমার সঙ্গে একটা খুব জরুরি বিষয়ে আলোচনা করতে চাই। সেটা করতে গেলে তোমার মায়ের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি জানা থাকলে ভালো হত। উনি কী খুব অর্থোডক্স?

বিমলেন্দু কী বিষয়ে আলোচনা করিবেন কাজল তাহা বেশ বুঝিতে পারিল। সে বলিলআপনি যদি মায়ের ধর্মবিশ্বাস বা সামাজিক আচারের প্রতি নিষ্ঠার কথা জানতে চান তাহলে বলতেই হবে—আমার মা কিছুটা রক্ষণশীল। তিনি অনুদার বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন নন, কিন্তু পারিবারিক বা সামাজিক কোনো প্রথাকে হঠাৎ ভাঙতেও পারেন না। মধ্যবিত্ত পরিবারে একজন সাধারণ মহিলা যেমন হন।

বিমলেন্দু কাজলের দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিলেন, তারপর বলিলেন- তুমি বুদ্ধিমান। সম্ভবত বুঝতে পেরেছ আমি কী বলতে চাই। যাক, তাতে ভালোই হল, এমনিতে আমার কথা শুরু করতে সংকোচ হচ্ছিল।

কাজল কথা না বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বিমলেন্দু বলিলেন-তুলিকে তুমি দেখেছ, বাই এনি স্ট্যাণ্ডার্ড, তাকে সুন্দরী বলতেই হবে। ঘরের সব কাজ জানে—যেটুকু জানে না, শিখে নিতে পারবে। তাছাড়াও মায়ের একটা গুণ ও পেয়েছে, তা হল সেসিটিভ মন। তুলি বই পড়ে, ভালো গান করে। কিন্তু এত গুণ থাকা সত্ত্বেও ওর বিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন হবে। হিন্দুসমাজে আমরা মানুষকে উদার মুক্তির আলো দেখাতে পারিনি, কিন্তু নানা নিয়মের নিগড়ে তাকে আচ্ছা করে বেঁধেছি। তুলির কোন দোষ নেই, কিন্তু তার মায়ের ভুলের কথা সমাজ মনে কবে রেখেছে। আমি দূরে কোথাও নিয়ে গিয়ে সমস্ত পুরোনো কথা গোপন করে তুলির বিয়ে দিতে পারি, কিন্তু এ ধরনের ব্যাপার চিরকাল চাপা রাখা যায় না, একদিন প্রকাশ হবেই-এবং হলে ওর জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। আর আমিও বিবাহের মতো পবিত্র ব্যাপারে মিথ্যাচরণ করতে চাই না। এত কথা তোমাকে বলতাম না, কিন্তু তোমার বাবা তুলির ভবিষ্যৎ জীবনের অসহায়তার কথা আন্দাজ করে আমার কাছে একটা ইচ্ছে প্রকাশ করে গিয়েছিলেন, তুমি কি সে বিষয়ে কিছু জানো?

কাজল বলিল–জানি। বাবার ডায়েরিতে পড়েছি।

-মায়ের অপরাধে যেমন মেয়ের কষ্ট পাওয়া অনুচিত, তেমনি বাবার কোনো ইচ্ছের বোঝ ছেলেব ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। পুরোনো কোনো ঘটনার জের না টেনেই আমি সামাজিকভাবে তোমার সঙ্গে তুলির বিবাহের প্রস্তাব করছি। এ বিষয়ে তোমার মতটাই আমি আগে জানতে চাই, বলো তোমার কী মত–

গলির মধ্যে একটা ফেরিওয়ালা সুর করিয়া কী যেন হাঁকিতেছে। ঘরের দরজায় পাপোশের উপর হলুদ আর কালো লোমওয়ালা একটা মেনিবেড়াল শান্তভাবে বসিয়া আছে। বিমলেন্দু তর্জনী দিয়া টেবিলের ওপর অদৃশ্য নকশা আঁকিতেছেন। কাজলের মনে হইল সমস্ত পৃথিবী তাহার উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে। জগৎসংসার দুইটি সম্ভাবনার দরজায় দাঁড়াইয়া, তাহার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে যে কোনো একটা পথ বাছিয়া চলিতে শুরু করিবে।

কাজল বলিল–আপনার সঙ্গে আমি বন্ধুর মতো কথা বলতে পারি?

বিমলেন্দু হাসিলেন। বলিলেন–পারো।

-তবে আমাকে কিছুদিন সময় দিন। আমাকে ভাবতে হবে।

বিমলেন্দু বোধহয় একটু ক্ষুন্ন হইলেন। তিনি হয়তো আশা করিয়াছিলেন কাজল আজই তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি জানাইবে। কিন্তু তিনি সহজভাবেই বলিলেন–বেশ তো, ভাবো। একটা কথা তোমাকে বারবার বলছি-এই ব্যাপারে তোমার কোনো নৈতিক দায়বদ্ধতা নেই। তুমি না বলতেই পারো, এবং তা বললে আমাদের সম্পর্কের কোনোরকম অবনতি ঘটবে না। আর কিছু বলবে?

www.bengaliebook.com

কাজল বলিল–আমাকে ভুল বুঝবেন না। তুলির-তুলির মায়ের প্রসঙ্গে যদি কোনো সামাজিক অসুবিধা থাকে, তবে আমি তার পরোয়া করি না। আমি সেজন্য সময় নিচ্ছি না, অন্য বিষয়ে আমার কিছু সিদ্ধান্ত নেবার আছে। কিন্তু–

বিমলেন্দু কাজলের দিকে তাকাইলে।

কাজল বলিল–মাঝে মাঝে এসে আমি তুলির সঙ্গে দেখা করতে এবং কথা বলতে চাই। আমি কথা দিচ্ছি, আমি এমন কোনোভাবে মিশবে না যাতে তুলির বা আপনাদের পরিবারের সম্মানের কোনো ক্ষতি হতে পারে।

বিমলেন্দু কিছুক্ষণ মাথা নিচু করিয়া কী ভাবিলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন-কতদিন সময় তুমি চাও?

–অন্তত একবছর।

–বেশ, তাই হোক। একবছর আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব। আর তুমি আমার বাড়িতে এলে আমার দিক থেকে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু যে কারণে তুমি আসতে চাইছ সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে বলে মনে হয় না। তুলি খুব লাজুক মেয়ে, শী ওয়াজ রেইজ অ্যালোন ইন এ কনজারভেটিভ ওয়ে। তোমার কাছে তুলি ভোলামেলা হতে পারবে কী?

কাজল এ কথার উত্তর দিল না।

বিমলেন্দু একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন–দেখো চেষ্টা কবে।

কাজল বলিল–একটা কথা কিন্তু আগে থেকে পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন। একবছর পরে আমি বলতেও পারি।

বিমলেন্দু হাসিলেন। বলিলেন-তেমন সম্ভাবনার কথা আমার ভাবতে ভালো লাগছে না বটে, কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে তুমি অনেস্ট। যাক, অনেক কথা হল, এবার কিছু চা-খাবাব আনতে বলি-

কাজল উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল-না, আজ থাক। আর একদিন-

-তুলির সঙ্গে দেখা করবে?

সামান্য দ্বিধা করিয়া কাজল বলিল-না।

বিমলেন্দু বাহির দরজা পর্যন্ত তাহাকে আগাইয়া দিয়া গেলেন।

দুই-একটা খাঁটি পাগল না থাকিলে জীবন বিস্বাদ হইয়া যায়। সবাই হিসাব করিয়া চলিলে বা পাকা বৈষয়িক হইলে পৃথিবীতে বড়ো কাজ করিবে কাহারা? প্রকৃতির নিয়মেই প্রতি যুগে কিছু পাগল জমায়। জ্যোতিপ্রিয় এই ধরনের একজন পাগল। সে কাজলের সহিত এম.এ. পড়িত। লম্বা রোগা চেহারা, মাথার চুল অবিন্যস্ত। জামাকাপড়ের প্রতিও কোনো মনোযোগ নাই। ইস্ত্রিবিহীন প্যান্টের উপর যেমন তেমন একটা শার্ট চাপাইয়া ক্লাসে আসিত। একবার দুই পায়ে দুইরকম চটি পরিয়া ইউনিভার্সিটিতে সারাদিন দ্রষ্টব্য বস্তু হইয়া ছিল। জ্যোতিপ্রিয় ক্লাসের লেকচার বিশেষ শুনিত না, পেছনের বেঞ্চিতে বসিয়া নিবিষ্ট মনে মডার্ন এক্সপ্ল্যানেশন অফ ডারুইনিজম, থিয়োরী অফ এক্সপ্যান্ডিং ইউনিভার্স কিংবা কুক ভয়েজ পড়িত। সর্বদাই সে অন্যমনস্ক। কেহ কেমন আছ? জিজ্ঞাসা করিলে এমনভাবে অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকিত যে, তাহাকে বদ্ধ কালা অথবা পাগল ছাড়া কিছু ভাবিবার উপায় ছিল না। অথচ পাশ করিবার সময় সে কেশ ভালো নম্বর পাইয়া পরীক্ষার বেড়া উত্তীর্ণ হইয়া গেল। বহুদিন বিকালে কাজল তাহার সহিত খোলদীঘির ধারে বসিয়া

বা উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কতরকম গল্প করিয়াছে। ফিফথ ইয়ারে পড়িবার সময় একদিন জ্যোতিপ্রিয় বলিল–চল অমিতাভ, কিছু টাকা জোগাড় করে একবার উড়িষ্যার তালচের থেকে ঘুরে আসি

কাজল বলিল-বেড়ানো ভালো কথা, কিন্তু এত জায়গা থাকতে হঠাৎ তালচের কেন?

উৎসাহ পাইয়া জ্যোতিপ্রিয় বলিল–তালচেরে কতগুলো অদ্ভুত পাথরের খণ্ড আছে, জানো? জিওলজিস্টদের ভাষায় সেগুলো হচ্ছে এরাটিক বোল্ডার। অর্থাৎ ওই জায়গায় ওরকম পাথর থাকবার কথা নয়। চারদিকে কয়েকশো মাইলের মধ্যে নেই। তাহলে এই খাপছাড়া বহুটন ওজনের পাথরের টুকরো তালচেরে এলো কোথা থেকে? জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার বুলেটিনে ব্যাপারটা পড়ে অবধি মাথা খারাপ হয়ে আছে। যাবে?

কাজলের কাছে তখন টাকা ছিল না। জ্যোতিপ্রিয়রও বোনের বিবাহ সামনের মাসে। সব মিলাইয়া যাওয়ার ব্যাপারটা চাপা পড়িয়া গেল।

মাস ছয়েক বাদে কাজল লাইব্রেরিতে কী কাজে যেন গিয়াছিল, দেখিল জ্যোতিপ্রিয় এককোণে বসিয়া গভীর অভিনিবেশ সহকারে মোটা একখানা বই পড়িতেছে। কাজল পাশে গিয়া বসিতেও সে তাহাকে লক্ষই করিল না। খপ করিয়া বইটা কাড়িয়া লইতেই জ্যোতিপ্রিয় এই এই! কী হচ্ছে? বলিয়া ভয়ানক চমকাইয়া উঠিল, পরে কাজলকে দেখিয়া হাসিয়া বলিল–ওঃ, তুমি! দাও বইটা দাও–একটা দরকারি জায়গা পড়ছিলাম–

ফেরত দিবার সময় কাজল দেখিল বইখানার নাম স্টারস্ ইন দেয়ার কোর্সেস। সে বলিলব্যাপার কী? এখন আবার গ্রহনক্ষত্র নিয়ে পড়েছে নাকি?

www.bengaliebook.com

মাথা চুলকাইয়া জ্যোতিপ্রিয় বলিল-না, ঠিক গ্রহনক্ষত্র নয়—আসল ব্যাপারটা হল গিয়ে ডাইনোসোর।

আশ্চর্য হইয়া কাজল বলিল-ডাইনোসোর? তার মানে?

—-ডাইনোসোর জানো না? জুরাসিক-ট্রিয়াসিক যুগের যেসব বিশাল সরীসৃপ আজ থেকে ছসাতকোটি বছর আগে পৃথিবী কাঁপিয়ে বেড়াত—ব্রন্টোসোর, প্লেসিওসোরাস, টিরানোমোরাস রে —ছবি দেখনি?

–আহা, তা জানি। বলছি, হঠাৎ তাদের নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ যে?

জ্যোতিপ্রিয় চেয়ারে হেলান দিয়া স্বপ্নালু চোখে এমনভাবে সামনের দিকে তাকাইল, যেন সে সাতকোটি বৎসর আগের পৃথিবীটাকে দেখিতে পাইতেছে। চুলের মধ্যে অন্যমনস্কভাবে হাত বুলাইয়া সে বলিল-কয়েক কোটি বছর ধরে পৃথিবীতে রাজত্ব করার পর ডাইনোসোরের দল খুব কম সময়ের মধ্যে একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়। কেন, তার কোনো সঠিক উত্তর বৈজ্ঞানিকেরা দিতে পারছেন না। এই ব্যাপারটা আমাকে খুব ভাবাচ্ছে—

কাজল বলিল-কোনোরকম মহামারী হয়েছিল হয়তো।

—না, তা সম্ভব নয়। মহামারী হলে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে একটা প্রাণীদল এমন নিঃশেষে সুপ্ত হয়ে যায় না। এখানে ওখানে দুএকটা থেকে যেত, তার থেকে আবার বংশবৃদ্ধি ঘটত। এর মধ্যে অন্য কোনো রহস্য আছে-

সাতকোটি বছর আগে ডাইনোসোরেরা কেন মরিয়া গিয়াছিল সে রহস্য ভেদ করিয়া এইমুহূর্তে বিশেষ কী লাভ আছে তাহা হঠাৎ বোঝা না গেলেও এই ধরনের কল্পনা চিরদিনই কাজলকে আকর্ষণ করে। সে বলিল-তোমার কী ধারণা?

-দুটো কারণ থাকতে পারে। আমার মনে হয় সে সময়ে আকাশে সৌরজগতের কাছাকাছি কোনো সুপারনোভার বিস্ফোরণ হয়েছিলনক্ষত্রদের জীবনের শেষদিকে এরকম হতে পারে, জানো তো? সেই বিস্ফোরণ থেকে কোনোরকম ক্ষতিকর রশ্মি এসে পৃথিবীতে পড়তে থাকে অনেকদিন ধরে। তাতেই এরা মারা পড়ে। এই মতবাদ নিয়ে লেখা একটা প্রবন্ধ পড়লাম ন্যাশনাল জিওগ্রাফি পত্রিকায়। তাই অ্যাস্ট্রোনমির বইপত্র ঘেঁটে দেখছি ওইসময় সত্যি কোনো সুপারনোভার বিস্ফোরণ হয়েছিল কিনা। দ্বিতীয় কারণটা শুনলে অবশ্য তুমি হাসবে-

-হাসবো কেন? তুমি বলো-

জ্যোতিপ্রিয় কাজলের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল—এটা অন্য গ্রহ থেকে আসা প্রাণীদের কীর্তিও হতে পারে-

অবাক হইয়া কাজল বলিল—তার মানে?

-আমার মনে হয় বিশ্বে আমরা একা নই, লক্ষ লক্ষ নীহারিকার কোটি কোটি গ্রহ-কোথাও না কোথাও নিশ্চয় বুদ্ধিমান প্রাণী আছে। তাদের ভেতর কোনো গোষ্ঠী মহাকাশযানে চেপে পৃথিবীতে এসেছিল। সে সময়ে পৃথিবীতে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু তারা ডাইনোসোরদের ভয়ে দিনেরবেলা মাটির তলায় গর্তে লুকিয়ে থাকে, রাত্তিরে চুপিচুপি বেরিয়ে খাবার সংগ্রহ করে আবার ঢুকে পড়ে গর্তে। নভোচারীরা বুঝতে পেরেছিল স্তন্যপায়ীদেরই একমাত্র ভবিষ্যৎ আছে। তাদের একটা সুযোগ দিলে একসময় তারাই পৃথিবী শাসন করবে, উন্নত সভ্যতা গড়বে। তাই অন্য গ্রহমণ্ডলী থেকে আসা নভশ্চরেরা ডাইনোসরদের কোনোভাবে খতম করে দিল-

www.bengaliebook.com

কাজল বলিল—এর থেকে আর একটা সিদ্ধান্তেও আসা যায়—

জ্যোতিপ্রিয় আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল-কী? কী?

-যে তুমি একটা বদ্ধ উন্মাদ! আর সারবে না!

হতাশ ভঙ্গিতে চেয়ারে হেলান দিয়া জ্যোতিপ্রিয় বলিল-দাউ টু? সবাই আমাকে খেপায়, অপদার্থ বলে। তোমাকে আমি অন্য চোখে দেখি, তুমি কমন রান অফ পিপ-এর মধ্যে পড়ো না। তুমিও পেছনে লাগলে তো মুশকিল।

-তুমি আবার সিরিয়াসলি নিলে নাকি? দূর—আমি এমনি মজা করে বললাম বুঝতে পারলে না? আরে এইসব আনইউজুয়াল বিষয় নিয়ে ভাবনাচিন্তা করে বলেই তো তোমাকে এত ভালোবাসি।

জ্যোতিপ্রিয় উত্তেজিত হইয়া বলিল—ওইখানেই তোমাদেব সঙ্গে আমার বিবোধ। এগুলো কি আনইউজুয়াল চিন্তা হল? এগুলোই তো আসল ভাববার জিনিসচর্চা করবার বিষয়। এত বড়ো ব্রহ্মাণ্ডটার ভেতর আমরা বাস করছি—কে আমরা? কোথা থেকে সৃষ্টি হল এই বিশ্ব? এর কী কোনো মানে আছে? সার্থকতা আছে? নাকি আপনাআপনি জড়পদার্থের অন্ধ নিয়মে এর বিকাশ আর ধ্বংস হয়ে চলেছে? বরং জীবনের বাকি সব দিক—যার ওপর সাধারণ মানুষ সবচেয়ে বেশি জোর দেয়-যেমন ব্যবসা, রাজনীতি—সেগুলোই হচ্ছে আনইউজুয়াল! আর কবে যে মানুষের চোখ ফুটবে!

বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে কাজল জ্যোতিপ্রিয়র কথাই ভাবিতেছিল। ছেলেটা শত বিরুদ্ধতার মধ্যেও নিজের বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখিয়াছে। বরং সে নিজে কত বদলাইয়া গিয়াছে। জীবনরহস্যের যে আশ্চর্য ব্যঞ্জনা অস্তিত্বের প্রতিটি মুহূর্তকে সার্থক করিয়া তুলিত, তাহা যেন কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। আসলে

www.bengaliebook.com

প্রতিদিন বাঁচিতে বাঁচিতে জীবনটা বড়োই পরিচিত আর একঘেয়ে হইয়া যায়। ভয়ঙ্কর এই একঘেয়েমি হইতে মুক্তির মন্ত্র তাহার বাবা জানিত, বাবার সাহিত্যে, ডায়েরিতে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। সেও কী চেষ্টা করিলে পারিবে না? সে কী এমন আশ্চর্য সুন্দর জীবনটা গতানুগতিক সাংসারিকতার প্রবাহে ভাসাইয়া দিবে?

কাজল বুঝিল এই লড়াই যতদিন চলিবে, এই দ্বন্দ্ব তাহার মনের মধ্যে যতদিন কষ্ট দিবে, ততদিনই তাহার আশা। দ্বন্দ্ব কোনোদিন মিটিয়া গেলেই তখন সে বাবু অমিতাভ রায়, এম. এ.। ভালো পোশাক পরা, সুখাদ্যে লালিত শরীর লইয়া মোটরে চড়িয়া বড়ো চাকরি করিতে যাইবে।

ইস্কুলে কাজলকে বাংলা আর ইংরাজি দুই-ই পড়াইতে হয়। ক্লাস সিকসের শিবপ্রসাদ নামে ছেলেটা বাংলা রচনায় তাহার হাতে সর্বোচ্চ নম্বর পাইয়াছিল। বিষয়ছিল—বাংলার গ্রামে বর্ষাকাল। ছাত্রেরা কী লিখিবে কাজল তাহা জানে—আষাঢ় ও শ্রাবণ দুইমাস বর্ষাকাল। বর্ষায় গ্রামের পথে ভীষণ কাদা হয়। দিনরাত অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়ে। কালো মেঘের রুপ দেখিয়া কবি গাহিয়াহেন—এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা অক্ষয় বড়াল হইতে কিছুটা উদ্ধৃতি। ইহার বাহিরে কেহ বিশেষ কিছু লেখে না এবং মোটামুটি একটা নম্বর পাইয়া পাশ করিয়া যায়। কিন্তু ষান্মাসিক পরীক্ষার খাতা দেখিতে দেখিতে একটি ছাত্রের বাংলা রচনা কাজলকে আকৃষ্ট করিল। পড়িলেই, বোঝা যায় ছেলেটি মুখস্থ লেখে নাই, অন্য কাহারও লেখার সঙ্গে তাহার মিলও নাই। নিজের ভাষায় লিখিতে গিয়া প্রকাশভঙ্গি এবং বানানে কিছু ভুল হইয়াছে সত্য, কিন্তু রচনার অনাড়ম্বর সারল্য কাজলের ভালো লাগিল। ছাত্রটি কোনো কবিতা হইতে উদ্ধৃতিও দেয় নাই। পাতা উলটাইয়া নাম দেখিল শিবপ্রসাদ সেন।

খাতা দেখা হইলে ক্লাসে ক্লাসে ছাত্রদের দেখাইবার নিয়ম আছে, যাহাতে তাহারা নিজের ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইতে পারে। তিন-চারদিন পর ক্লাস সিসে খাতা দেখাইবার সময় কাজল জিজ্ঞাসা করিল—শিবপ্রসাদ কার নাম?

একটি শ্যামবর্ণ, দুর্বল চেহারার বালক পেছনের বেঞ্চি হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার চোখেমুখে ত্রাসের চিহ্ন। মাস্টারমশায়েরা কোনো কারণে ডাকিলে সচরাচর তাহার ফল ছাত্রের পক্ষে সুখপ্রদ হয় না।

—আমি স্যার, আমার নাম শিবপ্রসাদ-

-বেশ ভালো রচনা লিখেছ তুমি। এই নাও, খাতা নিয়ে যাও—কিছু কিছু বানান ভুল আছে, দেখে নিয়ে। বাড়িতে কার কাছে পড়ো?

—আমি নিজেই পড়ি স্যার, আমার প্রাইভেট টিউটর নেই।

—বেশ। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমার বাড়িতে সন্ধের দিকে গিয়ে পড়া দেখে নিতে পারো। আমার বাড়ি চেনো তো?

-হ্যাঁ স্যার।

বেশির ভাগ ছাত্রই এই ধরনের সুযোগ পাইলে শিক্ষকের কাছে নিজের আগ্রহ প্রমাণ করিবার জন্য একেবারে জ্বালাইয়া মারে। নিজের অভিজ্ঞতা হইতে কাজল তাহা জানে। কিন্তু শিবপ্রসাদ বয়সে ছোট হইলেও তাহার পরিমিতিজ্ঞান প্রশংসনীয়। সে প্রত্যহ সন্ধ্যায় নিজের বাহাদুরি দেখাইবার জন্য গাদা গাদা অপ্রয়োজনীয় নোট আর রচনা লিখিয়া কাজলকে দেখাইতে আনিল না। কাজল বলিবার দিন পনেরো পর একদিন সে লাজুক মুখে আসিয়া বসিবার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইল। কাজল টেবিলে বসিয়া অপুর এক প্রকাশকের চিঠির উত্তর লিখিতেছিল, মুখ তুলিয়া বলিল—ও, তুমিএসো,

www.bengaliebook.com

বোলো ওই তক্তাপোশে। বই দেখবে? তুমি বরং তাক থেকে যে কোনো বই নামিয়ে দেখ, আমি ততক্ষণ এই চিঠিটা একটু লিখে নিই–

চিঠি লেখা হইলে খামে বন্ধ করিয়া কাজল দেখিল শিবপ্রসাদ সেই মাসের ওয়াইড় ওয়ার্লড় ম্যাগাজিনটি লইয়া গভীর মনো্যোগের সহিত ছবি দেখিতেছে।

কাজল বলিল–কী পড়ছো দেখি? ও, ওই দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলে অ্যাভেঞ্চার! পড়ে মানে বুঝতে পারছো?

শিবপ্রসাদ বলিল–না স্যার। তারপর বলিল–ছবিগুলো খুব সুন্দর।

-হ্যাঁ, ওর সব কিন্তু ফোটোগ্রাফ নয়, মানে ক্যামেরায় তোলা নয়, অনেক হাতে-আঁকা ছবিও আছে। এটা খুব নামকরা বিলিতি পত্রিকা, বুঝলে? নানারকম সত্যি ঘটনা এতে থাকে। আমার বাবা পড়তেন, এখন আমিও রাখি

শিবপ্রসাদ ইংরাজি বাকরণের টেন লইয়া গোলমালে পড়িয়াছিল, তাহাই কাজলের কাছে বুঝিয়া লইতে আসিয়াছে। কিছুদূর পড়াশুনা হইলে কাজল বলিল–আজ এই পর্যন্ত থাক, একদিনে টেন শেখা যায় না, মাথা গুলিয়ে যাবে। বোস, তোমাকে কিছু খেতে দিই-

বাড়ির ভিতর হইতে প্লেটে করিয়া কলা, দুইখানি ব্রিটানিয়া বিস্কুট এবং একটি সন্দেশ আনিয়া কাজল ছাত্রকে খাইতে দিল। শিবপ্রসাদ প্রথমে কিছুতেই খাইতে রাজি হয় না, পরে কাজলের ধমক খাইয়া প্লেট হাতে নিল। কাজল তাহাকে পত্রিকা হইতে ছবি দেখাইয়া মেরুভক, মিশরে ফারাও খুফুর পিরামিড, অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে দিকহারা পর্যটক ইত্যাদির কাহিনী মুখে মুখে সহজ করিয়া শোনাইল। শিবপ্রসাদ বেশ বুদ্ধিমান ছেলে, গল্প শুনিতে

www.bengaliebook.com

শুনিতে সে যে দুএকটি প্রশ্ন করিল তাহা হইতেই কাজল সে কথা বুঝিতে পারিল। মাসখানেক বাদে কাজল একদিন তাহাকে সঙ্গে লইয়া গ্রামের পথে বেড়াইতে গেল। ছাত্রকে অনেক পাখি আর গাছপালা চিনাইয়া দিল।

সেবার বার্ষিক পরীক্ষায় শিবপ্রসাদ বেশ ভালো ফল করিয়া প্রমোশন পাইল। কাজলের মনে হইল একটু সাহায্য ও সঠিক নির্দেশ পাইলে ছেলেটি ম্যাট্রিকে যথার্থ ভালো ফল করিবে। স্কলারশিপ পাইলে কলেজে পড়িবারও অসুবিধা হইবে না।

কিন্তু ক্লাস এইটে পড়িবার সময় শিবপ্রসাদ হঠাৎ পরপর কয়েকদিন স্কুল কামাই করিল। অসুখবিসুখ করিল নাকি? দিনসাতেক দেখিয়া কাজল ক্লাসে জিজ্ঞাসা করিল—তোমরা কেউ কী শিবপ্রসাদের বাড়ি চেনো? ওর কী হয়েছে বলতে পারো? বেশ কিছুদিন স্কুলে আসছে না-

পরিতোষ নামে একটি ছেলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—আমার বাড়ি স্যার শিবুদের পাড়ায়। শিবুর বাবার খুব অসুখ, সেইজন্য স্যার ও আসছে না।

-অসুখ? কী হয়েছে?

—তা তো জানি না স্যার, তবে খুব অসুখ-

ছেলেটির কাছ হইতে ঠিকানা জানিয়া কাজল বিকালে শিবপ্রসাদেব বাড়ি খুঁজিয়া বাহিব করিল। ডাকাডাকি কবিতে শিবু বাহির হইয়া কাজলকে দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেল। কোথায় বসাইবে, কী করিবে ভাবি পায় না। পরে বারান্দার কোণে একটা নড়বড়ে চৌকিতে গবুকে বসিতে দিয়া দৌড়াইয়া মাকে ডাকিয়া আনিল। শিবুব মায়ের বয়েস বছর ত্রিশ কী বত্রিশ হইবে। একসময়ে হয়তো দেখিতে ভালো ছিলেন, দারিদ্র্য ও অতিরিক্ত পরিশ্রম

www.bengaliebook.com

বর্তমানে চেহারার মাধুর্যটুকু হরণ করিয়াছে। তিনি কোনো কথা না বলিয়া দরজার পাল্লা ধরিযা দাঁড়াইয়া থাকিলেন। কাজল বলিল—আমাকে আপনি চিনবেন না, আমি শিবপ্রসাদের মাস্টারমশাই। ও আমার খুব প্রিয় ছাত্র। আজ কদিন স্কুলে যাচ্ছে না—ছাত্রদের কাছে খোঁজ নিয়ে জানলাম আপনার স্বামী অসুস্থ। আমার কাছে আপনি কোনো সংকোচ করবেন না, নিজের ভাই বলে মনে করবেন। যদি আমি কোনো কাজে আসতে পারি-

শিবুব মা কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাজল এতদিন ছাত্রের সংসারের খবর বিশেষ কিছু জানিত না, এখন শুনিল শিবুর বাবা শহরের কোন এক লেদ কারখানায় কাজ করেন, বেতন সামান্যই। ছুটির পর খুচরা দু-একটা কাজ করিয়া সব মিলাইয়া কোনমতে চালাইয়া দেন। দিনদশেক আগে কাজ করিতে কবিতে হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া যান, কারখানার লোকেরাই ধরাধরি করিয়া বাড়ি পৌঁছাইয়া দেয়। জ্ঞান ফিরিবার পর শরীবের বাঁদিক সম্পূর্ণ অবশ হইয়া গিয়াছে, উঠিবার ক্ষমতা নাই। কারখানার মালিক এমনিতে লোক ভালো, পাওনা যাহা ছিল তোক মারফৎ পাঠাইয়া দিয়াছে। তাহা ভাঙাইয়াই বর্তমানে চলিতেছে বটে, কিন্তু আর কদিন চলিবে? চিকিৎসারও বিশেষ কিছু ব্যবস্থা করিয়া যায় নাই। মোড়ের মাথার হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারবাবু ভরসা।

কাজল বলিল—আমি কী একবার ওঁকে দেখতে পারি?

ভদ্রমহিলা ছেলেকে ইঙ্গিত করিতে শিবু কাজলকে ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। নিতান্ত নিম্ন মধ্যবিত্তের গৃহস্থালিচটা ওঠা সিমেন্টের মেঝে, দেওয়ালের দিকে তিনখানি তোবড়ানো রঙ ওঠা টিনের তোরঙ্গ একটার উপর একটা রাখা, তাহার উপর আঁকা গোলাপফুল মান হইয়া আসিয়াছে। ঘরের এক কোণ হইতে অন্য কোণ পর্যন্ত দড়ি টাঙানো, তাহা হইতে মলিন কিছু শাড়ি ধুতি গামছা ঝুলিতেছে। একটা কুলুঙ্গিতে সিঁদুরমাখা মাটির মূর্তি। মেঝেতে বসিয়া একটা বিড়াল রুটির টুকরা খাইতেছে।

www.bengaliebook.com

ঘরের কোণে চৌকিতে শিবুর বাবা শুইয়া আছেন। চোখ খোলা, মুখ ঈষংহ করা। বাঁ চোখের পাতা এমনভাবে অর্ধেক নামিয়া আসিয়াছে যে দেখিলে মনে হয় শায়িত ব্যক্তি কোনো একটা নিগূঢ় ঈঙ্গিত করিতেছেন। ঠোঁটও বাঁদিকে শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। কাজল পাশে গিয়া দাঁড়াইতে ভদ্রলোক বোধহয় তাহাকে কিছু বলিবার চেষ্টা করিলেন, গলা দিয়া একটা দুর্বোধ্য ঘড়ঘড় শব্দ বাহির হইল মাত্র। কাজল তাহার হাত ধরিয়া বলিল–থাক, আপনি কথা বলবেন না। আমি শিবুর স্কুলের মাস্টারমশাই। আপনার অসুখের খবর পেয়ে দেখতে এসেছি। ভয় নেই, ভালো হয়ে যাবেন–

শিবুর বাবার গলার মধ্যে আবার বিকৃত ঘড়ঘড় শব্দ হইল, দুর্বল ডানহাত দিয়া তিনি কাজলের হাত জড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিলেন। বেশিক্ষণ থাকিয়া রোগীকে উত্তেজিত করিয়া লাভ নাই, কাজল বলিল–আমি আজ যাচ্ছি, আবার আসব। আপনি বিশ্রাম করুন।

এক ডাক্তার বন্ধুকে লইয়া পরের দিন সন্ধ্যায় কাজল আবার শিবুদের বাড়ি গেল। বন্ধু রোগী দেখিয়া বলিল– সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়ে আংশিক পক্ষাঘাত দেখা দিয়েছে। আমি তো ভাই সাধারণ ডাক্তার, কোলকাতায় কোনো হাসপাতালে ভর্তি করে একজন নিউরোলজিস্টকে দেখালে ভালো হত-

কাজল বলিল–সেরে ওঠার সম্ভাবনা কতখানি?

-বলা কঠিন। অনেকে চিকিৎসায় বেশ উপকার পায়, আবার অনেকে-বুঝলে না? তবে আগের স্বাস্থ্য আর বোধহয় ফিরে পাবেন না–

বন্ধুর সুপারিশে কলিকাতার হাসপাতালে বেড় পাওয়া গেল, একখানা অ্যামবুলেনসও জোগাড় হইল। কিন্তু একমাস হাসপাতালে থাকিবার পর

www.bengaliebook.com

শিবুর বাবা যখন ফিরিলেন, দেখা গেল তাঁহার অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয় নাই। লাঠি ধরিয়া সামান্য চলাফেরা করিতে পারেন-চিকিৎসার ফলের মধ্যে এই। কথা জড়াইয়া গিয়াছে, নিকটজনেরা ছাড়া বুঝিতে পারেন না।

কাজল নিজের পকেট হইতে কিছু দিয়া, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া শিবুর মায়েব হাতে দিয়া আসিল। কিন্তু এভাবে কাহারও সংসার বাহির হইতে সাহায্য করিয়া চিরকাল চালানো যায় না। চাঁদাও যে খুব সহজে সংগ্রহ হইল এমন নয়। তাহার নিজের স্কুলের একজন প্রৌঢ় শিক্ষক তিনটি টাকা দিলেন বটে কিন্তু বলিলেন-আপনার কথা এড়াতে পারলাম না, তাই দিচ্ছি। নইলে এব কোনো মানে হয় না।

কাজল বলিল—সে কী কথা! আমাদেরই স্কুলের দরিদ্র ছাত্র, তার ফ্যামিলি একটা স্ট্রেসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে—এতে আমাদের কোনো কর্তব্য নেই?

-দেখুন সে কথা বলতে গেলে আমাদের ইস্কুলে আরও পঞ্চাশজন ছাত্র আছে যাদের পরিবার হয়তো এর চেয়েও ডায়ার স্ট্রেসের মধ্যে দিয়ে চলেছে। তাদের সবাব উপকার করার সাধ্য আপনার আছে? দেশের অগণিত দরিদ্র জনসাধারণের কথা ছেড়েই দিন। এখানে আপনার পার্সোনাল ইনভলভমেন্ট রয়েছে, আপনার প্রিয় ছাত্র-অন্যদের কী হবে?

কাজল রাগিয়া বলিল—এটা কী একটা যুক্তি হল? সবার জন্য করার শক্তি নেই বলে সামনে যে কষ্ট পাচ্ছে তাকেও সাহায্য করবো না? আমরা প্রত্যেকে নিজেদের পরিচয়ের গণ্ডীর মধ্যে যদি সেবার কাজ করি, তাহলে পৃথিবীটা বেটার প্লেস হয়ে উঠবে-

প্রৌঢ় শিক্ষক খড়কে দিয়া দাঁতের ফাঁক হইতে পানের কুচি বাহির কবিতে করিতে বলিলেন-ওসব ভাবজগতের কথা মশাই, আমাদের বাস্তবজগতে বাস

www.bengaliebook.com

করতে হয়। যাক, আপনার অনুরোধ রেখেছি, এবার আপনি দেশোদ্ধার করুন গে-

নেহাত শিবুদের এখন প্রতিটি টাকার প্রয়োজন, নতুবা কাজল ভদ্রলোকের চাঁদা ফেরত দিয়া দিত। কিন্তু সেদিনই সন্ধ্যায় যখন সে টাকাটা দিতে গেল, শিবু বলিল—স্যার, আপনি আর টাকা আনবেন না—

কাজল বলিল-তোমার বাবা যতদিন না ভালো হয়ে উঠছেন—মানে সংসার তো চালাতে হবে, তারপর না হয় আর নিয়ো না।

বাবা কবে ভালো হবেন কিছু ঠিক নেই। বাবার পুরোনো কারখানার ম্যানেজার আমাকে নিতে রাজি হয়েছে। ছমাস কাজ শিখতে হবে, হপ্তায় পনেরো টাকা করে পাবে। ঠিকমত কাজ শিখে নিতে পারলে তারপর থেকে হপ্তায় চল্লিশ টাকা।

—সে কী! তুমি আর পড়বে না?

-না স্যার। কাল থেকে কারখানায় যাবো বলে দিয়েছি-

শিবুর মা তাহার সাহায্যের জন্য অনেক ধন্যবাদ দিলেন, শিবুর বাবাও অর্ধোচ্চারিত জড়িত স্বরে নিজের কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিলেন। কিন্তু কাজল মনে একটা ঘোর অতৃপ্তি লইয়া বাড়ি ফিরিল। বর্তমান মুহূর্ত হইতে শিবপ্রসাদের ভবিষ্যৎ সে ছবির মতো স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে। নিজের বাবার জীবনেরই সে পুনরাবৃত্তি করিবে-কারখানায় চাকরি, বিবাহ, একগাদা বাচ্চা লইয়া অনটনের সংসার, তারপর একদিন অবসব অথবা অপারগতা জীবন শেষ!

অথচ তাহার জীবন অন্যরকম হইতে পারিত। ইহার জন্য কে দায়ী? দেশের সমাজব্যবস্থা? অর্থনীতি? যাহাই হোক, একটা জীবন তো নষ্ট হইয়া গেল।

www.bengaliebook.com

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অপুর প্রথম উপন্যাসটির খ্যাতি দিন দিন বাড়িতেছিল। সাধারণ সামাজিক উপন্যাস এবং জোলো প্রেমের কাহিনী পড়িতে পড়িতে বাঙালি পাঠক বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। শক্তিমান কয়েকজন তরুণ সাহিত্যিক এই অচলায়তন ভাঙিবার জন্য সাহসী ও বলিষ্ঠ এক নতুন রীতির আমদানি করিয়া লিখিতে শুরু করিলেন। এতাবৎকালে প্রাচীন নীতিবোধসম্পন্ন বাঙালি সমাজজীবনের যে গৃঢ় ও অন্ধকার কোণগুলি সঙ্গোপনে লুকাইয়া রাখা পছন্দ করিতেন, এই নতুন লেখকের দল প্রধানত তাহাকেই নিজেদের রচনার উপজীব্য কবিলেন। শরীর ও যৌনতা, অবৈধ প্রেম—এসব বিষয়ে স্পর্শকাতর মধ্যবিত্ত মূল্যবোধকে একেবারে ভিতর হইতে নাড়া দিবার জন্য ইহারা উদ্যোগী হইলেন। নীতিবাগীশের দল খেপিয়া আগুন হইলেন, তরুণের দল জয়ধ্বনিতে আকাশ মুখরিত করিল। কোনো কিছু লইয়া বিতর্ক উপস্থিত হইলে মানুষ স্বভাবতই কৌতূহলী হইয়া ওঠে। কাজেই এই তরুণ-সাহিত্য কিছুদিন বাজারে বেশ ভালো চলিল। কিন্তু একটানা কিছুকাল উত্তেজিত থাকিবার পর একটা ক্লান্তি আসে, কারণ উত্তেজনা জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা নয়। তখন একটু স্বস্তি, একটু আশ্রয় প্রয়োজন হইয়া পড়ে। অপুর উপন্যাসে তাহা ছিল। জীবনের সমস্ত অকারণ চাহিদা, বস্তুগত প্রাপ্তির জন্য নিরন্তর শ্রম এবং উচ্চকিত কলরবের বাহিরে, যেখানে শান্ত সৌন্দর্যের মধ্যে মানুষ নিজের প্রকৃত পরিচয় খুঁজিয়া পায়, অপুর রচনা পাঠককে সেই সমাহিত মগ্নতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাইয়া দেয়। পাঠক তাহার বই কাড়াকাড়ি করিয়া কিনিল না বটে, কিন্তু তাহার বিক্রি একটা নির্দিষ্টস্থানে আসিয়া স্থির হইয়া রহিল। ফলে নতুন সাহিত্যের তরুণ লেখকদের অনেককেই যখন পাঠকসমাজ বেমালুম ভুলিয়া গেল তখনও অপুর খ্যাতি এবং বইয়ের বিক্রি একটি স্থির বিন্দুতে অনড়।

www.bengaliebook.com

একদিন কাজলদের বাড়ির সামনে একখানা ঝকঝকে স্টুডিবেকার গাড়ি আসিয়া থামিল। বাদামী রঙের এরোপ্লেনের মতো দেখিতে লম্বা গাড়ি। স্টিয়ারিংয়ের পেছনে কেতাদুরস্ত উর্দি পরা চালক বসিয়া আছে। চালক নামিয়া দরজা খুলিয়া দিতে সাদা জামা-প্যান্ট-পরা এক ভদ্রলোক নামিলেন। ছুটির দিন সকাল, কাজল বারান্দায় দাঁড়াইয়া অবসরের আমেজ উপভোগ করিতেছিল। ভদ্রলোক তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন-আচ্ছা ভাই, সাহিত্যিক অপূর্বকুমার রায়ের বাড়িটা কোনদিকে বলতে পারেন?

কাজল একটু অবাক হইল। এতবড় গাড়ি চড়িয়া তাহাদের বাড়ি আসবার মতো অতিথি কমই আছে। সে বলিল—এটাই তার বাড়ি। আপনি কাকে চান?

—আমি একবার ওঁর—আচ্ছা আপনি কে?

—আমি ওঁর ছেলে।

-ওঃ, তাহলে তো খুব ভালোই হল। আপনিই কি ওঁর কপিরাইট হোল্ডার?

-না, আমার মা।

-আপনার মায়ের সঙ্গে একবার দেখা হতে পারে কী?

কাজল বলিল-আপনি ভেতরে এসে বসুন, আমি মাকে ডাকছি।

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকিয়া কাজলের বিছানা, টেবিল ও তাকের বইপত্র এবং চেয়ার ইত্যাদি একনজরে দেখিয়া লইয়া সন্তর্পণে চেয়ারে বসিলেন। টেবিলের উপর অকসফোর্ড লেকচার্স অন পোয়েট্রি বইখানা পড়িয়াছিল। সেটা তুলিয়া পাতা উলটাইতেছেন, এমন সময় হৈমন্তীকে লইয়া কাজল ঘরে ঢুকিল। ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বই রাখিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া নমস্কার করিয়া

বলিলেনআমার নাম রেবতী সেন, একটা বিশেষ দরকারে এসেছিলাম। আগে খবর না দিয়ে আসার জন্য আমি দুঃখিত-

হৈমন্তী বলিল—তাতে কী হয়েছে, আমরা অত ইংরেজি সামাজিকতা মানি না। আপনি বসুন—

বসিয়া ভদ্রলোক বলিলেন—আমার একটা গর্ব আজ ভেঙে গেল। আমার নামটা বলেই বুঝলাম আপনি আমাকে চিনতে পারেন নি। আমি ফিলম তুলি, আমার ছবি লোকে খুব দেখে। যেখানে যাই, নাম বললেই সবাই চিনে ফেলে। আপনি পারলেন না-

হৈমন্তী হাসিয়া বলিল—আপনি কিছু মনে করবেন না, আসলে আমি বা আমার ছেলে কেউই বায়োস্কোপ দেখি না-

ভদ্রলোকও হাসিলেন, বলিলেন না না, আমি কিছু মনে করিনি, বরং মজাই লাগছে। নিজের যথার্থ স্থান সম্বন্ধে সচেতন থাকাই ভালো।

কিছুক্ষণ সৌজন্যমূলক বার্তালাপ হইবার পর রেবতী সেন তাহার আসিবার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন। তিনি অপুর প্রথম উপন্যাসটির ছবি করিতে চান। ছবি দেখিবার অভ্যাস না থাকিলেও হৈমন্তী নিশ্চয় তাহার নির্মিত ‘সুখের সংসার’ বা ‘অশ্রুজলে’ লেখা বায়োস্কোপ দুটির নাম শুনিয়াছে? অপূর্ববাবুর গল্পটি হাতে পাইলে, তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি দর্শকদের কাঁদাইয়া পাগল করিয়া দিবেন। বিশেষ করিয়া গল্পের শেষে ছোট মেয়েটির মৃত্যুদৃশ্যে এমন একখানি করুণ গান জুড়িবার কথা ভাবিয়াছেন, যাহা আগামী দশবছরেও দর্শক ভুলিবে না। তাহার বলিতে সংকোচ হইতেছে, তবু তিনি বলিতেছেন, টাকার বিষয়ে হৈমন্তীর কোনো আশঙ্কার কারণ নাই। তিনি উপযুক্ত মূল্য দিবেন এবং নগদেই দিবেন।

মানুষটি ভদ্র। তাঁহার প্রার্থনার ভিতরেও দম্ভ বা ঔদ্ধত্য নাই। তিনি যেভাবে অপুর উপন্যাসের চিত্ররুপ দিবার কথা ভাবিয়াছেন, তাহার হাস্যকর দিকটাও তাহার নিজের কাছে স্পষ্ট নয়। নিজের অর্জিত সাফল্য সম্বন্ধে সরল তৃপ্তিবোধ এবং তার অসংকোচ প্রকাশ ছাড়া ভদ্রলোকের আচরণে চটিয়া উঠিবার মতো কিছু নাই।

হৈমন্তী বলিল–কিছু মনে করবেন না, এ গল্প আমি আপনাকে দিতে পারব না।

রেবতী সেন অবাক হইয়া বলিলেন–কেন? কেন বলুন তো?

–কারণ–কারণটা ব্যক্তিগতই ধরুন। আপনার আগেও দু-একজন এ গল্প চাইতে এসেছিলেন, তাঁদেরও আমি ফিরিয়ে দিয়েছি–

-সে জানি, তাদের নামও জানি। কিন্তু তারা আর আমি তো এক নই। আমার ছবি বাজারে আঠারো সপ্তাহের কম চলে না। লোকে আমাকেই চায়–

–আমাকে মাপ করবেন, আমি পারবো না।

আরও কিছুক্ষণ অনুরোধ-উপরোধের পর বিদায় লইবার সময় রেবতী সেন বলিলেনআমাকে আজ ফিরিয়ে দিলেন-বেশ, আমি চলে যাচ্ছি, কিন্তু একটা কথা বলে যাই, এ ছবি খুব শিগগিরই আপনাকে দিতে হবে–বেশিদিন আটকে রাখতে পারবেন না। এক একটা যুগে এক একটা শিল্পের জোয়ার আসে। এই যুগ হচ্ছে ফিমের যুগ। এর দাবিকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। আমাকে না হোক, অন্য কাউকে অনুমতি দিতেই হবে। আচ্ছা চলি-নমস্কার।

কিছুদিনের মধ্যেই কাজল আর হৈমন্তী রেবতী সেনের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিল। চলচ্চিত্র জগতে গোপনতা রক্ষা করা কঠিন। নামকরা কোনো প্রযোজক বা পরিচালক কোনো একটি গল্প সম্বন্ধে ভাবিতেছেন বলিয়া রটিলে অকস্মাৎ সেই গল্পটির জন্য একেবারে হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। কে কাহাকে ডিঙাইয়া গল্পটির স্বত্ব কিনিয়া ফেলিবে তাহার প্রতিযোগিতা চলে। মাসদেড়েক কাজলদের বাড়িতে খুব সিনেমার লোকের যাতায়াত চলিল। হৈমন্তীর একই উত্তর।

তারপর একদিন আসিলেন প্রত্যয় চৌধুরী।

ত্রিদিব মিত্র নামে একজন প্রকাশক অপুর প্রথম উপন্যাসখানির একটি কিশোরপাঠ্য সংস্করণ ছাপিয়াছিলেন। ভদ্রলোক রুচিবান, উচ্চশিক্ষিত। শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ে তাহার মৌলিক মতামত রহিয়াছে। বই ছাপা তাঁহার পেশা নয়, নেশা। মুদ্রণ পারিপাট্য, নির্ভুল ছাপা ও ধ্রুপদী গ্রন্থ নির্বাচনের জন্য মননশীল পাঠকমহলে তাহার খ্যাতি আছে। অপুর বই প্রকাশ করার সূত্রে কাজলদের পরিবারের সহিত তাহার পরিচয় জমিয়া উঠিয়াছিল। মাঝে মাঝে আসিয়া তিনি নানান গল্প শোনাইতেন। ইউকাটান অঞ্চলের অরণ্যে মায়া সভ্যতার পিরামিড, আদিম চিরোকী ইন্ডিয়ানদের আবাস টিপি তৈরি করিবার কৌশল, ইতালীতে প্রস্তুত কাঠেব গ্রামোফোন এবং বাঁশের পিনে বিঠোফেনের নাই স্মিফনি কেমন শোনায়, বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাস তৈরি করিবার সময় শিল্পীরা তাহাতে তেঁতুলবিচির গুঁড়ার প্রলেপ দিয়া কিভাবে তাসগুলিকে দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী করিবার কৌশল আবিষ্কার করিয়াছে ইত্যাদি। ত্রিদিব মিত্রই প্রত্যয় চৌধুরীকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। পরিচয় করাইয়া দিবার পর তিনি বলিলেন মিসেস বায়, আমি কিন্তু একটা বিশেষ কারণে একে নিয়ে এসেছি। অপূর্ববাবুর বইখানার ছোটদের সংস্করণের প্রচ্ছদ এবং ভেতরের ছবি সব এই প্রত্যয় এঁকেছে। এ খুব ভালো একজন শিল্পী। ওর পরিবারেরও একটা

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে, সে সব শুনবেন এখন। প্রত্যয় ফিলমের বিষয়ে খুব উৎসাহী, অপূর্ববাবুর প্রথম উপন্যাসখানি ও ছবি করতে চায়। এ প্রসঙ্গে আপনার কী মত?

হৈমন্তী হাসিয়া বলিল—মিত্রমশাই, আপনি তো জানেন আমার স্বামী তার এই বইটিকে সন্তানের মতো ভালোবাসতেন। ওঁর ধারণা ছিল—এবং আমারও ধারণা—এ বইয়ের ছবি করা যায় না। অনেক পরিচালক এসে গল্পের স্বত্ব কিনতে চেয়েছেন, তাদের আমি ফিরিয়ে দিয়েছি। টাকার জন্য কী সন্তানকে বিক্রি করা যায়, বলুন?

ত্রিদিব মিত্র বলিলেন-আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। টাকার জন্য এ কাজ করলে আপনার অখ্যাতি হত। তবে ছবি করা যায় না এ কথা ঠিক নয়। করা কঠিন, কিন্তু করা যায়। ভালো পরিচালকের হাতে পড়লে এ বই থেকে একটি অসাধারণ ফিলম হতে পারে।

-উনি এর আগে কী কী ছবি করেছেন?

—কোনো ছবিই করেনি। এটাই ওর প্রথম উদ্যোগ হবে। তাছাড়া ওর টাকাও নেই, কাজেই টাকার লোভে আপনি স্বত্ব দিচ্ছেন এ অপবাদও কেউ দিতে পারবে না।

-টাকার অসুবিধে থাকলে উনি ছবি করবেন কীভাবে? ফিলম তুলতে তো শুনেছি অনেক টাকা লাগে।

এবার প্রত্যয় চৌধুরী নিজে উত্তর দিলেন। তার কণ্ঠস্বর গম্ভীর এবং ব্যক্তিত্বপূর্ণ। কথা বলিবার এমন একটি অ-ত্বরিত ভঙ্গি আছে যাহাতে বক্তব্যের সমীচীনতা স্পষ্ট হইয়া ওঠে। তিনি বলিলেনএ ছবিতে খুব বেশি

www.bengaliebook.com

খরচ হবে না। দামি নায়ক-নায়িকা বা অভিনেতা কাউকেই আমার প্রয়োজন নেই। শুটিং হবে গ্রামে, শক্ত হাতে বাজেট করে নেব। আমার সামান্য কিছু জমানো টাকা আছে। তারপর দরকার হলে স্ত্রীর গয়না আছে, সেগুলো

হৈমন্তী প্রত্যয় চৌধুরীর দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনি এই ফিলমে গান রাখছেন তো?

কিঞ্চিৎ অবাক হইয়া প্রত্যয় চৌধুরী বলিলেন—গান? কোন্ সিচুয়েশনে?

-কেন, নায়কের বোনের মৃত্যুদৃশ্যে? সেখানে গান থাকবে না?

হৈমন্তীকে দেখিয়া এবং তাহার সঙ্গে কথা বলিয়া প্রত্যয় চৌধুরীর বোধহয় একটা সমপূর্ণ মনোভাব জন্মিয়াছিল, গানের প্রস্তাব শুনিয়া তাঁহার মুখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। হৈমন্তী বলিল- আগে যেসব পরিচালকেরা এ ছবি করতে চেয়েছেন তাঁরা কিন্তু গান বাখার কথা ভেবেছিলেন। তাই—

প্রত্যয় চৌধুরী হাসিলেন।

কথা একদিনে শেষ হইল না। নিজের সহজ বুদ্ধিকে প্রয়োগ করিয়া হৈমন্তী বুঝিতে পারিয়াছিল এই মানুষটি অন্য সকলের মতো নয়। কিন্তু সে দীর্ঘদিনেব দ্বিধা কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিল না। কিন্তু এমন সিদ্ধান্ত আছে যাহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হইয়া অন্য কেহ গ্রহণ কবিলেই ভালো হয়। হৈমন্তীর তেমন কোনো গুরুজন নাই। সে অনেক ভাবিল। বিঝুদ্ধে ও সপক্ষে যুক্তিগুলি মনের মধ্যে সাজাইয়া দেখিল, কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্তে আসিতে পাবিল না।

ত্রিদিব মিত্র ও প্রত্যয় চৌধুরী কিছুদিন বাদে-বাদেই আসাযাওয়া করিতে লাগিলেন। হৈমন্তী বুঝিল এ প্রসঙ্গ আর বেশিদিন মুলতুবি রাখা যাইবে না। জীবনে কোনো কোনো বিষয়ে ঝুঁকি লইতেই হয়। সম্ভাব্য পরিণতিগুলির মধ্যে

যেটির সবচেয়ে সফল হইবার সম্ভাবনা সেটিকে নির্বাচন করিয়া অগ্রসর হওয়াই ভালো। একদিন ছবির চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়া গেল।

পরের দিন কাগজে কোনো খবব বাহির হইল না, চুক্তিব কথা কযেকজন বাদে বিশেষ কেহ জানিলও না। কাজল, হৈমন্তী, প্রত্যয় চৌধুরীকেহই আন্দাজ করিতে পারিল না দেশের শিল্পসংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হইল। সে দিন আসিতে আরও দুই তিন বৎসর বিলম্ব ছিল।

শুটিং শুরু হইল কলিকাতা হইতে মাইল ত্রিশেক দূরে এক গ্রামে। ছবি তোলাব দলের সবাই সমান উৎসাহী। সবাই মনপ্রাণ দিয়া কাজ করিতে লাগিল। কিছুদুর কাজ অগ্রসর হইলে প্রত্যয় চৌধুরী কাজল আর হৈমন্তীকে কলিকাতা লইয়া যান, যতখানি ছবি উঠিয়াছে সেটুকু প্রোজেক্ট করিয়া দেখান, বিশেষ করিযা হৈমন্তীর মতামত মনোযোগ দিয়া শোনেন। হৈমন্তী একদিন তাহাকে বলিল– আমি নিতান্ত সাধারণ গৃহবধু, আমার জ্ঞানবুদ্ধির সীমা আমি তো ভালো করেই জানি, আমার মতামত আপনি জানতে চাইছেন কেন?

প্রত্যয় চৌধুরী বলিলেন–আপনার মতই আসল মত। সমালোচকদের পাণ্ডিত্য তাদের চোখের সামনে একটা আররণ তৈরি করে, আপনি কিন্তু সহজ সত্যটা দেখতে পান। প্রায় অর্ধেক ছবি তো হয়ে গেল, আপনার কেমন লাগছে?

-খুব ভালো। ত্রিদিববাবুর ওপর আমাদের বিশ্বাস আছে, এখন দেখছি তিনি ভুল লোক নির্বাচন করেন নি। কিন্তু–

-কিন্তু কি?

–আমার ভয় হচ্ছে আপনার এ ছবি সাধারণ মানুষ নেবে না।

প্রত্যয় চৌধুরী সামান্য চুপ করিয়া থাকিয়া পরে বলিলেন ঠিকই বলেছেন। আমারও সে ভয় হচ্ছে। এ ছবির দর্শক এখনও এদেশে তৈরি হয়নি। তবু কাউকে তো একদিন কাজ শুরু করতেই হয়।

কলিকাতার তিনটি প্রেক্ষাগৃহে যেদিন ছবি রিলিজ হইবে তার আগের দিন সারারাত হৈমন্তীর ঘুম আসিল না। শেষরাতে দেয়ালে টাঙানো অপুর ছবিখানার সামনে দাঁড়াইয়া মনে মনে বলিলতুমি নেই, তোমার হয়ে একটা বড়ো কাজ করলাম। আশীর্বাদ কোরো, যেন সবদিক বক্ষা পায়-!

ছবি বাজারে চলিল না। প্রথম দুই-তিন দিন কিছু দর্শক সমাগম হইল, যেমন নতুন ছবি রিলিজ হইলে হওয়া স্বাভাবিক। তাহার মধ্যে আবার কিছু দর্শক বিরক্ত হইয়া ইন্টারভ্যালে উঠিয়া বাড়ি চলিয়া গেল। বলিতে বলিতে গেল–ছ্যা ছ্যা, গল্প নেই, নাটক নেই, একখানা ভালো গান নেই–এ জিনিস আড়াই ঘণ্টা বসে দেখা-না, পয়সাটাই নষ্ট!

প্রথম সপ্তাহের শেষ হইতেই বোঝা গেল ছবি সম্পূর্ণ মার খাইয়াছে। প্রতি শো-য়ে পনেরোবিশজনের বেশি দর্শক হইল না। দ্বিতীয় সপ্তাহ ছবি রাখিবার জন্য কোনো প্রেক্ষাগৃহেব মালিকই আগ্রহ দেখাইলেন না। অপূর্বকুমার রায়ের প্রথম উপন্যাসের চিত্ররূপ ব্যবসায়িক সাফল্য তো দিতেই পারিল না, জনজীবনে সামান্য আরর্তের সৃষ্টি হইল না।

কেবল দুই-একটি সংবাদপত্রের সমালোচকেরা অধমনস্ক গোছের প্রশংসার কবিলেন। কলিকাতায় কয়েক জায়গায় বোদ্ধা দর্শকের দল প্রত্যয় চৌধুরীকে সম্বধনা দান করিল। তাহাতেও বাজার গরম হইল না।

কাজল কিন্তু বুঝিল ছবি ভালো হইয়াছে। লোকে দেখিল না, সে আর কী করা যাইবো ভালো শিল্পের রসিক চিবকালই কম। একদিন সে হৈমন্তীকে বলিল–

www.bengaliebook.com

মা, তুমি মনে দুঃখ রেখো না, তুমি ঠিক কাজই করছে। বাবার গল্প এভাবেই ছবি হওয়া উচিত ছিল। নাচ-গান-কান্না না থাকলে আমাদের দেশে ছবি কেউ দেখে না। প্রত্যয়বাবু ভালো কাজ করেছেন, আস্তে আস্তে লোকে নেবে দেখো

মায়ের মনে যাতে দুঃখ না হয় সেজন্য তখনকার মতো কাজল একটা কথার কথা বলিয়াছিল। কারণ সে জানিত ফিলম জিনিসটা ছাপা বইয়ের মতো না। বিলিজ হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি ছবির ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হইয়া যায়। হয় মানুষ সেই ছবিটি গ্রহণ করে, নয়তো উপেক্ষার অন্তরালে সরাইয়া দেয়। সাহিত্যিকের মৃত্যুর একশত বৎসর পরেও তাঁহার রচনার পুনর্মূল্যায়ন হইতে পারে, কিন্তু উপেক্ষিত ফিলম দশ বৎসর বাদে আবার সচরাচর দর্শকের মনোযোগের আলোয় আসে না।

কিন্তু কাজলের ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করিয়া, দর্শক ও সমালোচকের উপেক্ষাকে উপহাস করিয়া এক্ষেত্রে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে প্রত্যয় চৌধুরীর বংশের একটা খাতি ছিল। রাষ্ট্রযন্ত্রের সঠিক স্থানে অবস্থিত কয়েকজন সচেষ্ট হওয়ায় ছবিটি বিদেশের কয়েকটি চলচ্চিত্র উৎসবে দেখাইবার ব্যবস্থা হইল।

এরপর যা ঘটল তাহাকে বাস্তব ঘটনা না বলিয়া রুপকথা আখ্যা দিলেই ভালো হয়। প্রত্যয় চৌধুরীর ছবি বিদেশে পরপর তিনটি উৎসবে শ্রেষ্ঠ মানবিক দলিল হিসাবে খ্রথম পুরস্কার পাইল। ইউরোপের বড়ো বড়ো সব কাগজে ফিল্মের স্থিরচিত্র ও প্রত্যয় চৌধুরীর ছবি বাহির হইল। দেশের যেসব কাগজ এতদিন বিশেষ কোনো উৎসাহ প্রকাশ করে নাই তাহারা প্রত্যয়বাবুর ছবিসহ সাক্ষাৎকার প্রকাশ করিল। সমালোচকেরা বলিলেন ছবিটির অসাধারণত্ব তাহারা আগেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, উপযুক্ত তথ্য ও মালমশলা সংগ্রহ করিয়া তাহারা বড়ো বড়ো প্রবন্ধ লিখিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এইবার

www.bengaliebook.com

সেগুলি প্রকাশিত হইবে। অনেকে সাক্ষাৎকার নিতে গিয়া ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিল। প্রত্যয় চৌধুরী কয়েকটি উৎসবে যোগ দিতে বিদেশে গিয়াছেন, দুই মাসের আগে ফিরিবেন না।

কৌতূহলী হইয়া কাজল দেশী-বিদেশী কিছু কাগজ সংগ্রহ করিয়া পড়িল। সকলেই লিখিয়াছে গ্রামের এমন চিত্র, প্রকৃতির এমন বিশ্লেষণ, নিম্নবিত্ত সংসারে একটি ভাবুক শিশুর বিকশিত হইয়া ওঠা-চৌধুরী ছাড়া এমনটি আর কেহ পারেন নাই।

কাজলের মনটা খারাপ হইয়া গেল। বেশ মজা তো! উহারা অপুর নামের কোনো উল্লেখ কোথাও করে নাই। গ্রামের নিপুণ চিত্র, শিশু-মনস্তত্ত্ব–এসব প্রশংসা তো তাহার বাবার প্রাপ্য। তাহার বাবা উপন্যাস না লিখিলে সিনেমার গল্পটা আসিত কোথা হইতে? হ্যাঁ, পরিচালকের অবশ্যই প্রশংসা প্রাপ্য যথেষ্টই প্রাপ্য, কিন্তু লেখককে যে সবাই একেবারে ভুলিয়া গেল! এ কী রকম ব্যাপার?

পরে অবশ্য তাহার মনে হইল প্রথম উৎসাহের জোয়ারে সবাই এমন করিতেছে, প্রাথমিক উল্লাস স্তিমিত হইলে সত্য আপনিই স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

একদিন প্রায় চৌধুরীর ছবির উপর আয়োজিত এক আলোচনার সভায় সে যোগ দিতে গেল। আমন্ত্রণ পাইযা যায় নাই, সভা হইবে খবর পাইযা ব্যাপার দেখিতে গিয়াছিল। দরজায় কেহ আটকাইতেছে না দেখিয়া সে পায়ে পায়ে ঢুকিয়া পড়িল। শ্রোতায় সভার ঘর আধাআধিরকম ভর্তি হইয়া গিয়াছে। কাজল পেছনের দিকে বছর পঁয়তাল্লিশ বয়েসের চালাক চেহারার একজন লোকের পাশে বসিল। লোকটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল–আপনি কোন্ কাগজ থেকে এসেছেন?

www.bengaliebook.com

কাজল বুঝিতে না পারিয়া বলিল—আমাকে কিছু বলছেন?

-হ্যাঁ। আপনি কোন কাগজের রিপোর্টার?

কাজল হাসিয়া বলিল—কোনো কাগজেরই না। আমি ফ্রিল্যান্‌সার।

লোকটি অবাক হইয়া বলিল—তাই নাকি? আশ্চর্য তত! আমার ধারণা ছিল ফ্রিল্যানসার কেবল বিদেশেই আছে। এখানেও হয়েছে জানতাম না। আপনি কী অনেক দিন থেকে-

-না, এই তো মাসকয়েক হল—

-ওঃ, তাই বলুন। তা না হলে তো খবর পেতাম।

এমন সময় একজন বক্তা উঠিয়া বলিতে শুরু করা কথাবার্তা থামিয়া গেল।

এখানেও একই ব্যাপার। মূল উপন্যাসটির নামও কেহ উচ্চারণ করিলেন না বা ছবিব সাফল্যের পেছনে অপুরও যে সমান অবদান আছে সে কথা সবাই ভুলিয়া গেল। সভার শেষে বাহির হইতে হইতে কাজল তাহার সঙ্গীকে বলিল—কী ব্যাপার বলুন দেখি, ফিল্ম তৈরি করতে তো একটা ভালো গল্প লাগে, বলা যেতে পাবে সেটাই প্রাথমিক শর্ত—এঁরা কেউ তো লেখকের কথা বললেন না?

লোকটি অন্যমনস্কভাবে বলিল—আঁ? হ্যাঁ, সেকথা ঠিক। আচ্ছা প্রত্যয়বাবুর ডিটেলের ব্যবহার লক্ষ করেছেন? গ্রামকে দেখার কী চোখ!

-কিন্তু সেটা লেখক লিখেছেন বলেই তো-তাছাড়া ক্যামেরা কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তাও প্রত্যয় চৌধুরী দেখিয়ে দিলেন। নবযুগ মশাই, নবযুগ—

কাজলের সঙ্গী বিহুল, মুগ্ধ অবস্থায় বিড়বিড় করিতে করিতে উদ্ভ্রান্তের মতো রাস্তা পার হইয়া চলিয়া গেল।

কলিকাতার কয়েকটি সিনেমা হলে ছবিটি নতুন করিয়া দেখানো শুরু হইল। ভিড়ের চোটে হলের সামনে রাস্তা দিয়া চলা যায় না। অথচ এই একই ছবি কিছুদিন আগে কেহ দেখে নাই। সাহেবরা প্রশংসা না করিলে কী আর এদেশে কোন জিনিসের কদর হয়? শহরের অনেক জায়গায় ফিলম্‌টির পোস্টার কাজলের চোখে পড়িল। সর্বত্রই লেখা আছে—প্রত্যয় চৌধুরীর মহান ছবি। লেখকের নাম পোস্টারে কোথাও নাই।

বিদেশ হইতে ফিরিয়া প্রত্যয় চৌধুরী একদিন কাজলদের বাড়িতে আসিলেন। অপুর উপন্যাসটির অর্ধেকের কিছু বেশি অংশ লইয়া তিনি হবি করিয়াছিলেন, এবার বাকিটুকু লইয়া আর একটি ছবি করিতে সন। হৈমন্তীর সম্মত না হইবার কোনো কারণ ছিল না। প্রথমবারেই প্রত্যয়বাবুতাহার যোগ্যতা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয় ছবির চুক্তিও হইয়া গেল। সমস্ত কাগজে সংবাদ বাহির হইলঅপূর্বকুমার রায়ের গল্প লইয়া প্রত্যয় চৌধুরী আবার ফিলম করিতেছেন। শুটিং আরম্ভ হইয়া গেল।

প্রথম ছবির জন্য প্রাপ্য সব টাকা কিন্তু তখনও হৈমন্তী পায় নাই। প্রত্যয় চৌধুরী নিজের টাকা দিয়া কিছুদূর কাজ করিবার পর একজন প্রযোজক বাকি টাকা লগ্নী করিয়াছিলেন। তিনি লেখকের প্রাপ্য অংশ দিতে নানাবিধ গড়িমসি করিতে লাগিলেন। একজন সাংবাদিক খবরটা পাইয়া তাহার কাগজে প্রদীপের নিচে অন্ধকার নামে একটি ফিচার লিখিল। যে অপূর্ব রায়েব গল্পের চিত্ররূপ লইয়া সমস্ত পৃথিবীতে উৎসব হইতেছে, সেই লেখকের পরিবার এখনও তাহাদের প্রাপ্যে বঞ্চিত। আরও দুই-একটি কাগজে অনুরূপ সংবাদ বাহির হইবার পর টাকাটা আদায় হইল।

অপুর গল্পেব দ্বিতীয় চিত্ররূপও দেশে-বিদেশে আগের মতো আলোড়ন তুলিল। এবার আর সমালোচকেরা ভুল করিলেন না। ক্ষেত্র প্রস্তুতই ছিল। শুটিং-এর প্রতি পর্যাযে ছবিসহ খবর প্রকাশিত হইতেছিল। ফিল্ম রিলিজ হইবামাত্র পুনরায় দেশজোড়া উৎসাহের বন্যা বহিয়া গেল। নতুন করিয়া আবার অনেক সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হইল, অনেক বড়ো বড়ো সংস্থার পক্ষ হইতে প্রত্যয় চৌধুরী সংবর্ধিত হইলেন।

কোথাও অপুর নাম উচ্চারিত হইল না। এইসব সভায় পরিচালক, প্রযোজক, অভিনেতা, কলাকুশলী প্রত্যেকেই আমন্ত্রণ পাইল, কেবল লেখকের পক্ষ হইতে উপস্থিত থাকিবার জন্য কাজলদের কাছে কোনো আমন্ত্রণ আসিয়া পৌঁছিল না।

অবশ্য চলচ্চিত্রের এই সাফল্যে অপুর বই-বিক্রি কিছু বাড়িল। এক শ্রেণির মানুষ আছে যাহারা সাধারণত সাহিত্য পাঠ করে না, কিন্তু কোন উপন্যাসের ফিলম হইলে বইটা কিনিয়া পড়িবার আগ্রহ দেখায়।

বাবার জন্য কাজলের মনের মধ্যে কোথাও একটা কষ্ট হইতেছিল। যাহার প্রতি তীব্র ভালোবাসা রহিয়াছে তাহাকে শ্রেষ্ঠত্বের সমস্ত অলঙ্কারে সজ্জিত না দেখিলে গভীর বঞ্চনার বোধ বুকের ভিতর ক্রিয়া করে। চলচ্চিত্র এবং সাহিত্য একেবারে ভিন্ন দুটি শিল্পমাধ্যম, যে হৈ-চৈ হইতেছে তাহা কেবলমাত্র চলচ্চিত্র লইয়াই-সাহিত্যের গৌরব তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয় না, এসব যুক্তি সে যে জানিত না এমন নয়, কিন্তু সে যুক্তিতে মনখারাপ দূর হইতেছিল না। চলচ্চিত্র তো আকাশ হইতে পড়ে না বা শূন্যে গজাইয়া ওঠে না। তাহার প্রাথমিক অবলম্বন একটি গল্প। তাহা হইলে পরিচালকের সঙ্গে সঙ্গে গল্পকার সমানভাবে সংবধিত হইবেন না কেন?

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

এক ছুটির দিন সকালে কয়েকজন লোক কাজলের সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। নিশ্চিন্দিপুর হইতে মাইল তিনেক দূরে যে ছোট শহর সম্প্রতি জমিয়া উঠিয়াছে, সেখান হইতে তাহারা আসিয়াছে।

ধুতি আর শার্ট পরা একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক, কথার ভঙ্গিতে মনে হয় তিনিই দলনেতা, কাজলকে বলিলেন—আপনার বাবা আমাদের অঞ্চলের গৌরব। এ বছর তার জন্মদিনে আমরা একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করব সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অপূর্ববাবুর নামেই পাঠাগার হবে। আপনার মাকে দিয়ে আমরা পাঠাগার উদ্বোধন করাতে চাই

কাজল বলিল—সে তো খুব ভালো কথা। মা নিশ্চয় যাবেন।

—আর একটা কথা, আমরা দরজায় দরজায় ঘুরে বই সংগ্রহ করে লাইব্রেরি শুরু করছি। আপনি আমাদের কিছু বই দেবেন—

—তা দেব। বাবার একসেট বই দিচ্ছি, তার সঙ্গে অন্য ভালো বই কিছু। একটু বসুন, চা খান, এখনই বই গুছিয়ে দিচ্ছি।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলিলেন—আপনার মায়ের সঙ্গে একবার দেখা হবে কি? ওঁকে কখনও দেখিনি-

-বসুন আপনি, মাকে ডাকছি-

হৈমন্তী ঘরে আসিতে প্রৌঢ় ভদ্রলোক ছাড়া বাকি সকলে তাহাকে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল। প্রৌঢ় ভদ্রলোক হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিয়া

বলিলেন–আমরা আপনার শ্বশুরবাড়ির দেশ থেকে আসছি। অপূর্ববাবুর নামে একটা পাঠাগার উদ্বোধন হবে ওঁর জন্মদিনে, আমরা আপনার আশীর্বাদ চাই।

হৈমন্তী বলিল–আমার শুভেচ্ছা তো থাকবেই, তাছাড়া যদি কোনো কাজে লাগতে পারি জানাবেন।

-সে তো আপনার ছেলেকে বলেছি, উনি আমাদের কিছু বই দিচ্ছেন। কিন্তু আমাদের তো একটা দাবি আছে, ওদিন আপনাকে পাঠাগার উদ্বোধন করতে হবে।

–বেশ, যাব। কখন আপনাদের অনুষ্ঠান?

-অনুষ্ঠান বিকেলে। সেদিন হয়তো ফিরতে পারবেন না। তাতে অসুবিধে নেই, আমরা থাকার ব্যবস্থা করবো।

কাজল বলিল-আমরা গ্রামেই কারও কাছে থাকব। আপনাদের ব্যস্ত হবার দরকার নেই।

দলের একজন লোক হঠাৎ প্রশ্ন করিল–আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করব? আপনারা গ্রাম ছেড়ে শহরে বাস করছেন কেন?

কাজল একটু অবাক হইয়া বলিল–আপনার প্রশ্নটা ঠিক ধরতে পারলাম না।

–আমি বলতে চাইছি, আপনার বাবা একজন বরেণ্য ব্যক্তি। সাহিত্যে পল্লীগ্রামের কথা লিখে তিনি যশস্বী হয়েছেন। প্রতিমাসে কত মানুষ নিশ্চিন্দিপুরে আপনাদের বাড়ি দেখতে যায় জানেন? তারা গিয়ে অপূর্ববাবু সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করবার মতো কোনো মানুষ পায় না। বাড়িটারও অবস্থা ভালো নয়। এ বিষয়ে আপনারা কিছু ভাবছেন না?

কাজল বলিল—দেখুন, নিশ্চিন্দিপুর থেকে বাস উঠিয়ে চলে এসেছিলেন আমার ঠাকুরদা। বাবা তখন ছোট। কাজেই আমি গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছি একথা বলা ঠিক হবে না। তাছাড়া আমি নিশ্চিন্দিপুরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছি।

—আর বাস করবেন না সেখানে?

—সেটা কি সম্ভব? আপনিই বলুন? আমার চাকরি, আমার লেখা—এসব তো আছেই, মায়েরও বয়েস হচ্ছে, তার চিকিৎসার প্রয়োজন হয়-

লোকটি একটু বাঁকা ধরনের হাসি হাসিয়া বলিল-গ্রামে যারা বাস করে তাদের কি চিকিৎসা হয় না? আর চাকরি দেশের কোনো স্কুলেও পেয়ে যেতে পারেন। সাধারণ লোকের সঙ্গে নিজের তুলনা করবেন না। অপূর্ব রায়ের ছেলে হিসেবে আপনার দায়িত্ব অনেক বেশি

কথাটা কাজল জীবনে বহুবার শুনিয়াছে। কিন্তু সে একা কী করিবে? স্মৃতিরক্ষা জিনিসটা শুনিতে ভালো, কিন্তু বাস্তবে তাহা করা খুব কঠিন। বাড়িঘর মেরামত করিয়া, পাঠাগার সংগ্রহশালা ইত্যাদি স্থাপন করিতে যে বিপুল ব্যয়, তাহা সে একা সংকুলান করিতে পারিবে কি? না হয় কষ্টেসৃষ্টে করিল, কিন্তু তারপর? স্মৃতিরক্ষা তো একদিনের ব্যাপার নয়, চিরকাল ধরিয়া দেখাশুনা কে করিবে?

লোকটা জিজ্ঞাসা করিল—কী ভাবছেন আপনি?

—আপনার কথাটাই ভাবছিলাম। আচ্ছা একটা কাজ করুন না, আপনারা সবাই মিলে একটা সংস্থা গড়ে তুলুন। আমি সেই সংস্থার হাতে স্মৃতিরক্ষার জন্য বাড়ি, জমি ইত্যাদি দিয়ে দিচ্ছি। আমিও থাকবো আপনাদের সঙ্গে। কেমন হবে?

ইহা যে অতি উত্তম প্রস্তাব, ভদ্রলোকেরা একবাক্যে তাহা স্বীকার করিলেন। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিয়া পরে এ বিষয়ে তাহাদের সিদ্ধান্ত জানাইবেন এমন বলিয়া গেলেন।

পাঠাগার প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। বেত্রবতী বাহিয়া অনেক জল সমুদ্রে গিয়া পড়িল, কিন্তু উৎসাহী সেই ভদ্রলোকেরা আর সিদ্ধান্ত জানাইতে আসিলেন না।

পাচবৎসর আগে হইলে কাজল অবাক হইত, ক্ষুব্ধও হইত। কিন্তু ক্রমেই জীবনের বাস্তব রুপটা তাহার কাছে উদ্ঘাটিত হইতেছিল। মানুষ সমালোচনা করিতে যত ভালোবাসে কাজ করিতে ততটা নয়। সঠিক লোকের সঙ্গে এখনও যোগাযোগ হয় নাই, হইলে অপূর্বকুমার রায়ের স্মৃতিবক্ষার কাজ বসিয়া থাকিবে না।

কাজল তাহার রান্না খাইতে ভালোবাসে বলিযা কাজের লোক থাকা সত্তেও হৈমন্তী বান্নাটা নিজেই করিবার চেষ্টা করে। সেদিন মাছের ঝোলের কড়া নামাইতে গিয়া এক বিপত্তি বাধিল।

সকাল হইতেই হৈমন্তীর কোমরে কেমন একটা যন্ত্রণা হইতেছিল। কড়াটা ধবিবার জন্য দাঁড়ানো অবস্থায় সামনে ঝুঁকিতেই হঠাৎ দারুণ যন্ত্রণার একটা প্রবাহ কোমর হইতে হাঁটু পর্যন্ত ছড়াইয়া গেল। কোনোরকমে এক হাত দিয়া সামনের দেয়াল ধরিয়া সামলাইয়া ফেলিয়াছিল তাই বক্ষা, নহিলে গরম মাছের ঝোল গায়ে পড়িয়া রীতিমত আহত হইবাব সম্ভাবনা ছিল। কড়াটা অবশ্য উলটাইয়া গেল, হলদে-কালো ছোপওয়ালা মেনী বেড়ালটা ছুটিয়া আসিয়া মেঝেতে ছড়াইযা পড়া মাছের টু্া মহানন্দে খাইতে শুরু করিল।

কাজল নিজের ঘরে বসিয়া লিখিতেছিল, কড়াই পড়িবাব শব্দে রান্নাঘরে আসিয়া অবাক হইয়া বলিল—কী হয়েছে মা? কীসের শব্দ হল? এঃ, ঝোল পড়ে গেছে বুঝি!

হৈমন্তী বলিল—আমাকে একটু ধর তো, হঠাৎ কোমরে এমন ব্যথা

মাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া কাজল হেমন্ত ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিল। হেমন্তবাবু রোগী দেখিয়া বলিলেন-ভয়ের কিছু নেই। বয়েস হতে আরম্ভ করলে একটু-আঘটু বাতের প্রবলেম দেখা দিতে পারে, সেটা তো মেনে নিতেই হবে। স্লিপ ডিস্ক নয় বলেই মনে হচ্চে। দুদিন বিছানায় রেস্ট নিন, আর যে মলমটা লিখে দিচ্ছি, সেটা দুবেলা মালিশ করুন। ঠিক হয়ে যাবে।

জীবনের সমস্ত বড়ো বড়ো পরিবর্তনগুলি সামান্য প্রাথমিক লক্ষণের মাধ্যমে শুরু হয়। বয়েস যে বাড়িতেছে, এ কথাটা সত্যই হৈমন্তীর খেয়াল ছিল না। কোমরের বাতটা তাহার জীবনে প্রৌঢ়ত্বের প্রথম সংকেত হইয়া আসিল। ডাক্তারবাবুর চিকিৎসায় সে চার-পাঁচদিনের মধ্যে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল বটে, কিন্তু শরীরটা যেন আর ঠিকঠাক বশে রহিল না। খাঁটিবার ক্ষমতা কমিয়া আসিল, পূর্বের সেই স্মৃতি আর ফিরিল না। যে নদী বাহিয়া হৈমন্তীর জীবনের নৌকা চলিতেছিল, এই প্রথম তাহার অপর তীর বেশ স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল। যে তীর ছাড়িয়া আসিয়াছে, দূরত্বের কুয়াশায় তাহা ঝাপসা। শরীরের ভিতরে কিংবা ঠিক শরীর বা মনের কোথাও নয়—অস্তিত্বের গহনে অত্যন্ত মৃদুস্বরে একটা ঘণ্টা বাজিতেছে। মনোযোগ দিয়া কান পাতিলে শোনা যায়।

ছুটির ঘণ্টা।

ক্ষোভ নাই। জীবনটা ভালোই কাটিয়াহে। কোনো ক্ষোভ নাই।

ওপারের ঘাটে সেই একজন অপেক্ষা করিয়া আছে। হৈমন্তী পৌঁছাইলেই সে পরিচিত পুরাতন হাসি হাসিয়া অভ্যর্থনা করিতে আসিবে।

কাজেই ভয়ও নাই। রাত্তিরে শুইবার সময় কাজল বলিল—তুমি বিছানায় উঠে পড়ো মা, আমি মশারিটা খুঁজে দিয়ে যাই। সামনে ঝুঁকে কাজ করতে ডাক্তারবাবু বারণ করে দিয়েছেন। আবার কোমরে চোট লাগলে মুশকিল হবে।

হৈমন্তী বলিল—সে হবে এখন। তুই বোস দেখি, তোর সঙ্গে কথা আছে।

-কী মা?

–তুই আর কতদিন আমার মশারি খুঁজে দিবি?

কাজল অবাক হইয়া বলিল-তার মানে?

—আমার বয়েস হচ্ছে। দেখলি তত বাতে কেমন কষ্ট পেলাম। এবার শরীর ক্রমেই অপটু হয়ে আসবে। আমাদের সংসারে হাল ধরবার মতো কেউ নই। তোকে বিয়ে না দিলে আমি তো ছুটি নিতে পারছি না!

কাজল ব্যস্ত হইয়া বলিল—কেন মা, তোমার কি আবার শরীর খারাপ লাগছে নাকি? কাল তাহলে ডাক্তারবাবুকে একবার

-ওরে না না, শরীর আমার এখন ঠিকই আছে। আমি সে কথা বলছি না। বয়েসে বুড়ো হচ্ছি, সে তোর ডাক্তারবাবু কী করবে? আমার আর কাজ করতে ভালো লাগছে না। তোর বৌয়ের হাতে সংসার দিয়ে শুধু শুয়ে-বসে কাটাতে ইচ্ছে করছে।

কাজল বলিল-বিয়ে! সে কী কথা! আমি তো–তা কী করে হয়?

-যেমন করে বিয়ে হয় তেমন করেই হবে। তোর তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। তোকে এখন না বললেও চলতো, তবে আজকালকার ছেলে তো তাহলে আমি কিন্তু খোঁজখবর শুরু করছি-

তখনকার মতো মাকে একটা যাহা হউক উত্তর দিয়া কাজল নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু বিছানায় শুইয়া অনেক রাত পর্যন্ত সে ঘুমাইতে পারিল না। বিবাহের প্রসঙ্গ যে কিছুদিনের মধ্যেই উঠিবে তাহা সে আন্দাজ করিয়াছিল, কিন্তু আজ হৈমন্তী স্পষ্টভাবে বলায় কাজল বুঝিতে পারিল আপাতত এড়ানো গেলেও বিষয়টাকে অনির্দিষ্টকাল ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না।

মায়ের সঙ্গে তাহার কথা বলিতেই হইবে। সব খুলিয়া বলিতে হইবে। কিন্তু তার আগে সে সমস্ত দিকগুলি নিজে একবার ভালো করিয়া ভাবিয়া লইতে চায়।

অপালার বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা, সংযত বাকভঙ্গি, শরীরটাকে বহন করিয়া বেড়াইবার স্বচ্ছন্দ ও মর্যাদাপূর্ণ বিশিষ্টতা যেমন তাহার মনে আসিতেছিল, তেমনি সব চিন্তার গভীরে নিঃশব্দ মহিমায় জাগিয়া ছিল একজোড়া শান্ত, নিষ্পাপ চোখ।

কাজল বুঝিতে পারিল সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ তাহার পক্ষে কঠিন কাজ হইবে।

সেদিন সকালে হৈমন্তী বসিয়া প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রচনাবলী পড়িতেছে, এমন সময় কাজল ঘরে ঢুকিয়া বলিল–কী বই পড়ছ মা?

www.bengaliebook.com

হৈমন্তী বেশ কিছুদিন হইল চশমা লইয়াছে। রিডিং গ্লাস। সবসময় চোখে দিতে হয় না, কেবল পড়িবার সময় কাজে লাগে। বই মুড়িয়া চশমা খুলিয়া হাতে লইয়া সে ছেলের দিকে তাকাইয়া বলিল–প্রভাত মুখুজ্যের রচনাবলী। নবীন সন্ন্যাসী-টা আবার পড়ছি। সত্যি, এমন গল্প বলার ক্ষমতা সবার থাকে না। তুই পড়েছিস?

কাজল অন্যমনস্কভাবে বলিল–আঁ? হ্যাঁ, প্রভাতবাবুর লেখা খুবই ইয়ে-মা, তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরি কথা আছে–

-কীরে, কী হয়েছে?

সবুজ চামড়ায় বাঁধানো বই আকারের একটি খাতা হৈমন্তীর হাতে দিয়া কাজল বলিল–এটা চিনতে পারছে তো? বাবার ডায়েরিগুলোর মধ্যে একটা। তুমি জানুয়ারি মাসের দশ তারিখে লেখা এন্ট্রিটা পড়ো। আমি বসছি-তোমার পড়া হলে কথা বলবো।

এসব দিনলিপি হৈমন্তীর বহুবার পড়া আছে। তবে এই ডায়েরিটায় বিশেষ করিয়া জানুয়ারির দশ তারিখে কী লেখা আছে তাহা সে মনে করিতে পারিল না।

কাজল খাটে বসিয়া জানালা দিয়া বাহিরে তাকাইয়া রহিল। হৈমন্তী পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ বাদে হৈমন্তী পড়া শেষ করিয়া মুখ তুলিল। তাহার চোখে বিস্ময়। সে বলিল–এ ঘটনা তো আমি জানি, তোর বাবাই আমাকে বলেছিলেন। কাশীতে লীলাদির মেয়ের সঙ্গে ওঁর দেখা হয়েছিল। কিন্তু তারপর তো অনেকদিন-তুই জানিস এ মেয়ে এখন কোথায়?

www.bengaliebook.com

মুখ না ফিরাইয়াই কাজল বলিল–জানি।

হৈমন্তী অবাক হইয়া বলিল–জানিস? কী করে জানলি? কোথায় সে?

-পরে বলব মা। আগে তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে নিতে চাই, শুনবে?

হৈমন্তী ছেলের মুখের দিকে ভালো করিয়া তাকাইয়া দেখিল। হঠাৎ যেন কাজল বড়ো হইয়া গিয়াছে, তাহার গলা ব্যক্তিত্বপূর্ণ, হাবভাব অচেনা। এই এতটুকু ছেলেকে বুকে করিয়া মানুষ

করিয়াছে, কবে সে এত বদলাইয়া গেল? ভালোও লাগে, আবার বুকের মধ্যে কেমন করে।

সে বলিল–বল কী বলবি

ছোটোবেলা হইতে আজ পর্যন্ত কাজল মায়ের কাছে মন খুলিয়া সব কথা বলিয়াছে, কিন্তু আজ প্রথম তাহার কেমন বাধোবাধো ঠেকিতে লাগিল।

তবু সে আস্তে আস্তে হৈমন্তীকে সমস্ত জানাইল। প্রথমে বলিল অপালার কথা, তারপর বলিল বিমলেন্দুর সহিত অকস্মাৎ দেখা হইবার ঘটনা, তুলির কথাও সে বলিল। তাহার কথা শেষ হইবার পর হৈমন্তী জিজ্ঞাসা করিল–এই দুজনের ভেতর তুই কি কাউকে কোনো কথা দিয়েছিস? এদেব প্রতি তোর দায়িত্ব কতখানি?

তুলিকে কথা দেওয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। কারণ তার মামার সঙ্গে আমার যে কথাবার্তা হয়েছিল তাও বোধহয় সে জানে না। অপালার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। সে খুব ভালো আর বুদ্ধিমতী মেয়ে। তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক বন্ধুর মতো, কিন্তু বেশ গভীর আর অনেকদিনের। মুখে আমাদের স্পষ্ট

কোনো আলোচনা না হলেও তার পক্ষে মনে মনে এমন একটা আশা পোষণ করা অন্যায় নয়

-তোর নিজের ইচ্ছের পাল্লা কোনদিকে ভারি?

একটু ইতস্তত করিয়া কাজল বলিল—আমি বুঝতে পারছি না মা। অপালা মেয়ে হিসেবে খুবই ভালো, পুত্রবধু হিসেবে আমাদের পরিবারে তাকে খুব সুন্দর মানাবে। সে নিজেও ইচ্ছুক বলে আমার মনে হয়। অন্যদিকে তুলি খুব সুন্দরী, শান্ত স্বভাবের মেয়ে। স্কুল-কলেজে পড়াশুনো করেনি, তার মামা বাড়িতে শিক্ষক রেখে তাকে পড়িয়েছেন। বাইরের দুনিয়া সম্বন্ধে সে একেবারেই অনভিজ্ঞ। কিন্তু বাবা তার সম্বন্ধে ভেবেছিলেন, ডায়েরিতে তার কথা লিখেছেন। সে ইচ্ছের কি আমি দাম দেবো না?

হৈমন্তী বলিল-লীলাদির মেয়ের সঙ্গে তোর দেখা হল কী করে?

কাজল সমস্ত ঘটনা মাকে খুলিয়া বলিল।

কাজলের কথা শেষ হইলে হৈমন্তী বলিল—আমাকে একটু ভাবার সময় দে। এই ধরআই কী দশদিন। তারপর আমি তোর সঙ্গে কথা বলব।

আট-দশদিন কাটিবার আগেই এক ঘটনা ঘটিল। বিমলেন্দুর কাছ হইতে কাজল একটি চিঠি পাইল। তিনি লিখিয়াছেন—তুলির খুব অসুখ, কাজল কি একবার আসিতে পারে?

দুপুর পার হইয়া চিঠি বিলি হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে রওনা দিলেও সেদিন কলিকাতা হইতে ফিরিবার সম্ভাবনা কম। তবুও সামান্য ভাবিয়া কাজল যাওয়াই স্থির করিল। হৈমন্তীকে তুলির

www.bengaliebook.com

অসুখের কথা জানাইয়া বলিয়া গেল রাত্রে না ফিরিলে সে যেন চিন্তা না করে।

ট্রেন যেন আর চলেই না। কলিকাতা পৌঁছাইতে এত সময় লাগে? কই, এতদিন তো সে খেয়াল করে নাই। কী অসুখ হইয়াছে তুলির? নিতান্ত সাধারণ কিছু নয়, তাহা হইলে বিমলেন্দু তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইতেন না। তুলি-তুলি বাঁচিবে তো?

তাহার চিন্তার গতিতে সে নিজেই অবাক হইতেছিল। যাহাকে ঠিক প্রেম বা ভালোবাসা বলে, তেমন কিছু তুলির সঙ্গে তাহার গড়িয়া ওঠে নাই। সে ঘনিষ্ঠতাই ঘটে নাই কখনও। তাহা হইলে প্রায় অচেনা, অনাত্মীয় একটি মেয়ের জন্য তাহার বুকের মধ্যে এমন করিতেছে কেন?

কিছুদিন আগে এক বন্ধুর বাড়ি বেড়াইতে গিয়া গ্রামোফোন রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথের একখানি গান শুনিয়া তাহার খুব ভালো লাগিয়াছিল– যৌবনসরসীনীরে মিলনশতদল। আজ এখন ট্রেনের জানালার ধারে বসিয়া তুলিব কথা ভাবিলেই গানটি কানে ভাসিয়া আসিতেছে। কে যেন দিগন্তের ওপারে বসিয়া গাহিতেছে গানটা। আশ্চর্য তো! তুলির সঙ্গে এ গানের সম্পর্ক কী?

তুলিদের বাড়িতে ঢুকিবার মুখেই বিমলেন্দুর সহিত দেখা হইল। তিনি ব্যস্ত হইয়া কোথায় বাহির হইতেছেন। কাজলকে দেখিয়া বলিলেন–এই যে, তুমি এসে পড়েছে। সব কথা পবে হবে, তুমি একটু তুলির কাছে বোসো, আমি ডাক্তারবাবুর কাছে যাচ্ছি–

-তুলিব কী হয়েছে? অসুখটা কী?

-খুব জ্বর আজ কয়েকদিন ধবে। কোনো ওষুধেই নামছে না। এদিকে বাড়িতে এক বুড়ি কাজের লোক ছাড়া কেউ নেই। তাকে দিয়ে রোগীর সেবা হয় না। আমি যতটা পারি করছি, কিন্তু ফিমেল পেসেন্টের নার্সিং আমার কর্ম নয়। এমন বিপদে পড়েছি–যাক, তুমি এসো, তোমাকে তুলিব কাছে বসিয়ে আমি চট করে একবার ঘুরে আসি–

এই প্রথম কাজল বিমলেন্দুর বাড়ির অন্দরমহলে ঢুকিল। চওড়া বারান্দার শেষপ্রান্তে ডানদিকে একখানি বড়ো ঘরে খাটের ওপর তুলি শুইয়া আছে। মেঝেতে শুইয়া বৃদ্ধা পরিচারিকা ঘুমাইতেছে। বিমলেন্দু সেদিকে তাকাইয়া বলিলেন-কাল সারারাত ঘুমোয় নি, আজও দিনটা জেগে ছিল। বুড়ো মানুষ ওকে আর ডাকতে ইচ্ছে করছিল না। ভালোই হয়েছে তুমি এসেছে

বিছানার পাশে একটা চেয়ার টানিয়া কাজলকে বসিতে বলিয়া বিমলেন্দু বাহিব হইয়া গেলেন।

কাজল সন্তর্পণে বসিল। দেয়ালে লিটন কোম্পানির ঘড়ির টক টক্ শব্দ হইতেছে। একটা বেড়াল কোথায় ডাকিয়া উঠিল। বাড়ির আর কোথাও কোনো শব্দ নাই। কেবল দূরে বড়ো রাস্তা হইতে ভাসিয়া আসা গাড়িঘোড়ার অস্পষ্ট আওয়াজ শোনা যায়।

পরিস্থিতি একটু অদ্ভুত রকমের। কাজল ইহার আগে কখনও কোনো ঘুমন্ত তরুণীর এত কাছে বসিয়া থাকে নাই। অবশ্য তুলি অসুস্থ, তাহার এখানে বসিয়া থাকাটা কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে।

অসুখ তুলির অলৌকিক সৌন্দর্যকে ম্লান করিতে পারে নাই। বরং তাহাকে একটা বিষণ্ন মহিমা দান করিয়াছে-হেমন্তসন্ধ্যার হালকা কুয়াশার পেছনে পূর্ণিমার চাঁদকে যেমন দেখায়। একটু ইতস্তত করিয়া কাজল তুলির কপালে

www.bengaliebook.com

হাত রাখিল। অনেক জ্বর। তাহার দুই ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক হইয়া আছে। নিখুত দুইসারি দাঁতের কিছু অংশ দেখা যাইতেছে। কাজলের মনে পড়িল- a double row of orie□□□□ □□□□□□□–এমনই কাহাকে দেখিয়া কবি লিখিয়াছিলেন।

বেচারী তুলি। ইহার মা নাই, বাবা নাই। তেজস্বিনী মায়ের কন্যা, উঁহার মাকে সমাজ সহৃদয়তার সহিত বিচার করিবে না, সে ভার এই অসহায় মেয়েটিকে বহন করিতে হইবে। বিমলেন্দুরও ক্রমে বয়স হইয়া আসিতেছে। কে দেখিবে তুলিকে?

জ্বরে আচ্ছন্ন তুলির আঁচল সরিয়া চাঁপাফুল রঙের ব্লাউজের আড়াল হইতে নিটোল শখের মতো একটি স্তনের উদ্ভাস চোখে পড়ে। কাজল সন্তর্পণে কাপড় বিন্যস্ত করিয়া তুলির শরীর ঢাকিয়া দিল।

ঠিক সেই মুহূর্তে তাহার মনে একটা আশ্চর্য অনুভূতি জাগিয়া উঠিল। জীবনে এমন আর কখনও হয় নাই। কী বিচিত্র সে অনুভূতি!

তুলির প্রতি এক সুগভীর মমতায় তাহার মন ভরিয়া গেল। না, ঠিক মমতা নয়, আরও গভীব কিছু। মানুষের প্রাত্যহিক ভাষায় তাহার কোনো প্রতিশব্দ নাই। তুলির লজ্জা ঢাকিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে কাজলের মনে হইল–এই পীড়িতা, নিঃসঙ্গ মেয়েটি তাহার একান্ত নিজের। হর্ষ বেদনা অশ্রু পুলক ব্যর্থতা সমস্ত কিছু লইয়া এ আর অন্য কাহারও হইতে পারে না, অনাদৃতাও থাকিতে পারে না। প্রচলিত অর্থে ঈশ্বরবিশ্বাসের খেই কাজলের হারাইয়া গিয়াছে, তবু সে মনে মনে প্রার্থনা করিল– তুলি সারিয়া উঠুক, আগের মতো হাসিয়া কথা বলুক।

বিমলেন্দুর সঙ্গে বৃদ্ধ ডাক্তারবাবু আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। কাজলের দিকে তাকাইয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন—এটি কে? আগে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না তো-

-এ আমার ভাগ্নে। বাইরে থাকে। চিঠি পেয়ে এই একটু আগে এসেছে-

ডাক্তারবাবু আর কথা না বলিয়া রোগীর শয্যার দিকে অগ্রসর হইলেন। কাজল ঘর হইতে বাহির হইয়া বৈঠকখানায় আসিয়া বসিল।

একটু বাদেই ডাক্তারবাবু তুলিকে দেখিয়া বাহিরের ঘরে আসিলেন। বিমলেন্দু জিজ্ঞাসা করিলেন—কী মনে হচ্ছে ডাক্তারবাবু?

বৃদ্ধ চিকিৎসক চোখ হইতে চশমা খুলিয়া রুমাল দিয়া তাহার কাচ পরিষ্কার করিতে করিতে বলিলেন-টাইফয়েড নিঃসন্দেহে। ব্লাড টেস্ট করার আর দরকার নেই।

বিমলেন্দু উৎসুক চোখে তাকাইয়া রহিলেন।

চশমা চোখে লাগাইয়া চিকিৎসক বলিলেন—দেখুন আমি প্রাচীনপন্থী ডাক্তার, বহুদিন আগে পাশ করেছিলাম ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল থেকে। পুরোনো ঢঙেই আজও অবধি চিকিৎসা করে আসছি। সে পথে খুব একটা কাজ হবে বলে মনে হচ্ছে না। জানেনই তো, এ বয়েসে টাইফয়েড বড়ো কঠিন রূপ নেয় অনেক সময়। এতটা জ্বর বেশিদিন চললে ব্রেনের স্থায়ী ড্যামেজ হতে পারে। আমি ভাবছিলাম—

বিমলেন্দু বলিলেন-বলুন ডাক্তারবাবু। তুলি আমার ভাগ্নী নয়, আমার মেয়ে। ওর জন্য আমি সব কিছু করতে পারি।

www.bengaliebook.com

–আমার মনে হয় আপনি আর একজন কাউকে দেখান। কিছুদিন হল বাজারে নতুন এক ধরনের ওষুধ এসেছে, তাকে অ্যান্টিবায়োটিক বলে। তাতে খুব ভালো ফল পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু নতুন ওষুধ প্রয়োগ করতে হলে আধুনিক কোনো ডাক্তারকে দিয়ে দেখিয়ে তার পরামর্শ নেওয়া উচিত। উই হ্যাভ বিকাম আউটডেটেড, বুঝলেন না?

বিমলেন্দু একটু ভাবিয়া বলিলেন–বেশ, তাই হবে। আমি অন্য একজন ডাক্তারের পরামর্শ নিচ্ছি। কিন্তু আমার ভাগ্নী আপনার চিকিৎসাতেই থাকবে। আপনি তাকে যেমন দেখছেন তেমনই দেখবেন, আমি একটা সেকেন্ড ওপিনিয়ন নেবো মাত্র–

হাসিয়া বৃদ্ধ বলিলেন–আচ্ছা আচ্ছা, সে হবে–

সেদিনই রাত্রে একজন তরুণ ডাক্তার আসিয়া রোগী দেখিলেন এবং ক্লোরোমাইসেটিনের ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিলেন। বলিলেন–টাইফয়েডই বটে। তবে ভয় নাই, এবার জ্বর নামিয়া যাইবে।

রাত্রিতে কাজলের ফিরিবার উপায় ছিল না। বিমলেন্দু তাহাকে বাহিরের ঘরের তক্তাপোশে বিছানা করিয়া ঘুমাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। কাজল তাহাতে রাজি হয় নাই। বিমলেন্দুকে শুইতে পাঠাইয়া সে তুলির পাশে চেয়ারে বসিয়া রহিল। বিমলেন্দু বলিয়াছিলেন রাত দুইটায় তাহাকে জাগাইয়া দিতে, তাহার পর কাজল একটু বিশ্রাম করিয়া লইতে পারিবে। কাজল তাহাকে আর ডাকে নাই। সকালে ঘুম ভাঙিয়া অপ্রস্তুত মুখে বিমলেন্দু বলিলেন–এ কী! এ যে অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে! আমায় ডাকোনি কেন? তোমার বড়োই কষ্ট হল–

www.bengaliebook.com

পরে চা খাইতে খাইতে তিনি বলিলেন-আজ মেডিক্যাল কলেজের নার্সিং অ্যাসোসিয়েসনে গিয়ে ভালো একজন নার্স জোগাড় করে আনব ভাবছি। এই সময়টা দিনসাতেক ভালো নার্সিং প্রয়োজন হবে। তুমি কি আর একটু থাকতে পারবে? আমি তাহলে চট করে একবার ঘুরে আসতাম-

কাজল বলিল—আপনাকে কোথাও যেতে হবে না। আমি বিকেলের ভেতর একটা ভালো ব্যবস্থা করে দেব-

বিমলেন্দু অবাক হইয়া বলিলেন—তুমি? তুমি কি করে-তোমার কী কেউ জানাশোনা আছে নাকি? তুমি কীভাবে

—আমি বিকেলে মাকে নিয়ে আসব, নার্স আনার দরকার নেই—

বিমলেন্দু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন-না না, সে কী! ওঁকে তুমি কেন খামোক কষ্ট দিয়ে-

-কিছু কষ্ট না। মাকে বললে মা খুশি হয়েই আসবেন।

বিমলেন্দু আরও দুই-একবার আপত্তি করিয়া ব্যবস্থাটা মানিয়া লইলেন।

পাড়ার একজন ছেলেকে বাড়ি পাহারা দেওয়ার ভার দিয়া কাজল সন্ধ্যাবেলা মাকে লইযা তুলিদের বাড়ি আসিল। ছেলের প্রস্তাবে হৈমন্তীও আপত্তি করে নাই। মানসিকতার দিক দিয়া সে সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহবধূ হইতে কিছুটা পৃথক। অচেনা কোনো বাড়িতে রোগীর সেবা করিতে গেলে অন্য কাহারও যে সংকোচ হইতে পারিত, হৈমন্তী তাহার কিছুই অনুভব করিল না। বরং তুলিব নোগশয্যার পাশে দাঁড়াইয়া প্রথমবাব তাহাকে দেখিয়া এক গভীর স্নেহে তাহার মন ভরিয়া গেল। পৌঁছাইবার আধঘণ্টার মধ্যে সে সেবার সব ভার নিজের হাতে তুলিয়া লইল। বিমলেন্দু কেবলই উদ্ভাসিত মুখে হাতে হাত

www.bengaliebook.com

ঘষিয়া বলিতে লাগিলেন—আমার বড়োই সৌভাগ্য দিদি যে আপনি এসেছেন। আমি যে কিভাবে আপনাকে-

তুলি ক্রমেই সারিয়া উঠিল। ক্লোরোমাইসেটিন শুরু হইবার চারদিনের দিন জ্বর নামিয়া গেল। তখন শেষরাত, রাত্রে জাগিবে বলিয়া হৈমন্তী দুপুরে কিছুটা ঘুমাইয়া লইয়াছিল। তুলি চোখ খুলিয়া তাকাইল এবং প্রথমে কিছুটা বিস্ময়ের সঙ্গে ঘরের চারিদিকে একবার দেখিয়া লইল, যেন সে ঠিক বুঝিতে পারিতেছে না সে কোথায় আছে। পরে তাহার দৃষ্টি আসিয়া হৈমন্তীর উপর স্থির হইল। কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিবার পর তুলি বলিল-তুমি কে?

তাহার মাথায় হাত দিয়া হৈমন্তী বলিল—আমি—আমি তোমার মা-

জ্বরতপ্ত মস্তিষ্কে তুলি এই উত্তরের মর্ম গ্রহণ করিতে পারিল না। মা শব্দের সঙ্গে জড়িত কোনো বিশেষ আবেগও তাহার মনে পূর্ব হইতে সঞ্চিত নাই। সে আবার চোখ বুঁজিল।

সেবার গুণেই হোক বা অল্প বয়েসের পরিপূর্ণ জীবনীশক্তির জন্যই হোক—তুলি এত তাড়াতাড়ি সারিয়া উঠিতে লাগিল যে সবাই রীতিমত অবাক হইয়া গেল। হৈমন্তী একদিন বলিল— বিমল ভাই, তুলি এখন ভালো হয়ে উঠেছে, এবার তাকে আপনারাই সামাল দিতে পারবেন। অনেকদিন হল বাড়ি ছেড়ে এসেছি-কাল তাহলে ফিরি?

বিমলেন্দু গাঢ় গলায় বলিলেন—দিদি, মাঝে মাঝে আসবেন, যোগাযোগ রাখবেন। আমিও পৃথিবীতে বড়ো একা, কোথাও এতটুকু স্নেহের ছোঁয়া পেলে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। ভুলে যাবেন না ভাইটাকে—

হৈমন্তী তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলিল—ভুলব না আর যোগায়োগও রাখব।

www.bengaliebook.com

আসিবার সময় তুলি হৈমন্তীকে জড়াইয়া ধরিয়া ছেলেমানুষের মতো কাঁদিল।

জীবনে এই প্রথম সে মা কথাটার তাৎপর্য বুঝিতে শুরু করিয়াছে।

www.bengaliebook.com

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

একদিন সকালের ডাকে এয়ারমেলের লাল-নীল বর্ডার দেওয়া খামে ব্রিটেনের ডাকটিকিট সাঁটা একখানা চিঠি আসিল। কাজলের নামে চিঠি। চিঠিটা হাতে লইয়া প্রথমে কাজল আন্দাজ করিতে পারিল না কে এই চিঠি লিখিতে পারে। বিলাতে তাহার বন্ধুবান্ধব কেহই নাই, আত্মীয়স্বজন তো দুনিয়াতেই কেহ নাই।

খাম খুলিয়া দেখিল লন্ডনের এক প্রখ্যাত প্রকাশক চিঠি লিখিতেছে-অপুর প্রথম উপন্যাসটি, যেটি লইয়া প্রত্যয় চৌধুরী ছবি করিয়াছিলেন, সেটি তাহারা অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতে চায়। কপিরাইট সংক্রান্ত অনুমতি পাইলে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন অধ্যাপককে দিয়া (একজন ভালো বাংলাজানা খাঁটি সাহেব এবং একজন কৃতবিদ্য প্রবাসী বাঙালি) অনুবাদের কাজ শুরু করাইতে পারে। ব্যবসায়িক শর্তাদিও তাহারা চিঠিতেই জানাইয়াছে।

চিঠি পড়িয়া কাজলের খুব আনন্দ হইল। হ্যাঁ, অনুমতি সে পাঠাইয়া দিতেছে। আর ব্যবসায়িক শর্ত? টাকার জন্য তাহার লালসা নাই। পাইলে ভালো, না পাইলেই বা কী? তাহার বাবাব নাম তো বিদেশে ছড়াইয়া পড়িবে। এত ভালো লেখা তাহার বাবার, পৃথিবীর সকলে পড়ুক, পড়িয়া অবাক হউক।

কাজল তাহার জীবনে এই প্রথম আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষর কবিল।

টাকা ছাড়াও একটি চুক্তির আরও অনেক দিক থাকে, অনভিজ্ঞতাবশত কাজল সে সব কিছু খেয়াল করিল না। সই করিয়া ডাকে কাগজ পাঠাইয়া দিল। এব ফল পরে তাহাকে বেশ ভালোভাবেই ভুগিতে হইয়াছিল।

তাহার এক সাংবাদিক বন্ধুকে কাজল ঘটনাটি বলিয়াছিল, চুক্তিপত্রের একটা নকলও দেখাইয়াছিল। দুই-তিনদিন পরে তাহাদের কাগজে অপুর বইয়ের অনুবাদ হওয়ার খবরটা বেশ বড়ো করিয়া বাহির হইল। বন্ধুবান্ধব বা পরিচিতরা পথেঘাটে কাজলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—তোমার বাবার বই দেখলাম বিদেশে অনুবাদ হয়ে বেরুচ্ছে? বাঃ বাঃ, বেশ

কলিকাতায় এবং মফঃস্বলের কয়েক জায়গায় অপুর স্মৃতিতে সভা হইয়া গেল। দু-একটা সভায় আমন্ত্রণ পাইয়া কাজল যোগ দিতে গিযাছিল। বেশ ভিড়, শ্রোতারা আগ্রহের সঙ্গে বসিয়া বক্তৃতা শুনিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রবীণ অধ্যাপক বলিলেন—অপূর্বকুমার রায়ের বই যে বিদেশে অনুবাদ হইতেছে, ইহা অত্যন্ত সময়োচিত হইয়াছে। এই মুহূর্তে বাংলা সাহিত্যে অন্য এমন কেহ নাই যাঁহার রচনা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে পেশ করা যাইতে পারে। দুর্ভাগ্য এই, অপূর্বকুমার অকালে গত হইলেন। তিনি বাঁচিলে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধতর হইত।

কাজলকেও বলিবার জন্য আহ্বান করা হইল। সে বাবার সাহিত্য বিশ্লেষণ করিল না, অপুর ব্যক্তিগত জীবনচর্যার কথা বলিল। লেখা পড়িয়া লেখককে যেমন মনে হয় এক্ষেত্রে লেখক ঠিক তেমনই ছিলেন। সাহিত্যিকসত্তা ও ব্যক্তিসত্তায় কোনো পার্থক্য ছিল না—একই রকম উদার, মহৎ ও গভীর। বাবার সহিত তাহার ছোটবেলা কেমন কাটিয়াছিল, তাহার কিছু গল্প বলিল। সে আগে কখনও ঠিক এভাবে কোনো সভায় আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা দেয় নাই। প্রথমদিকে সামান্য জড়তা এবং সংকোচ বোধ করিতেছিল, কিন্তু মিনিট পাঁচ-ছয় বলিবার পর সে জড়তা কাটিয়া গেল। বাবার সম্বন্ধে কত কথা বলিবার আছে যে! তাহার সেই হারানো শৈশব—বাবার সাহচর্যে যাহা অমৃতময় হইয়া উঠিয়াছিল, সে কথা বলিতে আর সংকোচ কিসের? প্রায় চল্লিশ মিনিট সে বলিল।

www.bengaliebook.com

সভা শেষ হইবার পর অনেকেই আসিয়া তাহাকে অভিনন্দন জানাইয়া গেল। একজন বলিল—আপনাব বলার ধরন ভারি সুন্দর, আরও বললেন না কেন?

কাজল হাসিয়া বলিল-বাবার কথা আমি সারাদিন ধরে বলতে পারি, কিন্তু আপনাদের সভা তাহলে আর সফল হত না, সব্বাই পালাতে

-না না, ও আপনার ভুল ধারণা। সবাই অপূর্ববাবুর কথা আরও শুনতে চাইছিল। তঁার বই তো ইচ্ছে করলেই বাজার থেকে কিনে পড়া যায়, কিন্তু তার জীবনের গল্প তো আপনজন ছাড়া কেউ বলতে পারবে না। আমরা সামনের মাসে একটা বড়ো সভার আয়োজন করব, সেখানে এই অঞ্চলের দশ-বারোটা হাইস্কুলের ছাত্রদের ডেকে আনব। সৎ সাহিত্য আর নিজের দেশের সংস্কৃতির বিষয়ে অল্প বয়েস থেকেই সবাইকে সচেতন হতে হবে। সেই সভায় আপনি বাবার জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে বলবেন-আসবেন তো?

কাজল বলিল-বেশ তো, আমাকে জানাবেন—নিশ্চয় আসব।

—আপনি এত সুন্দর বলেন কী করে?

—ওটা আমার গুণ নয়, আমার ঠাকুরদাব গুণ। রক্তের মধ্যে দিয়ে আমার কাছে একটুখানি এসেছে। ঠাকুরদা হরিহর রায় কথক ছিলেন, গান লিখতেন, আবার নিজে সুর দিয়ে গাইতেন। নাতি হিসেবে তারই একটু পেয়েছি-

একদিন দুপুরে সে 'বসু ও গুহ' পাবলিশার্সের অফিসে গেল। এখনও আড্ডাধারীদের ভিড় জমিতে শুরু করে নাই। সবুজ কেদারাটিতে দ্বিজেন্দ্র গুহ গা এলাইয়া কী যেন পড়িতেছেন। পাশের হাতলওয়ালা চেয়ারে বসিয়া প্রমথ বসু প্রুফ দেখিতেছেন ও মাঝে মাঝে আশান্বিত চোখে দ্বিজেনবাবুর দিকে

www.bengaliebook.com

তাকাইতেছেন। একবার বন্ধু কোনো কাজে উঠিলেই হয়, সঙ্গে সঙ্গে কেদাবাটি তিনি দখল করিবার সুযোগ পাইবেন।

তাহাকে দেখিয়া দুইজনেই খুশি হইলেন। দ্বিজেনবাবু বলিলেন-বোসো, অনেকদিন পরে এলে এবার। কাগজে দেখলাম তোমার বাবার বই ইংবেজিতে অনুবাদ হচ্ছে–

–আজ্ঞে হ্যাঁ কাকাবাবু, জর্জ অ্যালেন অ্যান্ড আনউইন প্রকাশ করছে। একটা ফোলিও এডিশন বেরুবে বলেও লিখেছে লন্ডন বুক ক্লাবের উদ্যোগে-

-বাঃ, ফোলিও এডিশন বের হওয়া তো খুব সম্মানের কথা। তোমাকে তারা নিশ্চয় বই পাঠাবে, হাতে পেলে দেখিয়ে যেয়ো।

প্রমথ বসু প্রুফ দেখা বন্ধ করিয়া তাহাদের কথা শুনিতেছিলেন, এইবার তিনি বলিলেনএকটা কথা কী জানো, আমার প্রায়ই মনে হয়–অপূর্ববাবু যদি আর একটু লম্বা আয়ু পেতেন, তাহলে ভারতবর্ষ আর একটা নোবেল প্রাইজ পেত-

দ্বিজেনবাবু বলিলেন–সে আমারও বিশ্বাস। তবে তাতে কিছু এসে-যায় না। স্বয়ং টলস্টয় নোবেল প্রাইজ চালু হবার পরও বারো-তেরো বছর বেঁচে ছিলেন, তিনি ও প্রাইজ পান নি। এরিখ মারিয়া রেমার্ক পান নি, সমারসেট মম পান নি–তাতে কি তাদের সাহিত্যের মূল্য কমে গিয়েছে না পাঠক আর তাদের বই পড়ে না? আবার এমন অনেক লেখক আছেন, যাঁরা নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, কিন্তু তাদের নাম লোকে ভুলে গিয়েছে, তাঁদের বই আর কেউ পড়ে না

কাজল বলিল–ঠিকই। হ্যালডর কিলিয়ান ল্যাক্সনেস, ফ্রাসোয়া এমিল সিলানপা কিংবা পার ফেবিয়ান লাগের্কভিস্ট-এর লেখা আজ আর কে পড়ে?

www.bengaliebook.com

লেখার নিজস্ব মূল্যই লেখাকে বাঁচিয়ে রাখে, পুরস্কারে কী এসে যায়? বাবার এই পাঠকেরা চিরদিন আগ্রহ করে পড়বে বলে আমার বিশ্বাস।

দ্বিজেনবাবু বলিলেন–তুমি আজ এসে পড়েছ, ভালোই হয়েছে। একটা জরুরি প্রয়োজনে তোমাকে চিঠি লিখব ভাবছিলাম

-কী কাকাবাবু? কোনো দরকার ছিল আমার সঙ্গে?

–হ্যাঁ। আচ্ছা অপূর্ববাবু তো নিয়মিত দিনলিপি রাখতেন বলে জানি, সেসব ডায়েরির সবগুলো তোমার কাছে আছে?

দশ-বারোটা রয়েছে কাকাবাবু। মার কাছে শুনেছি আরও কয়েকটা ছিল। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর জিনিসপত্র নিয়ে আসার সময় কিছু খোয়া যায়

–এ, বড়োই দুঃখের কথা!

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর দ্বিজেনবাবু বলিলেন–একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বেশ ভেবে উত্তর দাও। তুমি তো সাহিত্যের ছাত্র, তোমার মতে অপূর্ববাবুর ডায়েরিগুলোর সাহিত্যমূল্য বা পাঠযোগ্যতা কতখানি? আমি ওগুলো ছাপতে চাই। তোমার কি মনে হয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে এ বই পাঠকেরা কিনে পড়বে?

প্রশ্ন শুনিয়া কাজল কয়েক মিনিট ভাবিল। তারপর বলিল–আপনার প্রশ্নের দুটো অংশ কাকাবাবু, প্রথম অংশের উত্তর দেওয়াটা আমার পক্ষে সোজা। সাধারণ মানুষ যেভাবে ডায়েরি লেখে, বাবার দিনলিপি তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কোথাও ভ্রমণকাহিনীর মতো, কোথাও বা নাটকের স্বগত সংলাপের মতো, কোথাও আবার ভাষা এমন এক গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করেছে যে, মনে হয় উপনিষদের বাংলা অনুবাদ পড়ছি। সাহিত্যমূল্য বা পাঠকযোগ্যতার

www.bengaliebook.com

দিক দিয়ে এসব রচনার মান খুবই উঁচু। কিন্তু পাঠকেরা কিনে পড়বে কিনা সেকথা আমি বলতে পারি না। অনেক রাবিশ বই প্রতিমাসে হাজার হাজার কপি বিক্রি হয়, আবার অনেক ভালো বই পোকায় কাটে। এ বিচার আপনার। তবে রিস্ক এলিমেন্ট একটা আছেই।

দ্বিজেনবাবু চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেন। প্রমথবাবু প্রুফ দেখা থামাইয়া তার দিকে তাকাইয়া ছিলেন, এবার বলিলেন–দ্বিজেন, আমার কিন্তু একটা কথা মনে হচ্ছে–

–কী?

–বইটা তুমি ছেপে ফেল। আমার বিশ্বাস পাঠকেরা এ বই নেবে। আর কাজল রিসক এলিমেন্টের কথা বলল, সে তো প্রকাশনের ব্যবসায় থাকেই। আমরা তো আর আলুকাবলি কিংবা চানাচুর বিক্রি করি না যে, মাঠের ধারে বসলেই হুহু করে সব বিক্রি হয়ে যাবে! প্রকাশনের কাজে অনেক ধৈর্য লাগে, অনেক সাহস লাগে–

দ্বিজেনবাবু কাজলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন তুমি সামনের সপ্তাহে বাবার দু-তিনটে ডায়েরি নিয়ে চলে এস। কপি করাতে হবে। কপি করে অরিজিনাল তোমাকে ফেরৎ দিয়ে দেব।

এডিট করার দরকার আছে বলে মনে করো কি?

কাজল বলিল–কপি হয়ে গেলে আমাকে একবার দেখতে দেবেন, যদি কোনো অংশ বাদ দেবার প্রয়োজন হয়–আমি দেখবো এখন

–বেশ। তা কী বই পড়ছে এখন? দু-একখানা জমাট ভূতের গল্পের বই পড়াতে পারো? আমার কাছে পড়ার মতো তেমন বই নেই–

www.bengaliebook.com

—এম. আর. জেম্স পড়বেন? ওঁর একটা সংকলন আছে, দিতে পারি।

-ওঃ, আমার খুব প্রিয় লেখক। কাল বা পরশু দিয়ে যেয়ো তো—

-জেমসের লেখা আপনার ভালো লাগে?

-খুব। এম, আর, জেম্স, ই, এফ, বেনসন, অ্যালজারনন ব্ল্যাকউড—এঁরাই তো অলৌকিক গল্পকে জাতে তুলে দিয়ে গেলেন। সমালোচকেরা ভূতের গল্পকে চিরদিন দ্বিতীয় শ্রেণির সাহিত্য বলে নাক কুঁচকে এসেছেন, এঁরাই প্রথম দেখালেন যে অলৌকিক গল্পও প্রথম শ্রেণির সাহিত্যপদবাচ্য হতে পারে। হেমেন রায়ের বাজলে বাঁশি কাছে আসি তো নিশ্চয় পড়েছে, ওটা জেমসের ও হুইসল, অ্যান্ড আই উইল কাম টু ইউ, মাই ল্যাড-এর অনুবাদ। কিংবা কাস্টিং দি বুস্-ওঃ, দারুণ গল্প!

একটু থামিয়া বলিলেন-তবে আসল জিনিস হচ্ছে ডিকেন। যতবার পড় কোনো ক্লান্তি আসবে না। প্রথম দিকটা একটু কষ্ট করে পড়তে হয়, এই ধর— একশো-দেড়শো পাতা, তারপর আর ছাড়তে পারা যায় না। সেকালের লেখক, সে যুগে রেওয়াজই ছিল বড়ো বড়ো বই লেখা। লোকের অবসর ছিল অনেক, মনে শান্তি ছিল, অরিয়ে সরিয়ে বই পড়বার অবকাশ ছিল। সে সব দিন ফিরে পাবে, ডিকেনস্ পড়—

এক-একটা কথা মানুষের মনে চিরদিনের জন্য গাঁথিয়া যায়। দ্বিজেনবাবুর এই পরামর্শ সারাজীবনের জন্য কাজলের মনে মুদ্রিত হইয়া গেল। পরবর্তীকালে সে ডিকেসের রচনাবলী প্রায় সব পড়িয়া ফেলিয়াছিল—পড়িবার সময় প্রায়ই তাহার দ্বিজেনবাবুর কথা মনে পড়িত। অনার্সে এবং এম.এ.-তে ডিকেনস্ পাঠ্য ছিল বটে, কিন্তু তখন পরীক্ষার ভয়ে বাধ্য হইয়া পড়িতে

হইয়াছিল, গভীর রসোপলব্ধির সুযোগ ঘটিয়া ওঠে নাই। এখন ভালো করিয়া পড়িয়া তাহার মনে হইল তাহার বাবার লেখার সহিত ডিকেনসের রচনার একটা মূলগত ঐক্য রহিয়াছে। মানবিকতায়, জীবনের সদর্থক ও আশাবাদী রূপের উদঘাটনে দুজনে একই কথা বলিয়াছেন। বরং তাহার বাবার সাহিত্য যেন আরও গম্ভীর, আরও স্নিগ্ধ এবং সরল, তাহা দুঃখকে ভুলিবার পথ দেখায় না, মৃত্যুকে জয় করিয়া জীবনের প্রতিষ্ঠা সম্ভব করে।

ইংল্যান্ডে অপুর বই প্রকাশ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গেল। বই প্রকাশ হইবার মাসখানেক পরে বিদেশ হইতে কাজলের নামে একখানা বড়ে পার্সেল ডাকে আসিল। পাঁচকপি বই প্রকাশক উপহার হিসাবে পাঠাইয়াছেন, সেই সঙ্গে লন্ডন টাইমস, বার্মিংহাম পোস্ট, লিটারারি টাইমস, লিভারপুল ডেইলি পো্স্টে, দি স্কটসম্যান, অক্সফোর্ড মেল ইত্যাদি কাগজে প্রকাশিত সমালোচনার প্রতিলিপিও পাঠাইয়াছেন। বিদেশের সাহিত্য-সমালোচকেরা অপুর বইয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন, বিশ্বের ধ্রুপদী উপন্যাসগুলির সহিত এ গ্রন্থ স্থান পাইবার যোগ্য সে কথা বলিয়াছেন। কেহ কেহ এত ভালো লেখা এতদিন কেন অনূদিত হয় নাই সেজন্য অভিযোগও করিয়াছেন। সবই ভালো, কিন্তু বই খুলিয়া কাজল অকস্মাৎ একটা ধাক্কা খালি।

বইখানার খণ্ডিত অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রত্যয় চৌধুরী সিনেমায় উপন্যাসের যতখানি ব্যবহার করিয়াছেন ততটুকুই অনুবাদ হইয়াছে, শেষের ষাট-সত্তর পাতার পর্বটি বাদ।

এ কেমন হইল! শেষের ওই অংশেই তো লেখকের জীবনদর্শন আশ্চর্য সুষমায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, যে গভীর দর্শন ও বোধের প্রতিষ্ঠার জন্য সমগ্র রচনার অবতারণা! এমনভাবে কাটিয়াছটিয়া অনুবাদ করিবার অধিকার সে তো কাহাকেও দেয় নাই।

www.bengaliebook.com

প্রাথমিক বিহুলতা কাটিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার খুব রাগ হইল। তাহার বাবার অমন সুন্দর বই এভাবে নষ্ট করা! প্রকাশক একথা আগে জানাইলে সে কখনও ওই চুক্তিতে সই করিত না। ধ্রুপদী সাহিত্যের অঙ্গহানি করিবার অধিকার কাহারও নাই। বিদেশের পাঠকেরা বিরাট একটা জিনিস হইতে বঞ্চিত হইল।

অনুবাদের একটি কপি লইয়া একদিন সে দ্বিজেনবাবুর কাছে গেল। তিনি বই দেখিয়া বলিলেন—এঃ, একেবারে সব গোলমাল করে দিয়েছে। পণ্ডিতদের এইজন্য আমি ভয় করি, তাদের আদৌ কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। এই দেখ অনুবাদক ভূমিকায় কী লিখেছেন-The climax surely is reached when the little boy and his parents leave the village. The sister is dead, the cast has already broken up. With these considerations in mind we have ended the book with the boy looking out of the train window sobbing goodbyes to his

sister, his home and village. The film version also ended at this point. We wonder why the author was of another mind!

পড়া শেষ করিয়া দ্বিজেনবাবু কাজলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—এবার বুঝলে তো ব্যাপারটা? অনুবাদকের মনে হয়েছে ওইখানেই উপন্যাস শেষ হওয়া উচিত ছিল, আর সেই মনে হওয়ার সমর্থনে তিনি খাড়া করেছেন সিনেমার উদাহরণকে। সিনেমা আর সাহিত্য দুটো আলাদা শিল্পমাধ্যম, একটার সমর্থনে আর একটাকে যুক্তি হিসেবে দাঁড় করানো যায় না। সিনেমা

www.bengaliebook.com

থেকে কেউ সাহিত্যরচনা করে না, সাহিত্যকে অবলম্বন করেই সিনেমা তোলা হয়। অপূর্ব রায়ের মতো লেখকের রচনাকে এভাবে–আচ্ছা, এই প্রকাশকের সঙ্গে যে চুক্তি সই করেছিলে সেই কনট্রাক্ট-এর কপি আমাকে একবার দেখাতে পার?

প্রয়োজন হইতে পারে ভাবিয়া চুক্তিপত্রটি কাজল সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। পকেট হইতে বাহির করিয়া কাগজখানা সে দ্বিজেনবাবুর হাতে দিল। মনোযোগ দিয়া সেটি পড়িয়া তিনি বলিলেনতোমারও ছেলেমানুষি! একনম্বর, এটা কিন্তু পারপেচুয়াল কনট্র্যাক্ট হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ কতগুলো এডিশনের জন্য বা কত বছরের জন্য তুমি পারমিশান দিচ্ছ এতে তা কিছু লেখা নেই। দুনম্বর, মূল রচনাকে কোনভাবেই খণ্ডিত বা বিকৃত করা যাবে না এমন কোনো শর্ত তুমি দাও নি

–আমার মাথাতেই আসেনি কেউ এমন করতে পারে

–ঠিক। তুমি ছেলেমানুষ, অনভিজ্ঞ। আমাদের কাউকে একবার দেখিয়ে নেও উচিত ছিল। যাক, যা হবার তা হয়ে গিয়েছে–

–এই ভুল শোধরাবার কোনো উপায় কি নেই কাকাবাবু?

একটু ভাবিয়া দ্বিজেনবাবু বলিলেন–তুমি প্রকাশককে চিঠি দিতে পার এমন খণ্ডিত অনুবাদ প্রকাশের কারণ জানতে চেয়ে। তবে তাতে খুব একটা ফল হবে না, ওরা বলবে অনুবাদক যে কপি দিয়েছেন তাই ওরা ছেপেছে, আর অনুবাদকের স্বাধীন ইচ্ছামতো কাজ করবার অধিকার তো তুমি দিয়েই রেখেছ।

-তাহলে?

www.bengaliebook.com

–অন্য একটা পথ আছে।বইটার সম্পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশ করবার জন্য তুমি অন্য কোনো প্রকাশককে অনুমতি দিতে পার। সেটা অবশ্য এক্ষুণি হবে না, কিন্তু একদিন হবেই। অপূর্ব রায়ের লেখার খ্যাতি এবং চাহিদা ক্রমেই বাড়বে। ভবিষ্যতে অন্য ভাষায় প্রকাশের সময় এ ভুল আর কোরো না। আমাদের দেশের কোনো ইংরেজি প্রকাশককে কেবলমাত্র ভারতবর্ষের জন্য একটি এডিশন করতে বলতে পারো। পাঠ্যবস্তু বা টেক্সট বদলে গেলে তা আলাদা বই হিসেবে বিবেচিত হবে–

কাজল বলিল–বিদেশের একজন বড়ো সমালোচক কিন্তু এ ব্যাপারটার নিন্দে করেছে। দেখুন। অক্সফোর্ড মেল-এ কী লিখেছে–

পত্রিকার প্রতিলিপিটি বাহির করিয়া সে দ্বিজেনবাবুকে পড়িয়া শোনাইল- The painstaking translators of this book have decided that the author was so simple that he did not know where best to end the book, so they have chosen a different point from him, the same point chosen by the director for the film. Well, the translators are scholars and must know what they are about, but the book is so well-written that to the laymen the author cannot have been all that simple. Western writers today know about non-communication, about sex, betrayal, murder, nervous disorder, but this Bengali writer, Mr. Roy, can teach them a thing or two about the basic.

দ্বিজেনবাবু চোখ বুঁজিয়া শুনিতেছিলেন, এবার তাকাইয়া বলিলেন—যাক, কারও কারও তাহলে কাণ্ডজ্ঞান এখনো একেবারে নষ্ট হয়নি। শোনো কাজল, এ নিয়ে তুমি চিন্তা কোরো না। আমি যদি সত্যি সাহিত্য বুঝে থাকি, তাহলে অপূর্ববাবুর লেখা বহু-বহুদিন থাকবে। যখন তুমি কিংবা আমি থাকবো না, আমাদের পরবর্তী পাঁচ-দশ-পনেরো পুরুষ কেটে যাবে, ইতিহাস আর সমাজ সব বদলে যাবে, তখনও তোমার বাবার লেখা থাকবে। এর মধ্যে কত অনুবাদ হবে, কত নতুন এডিশন বেরুবে, আজকের এই ত্রুটি কেউ মনে রাখবে না। শিল্পের সমস্ত শাখার মধ্যে সাহিত্য সবচেয়ে দীর্ঘজীবী। উপেক্ষা করো, অপেক্ষা করো—

জীবনটা নিজের ইচ্ছামতো সরলভাবে কাটানো ভারি কঠিন, প্রায়ই নানারকম ঝামেলা আসিয়া উপস্থিত হয়। মৌপাহাড়ি ছাড়িয়া আসিবার পর সেখানকার বাড়িটা কিছুদিন খালি পড়িয়াছিল, পরে এক বাঙালি ভদ্রলোক হৈমন্তীর অনুমতিক্রমে সেখানে বাস করিতেছেন। তিনি বলিয়াছিলেন-বৌদি, আমি গরিব ব্রাহ্মণ, বর্তমানে আশ্রয়হীন। আপনার বাড়িটা খালি পড়ে রয়েছে, আমাকে একটু থাকতে দেবেন? বাড়িটা এমনি পড়ে থাকলে নষ্ট হয়ে যাবে, দেখাশুনো করা প্রয়োজন। আমি কেয়ারটেকার হয়ে থাকব, আমাকে কোনো পারিশ্রমিক দিতে হবে না, আমিও গরিব লোক— আপনাকে ভাড়া দিতে পারব না, গায়ে গায়ে শোধ হয়ে যাবে। আমার ছেলেটা নিজের পায়ে একটু দাঁড়িয়ে গেলে আর মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেলে আপনার বাড়ি আমি ছেড়ে দেব

এইরূপ ব্যবস্থায় হৈমন্তী আপত্তি করে নাই। কিন্তু যে ঝামেলা ঘরে আহ্বান করিয়া আনা হইল তাহার স্বল্প প্রকাশ হইতে তখনও দেরি ছিল।

মৌপাহাড়ির বাড়িতে বসবাসকারী ভদ্রলোকের মেয়ের বিবাহ হইয়া গেল, ছেলেটিও শহরের পাশে তামার কারখানায় মোটামুটি ভালো কাজ পাইয়া গেল, কিন্তু তিনি বাড়ি ছাড়িবার কোনো উদ্যোগ করিলেন না। প্রতি সপ্তাহেই,

www.bengaliebook.com

বিশেষ করিয়া ছুটির দিনগুলিতে, অপুর বাড়ি দেখিতে কিছু কিছু, ভক্তের দল যায়। তাহারা ভিতরে ঢুকিতে পায় না, বাহির হইতে বাড়িটার চেহারা দেখিয়া ফিরিয়া আসে। উঠানে হৈমন্তী একটি ছোট স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিল, তাহাতে গ্রথিত একটি শ্বেতপাথরের ফলকে অপুর স্মৃতিতে নিবেদিত হৈমন্তীর লেখা কবিতা উৎকীর্ণ আছে। কেহ কেহ সেই স্তম্ভে মালা দিয়া যায়, ধূপকাঠি জ্বালিয়া দেয়। সাহিত্যিক অপূর্বকুমার রায়ের স্মৃতিরক্ষা যথাযথভাবে হইতেছে না বলিয়া ইহারা অনুযোগ করে, খবরের কাগজে চিঠি লেখে। বসবাসকারী ভদ্রলোককে হৈমন্তী বহুবার উঠিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে, কোনো ফল হয় নাই। ভদ্রলোক বিনীতভাবে কেবলই আরও কিছু সময় প্রার্থনা করেন। ওই বাড়িতে হৈমন্তীর একটি সংগ্রহশালা স্থাপন করিবার ইচ্ছা, সেখানে অপুর লিখিবার কলম, পাণ্ডুলিপি, জামাকাপড়, ব্যবহৃত অন্য দ্রব্যাদি ও ছবি থাকিবে। পাশের ঘরে লাইব্রেরি হইবে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের সংগ্রহ। কিন্তু এসব করিতে হইলে আগে তো বাড়িটা খালি হওয়া চাই।

পূজার কিছুদিন পরেই কাজল মৌপাহাড়ি যাওয়া স্থির করিল। চিঠি লিখিয়া সব কাজ হয় না। একবার নিজে গিয়া ভদ্রলোককে বলিয়া দেখিতে হইবে। হৈমন্তী কিন্তু সঙ্গে যাইতে চাহিল না। যেখানে তাহার সমস্ত পার্থিব সুখ আর শুরুর আনন্দ অকালে ঝরিয়া গিয়াছিল, সেখানে গেলে হারানো স্মৃতির সুতীব্র যন্ত্রণা তাহাকে দগ্ধ করিবে। একান্ত প্রয়োজন না হইলে সে আর মৌপাহাড়ি যাইবে না।

বম্বে এক্সপ্রেস যখন মৌপাহাড়ি পৌঁছাইল তখন বিকালের ছায়া ঘন হইতেছে। কাজল স্থানীয় হাইস্কুলের হেডমাস্টারের বাড়ি থাকিবে স্থির করিয়া তাহাকে আগেই পত্র দিয়াছিল। তিনি আন্তরিকতার সহিত কাজলকে অভ্যর্থনা জানাইলেন। তাঁহার কাছে নিজের সুটকেসটি রাখিয়া সে উঁচুনিচু লালমাটির প্রান্তরের ভিতর দিয়া সুবর্ণরেখা নদীর দিকে চলিল। সন্ধ্যা নামিতে আর

www.bengaliebook.com

বিশেষ দেরি নাই, প্রথম হেমন্তের শীত শীত ভাব গায়ে কাঁটা ধরায়। দুরেব পাহাড় নীল দেখায়, কিন্তু আসন্ন সন্ধ্যার আরছায়াতে সিদ্ধেশ্বর ডুংরিকে ধূসর দেখাইতেছে। সুবর্ণরেখা নিজের বালুকাময় শরীর এলাইয়া প্রাঙ্গরের বুকে প্রসারিত। কাজল অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিল।

দিগন্তে মসীরেখার মতো ওই অরণ্য, ওই নিশ্চল পর্বতমালা, এই আকাশ-বাতাস নির্জনতা এবং প্রথম ফুটিয়া ওঠা দু-চারটি নক্ষত্র, এসবের মধ্যেই বিশ্বের প্রতি কণার ভিতর দিয়া প্রবহমান জীবনধারা লুকাইয়া আছে। এই বহিঃপ্রকৃতিই জীবন ও চৈতন্যের প্রকৃত ধাত্রী। নগরের উচ্চকিত কোলাহলে একধরনের ভাসমান তরল আনন্দ আছে বটে, কিন্তু তাহা মনকে সংস্থিত করে না।

কবে, বহুদিন আগে সে বাবার সঙ্গে এই রাঙামাটির পথে বেড়াইত। সময়ের বাঁকে ফেলিয়া আসা সেইসব স্মৃতি হেমন্ত-গোধূলির পরিবেশকে বেদনার রঙে ধূসর করিয়া তুলিয়াছে। নিতান্ত সাধারণ এবং পরিচিত সত্যও এক-একসময় মনের মধ্যে বিদ্যুতের আলোর মতো চমকাইয়া ওঠে, চেতনাকে অভিভূত করে। এই মুহূর্তে আসন্ন সন্ধ্যার আরছায়াতে সুবর্ণরেখার তীরে দাঁড়াইয়া তাহার মনে হইল-সে-সব পুরোনো দিন আর ফিরিবে না। সময়ের একমুখী স্রোত তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠতম দিনগুলিকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে।

কী একটা দেরি করিয়া বাসায় ফেরা পাখি ডানা ছড়াইয়া নদীর এপার হইতে ওপারে চলিয়া যাইতেছে। কেহ কোথাও নাই, হঠাৎ এক আশ্চর্য অনুভূতিতে তাহার মন-কেমন করিয়া উঠিল।

এই আরছা অন্ধকারে, ওই পাথরটার আড়ালে, সুবর্ণরেখার অর্ধশুষ্ক শিলাস্তীর্ণ প্রসারে, এই রহস্যময় হৈমন্তী বাতাসে যেন তাহার বাবা মিশিয়া আছে। ডাকিলেই সাড়া পাওয়া যাইবে। কেবলমাত্র এখানে নয়, বিশ্বের সুদূরতম

www.bengaliebook.com

নীহারিকার কোনো নক্ষত্রের চারিদিকে পবিক্রমারত অজানা একটি সুন্দর, সবুজ গ্রহেও তাহার বাবাকে পাওয়া যাইবে। বাবার মতো এমন মানুষ সে আর দেখে নাই। পার্থিব জীবন তাহার বাবাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল, মৃত্যুতে মুক্তি আসিয়া সৃষ্টি প্রতিটি কণায় পরিব্যাপ্ত করিয়াছে।

আলোর পাখি আর কখনও অন্ধকার বাসায় ফিরিয়া আসে না। তবু কাজলের মনে হইল কত লোক তো কত বয়েস পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকে, যদি বাবাও থাকিত।

আর একটিবার বাবার সঙ্গে দেখা হয় না?

www.bengaliebook.com

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

যেজন্য মৌপাহাড়িতে আসা তাহার বিশেষ কিছু সুরাহা হইল না। তাহাদের বাড়িতে বসবাসকারী ভদ্রলোক পুনরায় বিনয়ের সঙ্গে বলিলেন, তাহার আরও খানিকটা সময় প্রয়োজন। কতটা সময়? না, সেটা তিনি এখনই বলিতে পারিতেছেন না, তবে সবদিক একটু গুছাইয়া উঠিতে পারিলেই তিনি নিজেই তাহা জানাইয়া দিবেন। পরের বাড়ি অধিকার করিয়া থাকা! ছি ছি, সে প্রবৃত্তি যেন তাহার কখনও না হয়।

কাজল বুঝিতে পারিল এ বাড়ি সহজে উদ্ধার হইবে না। ভদ্রলোকের বিনয় এবং ব্যবহারের মিষ্টতা যে একান্তই মিথ্যাচার তাহা তাঁহার চোখের দিকে তাকাইলে বুঝিতে বাকি থাকে না। অপূর্বকুমার রায়ের ভক্তের অভাব নাই, কিন্তু তাহারা তাহাদের প্রিয় লেখকের স্মৃতিরক্ষার জন্য সঙঘবদ্ধ হইয়া লড়িবে—এ আশা করা বৃথা। তাহার বাবার সঙ্গে পরিচয় এবং বন্ধুত্ব ছিল এমন লোকও মৌপাহাড়িতে এখন বিশেষ নাই। অনেক সময় কাটিয়া গিয়াছে, পটভূমির সার্বিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, প্রকৃত সাহায্য দান করিবার মতো কেহ কোনদিকে নাই।

যে খাটে ছোটবেলায় সে বাবা ও মায়ের সঙ্গে ঘুমাইত, সেই খাটে বসিয়া বিড়ি টানিতে টানিতে লোকটা ছদ্ম বিনয় করিতেছে। যে কুলুঙ্গিতে তাহার মায়ের লক্ষ্মীর আসন পাতা ছিল, সেখানে এখন বার্লির কৌটা, নারিকেল তেলের শিশি, এক বাক্স টেক্কা-মার্কা দেশলাই এবং আরও কী কী যেন রহিয়াছে। এমন অদ্ভুত পরিস্থিতিতে সে কখনও পড়ে নাই। তাহার বাবার পবিত্র স্মৃতিপূত বাড়ি, সেখানে অন্য লোক বাস করিতেছে, বলিলেও উঠিতেছে না। সে নিজেও অন্যের বাড়িতে রাত কাটাইতেছে। বাড়িটা কি হাতছাড়া হইয়া যাইবে? সম্পত্তির ওপর তাহার বিন্দুমাত্র লোভ নাই, কিন্তু

বাবার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা তো করিতেই হইবে। তাহার বাবার সাহিত্য যে চিরজীবী হইবে ইহাতে তাহার কোনো সন্দেহ নাই। আগামীযুগের মানুষ তাহার কাছে কৈফিয়ৎ চাহিবে–এত বড়ো সাহিত্যিকের সন্তান হইয়া সে পিতার স্থায়ী স্মৃতিরক্ষার জন্য কী করিয়াছে?

সে কী করিতে পারে? একা?

অবশ্য একথা ঠিক যে, বড়ো সাহিত্যিকের স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য আলাদা ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয় না, নিজের রচনার মধ্যেই তিনি বাঁচিয়া থাকেন। পাঠক আগ্রহ করিয়া না পড়িলে লাইব্রেরি আর সংগ্রহশালা স্থাপন করিয়া কোনো লাভ নাই। পৃথিবীতে কোথায় হোমার বা কালিদাসের স্মৃতিভবন আছে? কিন্তু মানুষ তাঁহাদের ভুলিয়া যায় নাই।

না, উপমাটা যথাযথ হইল না, সেকালের সহিত আধুনিক যুগের অনেক তফাৎ। সেকালে মুদ্রণযন্ত্র ছিল না, সংরক্ষণের বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই। মানুষ কাব্য শুনিয়াই তৃপ্ত হইত। মুখে মুখে তাহা প্রচারিত হইত, অথবা উৎসাহীরা হাতে লিখিয়া পুঁথির নকল করিয়া লইত। আজ 'রঘুবংশ'-এর পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গেলেও কি নিশ্চিতভাবে বলা যাইবে যে তাহা স্বয়ং কালিদাসেরই হস্তাক্ষর?

কিন্তু যুগ বদলাইয়াছে। এখন সে বাবার পাণ্ডুলিপি, কল ডায়েরি, জামাজুতা সবই ইচ্ছা করিলে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারে। এই কাজ সে না করিলে সব হারাইয়া যাইবে, তছনছ হইয়া যাইবে। আজ হইতে পাঁচশত বৎসর পবে সে থাকিবে না, বর্তমান পৃথিবীব ভৌগোলিক মানচিত্র বদলাইয়া যাইবে, শক্তি হস্তান্তরিত হইবে পাত্র হইতে পাত্রান্তরে, এবাবেব বসন্তে যত কোকিল ডাকিয়াছিল তাহাদের বংশ অতীতেব ছায়ামূর্তিতে পর্যবসিত হইবে–কিন্তু

তাহার বাবা থাকিবে। সেই আগামীকালের উৎসুক মানুষদের জন্য ভাবিতে হইবে।

বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময উঠানেব স্মৃতিস্তম্ভটার দিকে তাহার নজর পড়িল। সাদা পাথরের ফলকে তাহার মায়ের লেখা কবিতাটি উৎকীর্ণ বহিছে। বাতাসের সঙ্গে ভাসিযা আসা লাল ধুলায় পাথরটা বিবর্ণ। সে পকেট হইতে রুমাল বাহিব করিয়া সযত্নে পাথরের গা হইতে ধুলা ঝাড়িয়া দিতে লাগিল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক বারান্দায় দাঁড়াইয়া হাসিয়া বলিলেন—অনেক ধুলো, রোজ জমছে-কত আর সাফ করবেন?

কাজল তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল—কেউ জমতে দেয়, কেউ পরিষ্কার করে। আপনি কোন দলে?

ভদ্রলোক নিঃশব্দে বাড়ির ভেতরে সরিয়া গেলেন।

হেমন্তকাল হইলেও দুপুরে রৌদ্র বেশ চড়িল। খাওয়াদাওয়া সারিয়া কাজল হেডমাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করিল। মাস্টারমশাই বলিলেন— এবার বরং একটু বিশ্রাম করে নিন, চারটেয় চা দেব-

বিকালে চা খাইয়া কাজল একটু বেড়াইতে বাহিব হইল।

রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং পার হইয়া যে রাস্তাটা শহরের বাহিরের দিকে গিয়াছে সেই পথ ধরিয়া সে চলিল। জাতীয় সড়কে উঠিয়া পথটা আবার ওপাশের জঙ্গলের মধ্যে নামিল। এই পথ ধরিয়া আট-দশ মাইল গেলে ধারাগিরি জলপ্রপাত, ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে সে একবার আসিয়াছিল। মৌপাহাড়ির আরও দুএকজন সপরিবারে সঙ্গে ছিলেন। এখনও স্বপ্নের মতো মনে পড়ে—তিনখানি গরুর গাড়ি ক্যাচকেঁচ শব্দ করিয়া মন্থর গতিতে

www.bengaliebook.com

চলিয়াছে। সময়টা ছিল বসন্তকাল, নানান লতাপাতার একটা অদ্ভুত মিশ্র গন্ধ বাতাসে। বনকাটি পাহাড় ছাড়াইয়াই বাসাডেরার দিকে পথ ক্রমশ উঁচুতে উঠিতে লাগিল। তাহার বাবা মাঝে মাঝে গাড়ি হইতে নামিয়া হাঁটিয়া চলিতেছে। বাবার হাতে একটা কী গাছের সরু ডাল, মনের আনন্দে বাবা সেটাকে একটু বাদে বাদেই তলোয়ারের মতো সাঁই সাঁই করিয়া ঘুরাইতেছে।

বাবার আগুনের মতো রঙ, বড়ো বড়ো চোখ, লম্বা উন্নত চেহারা।

বনের মধ্যে আলো পড়িয়া আসিতেছে।

বহু পিছনে ফেলিয়া আসা শৈশবের সেই দিনটা আর একবার ফিরিয়া আসে না?

কোনদিকে কেহ নাই। নির্জন বনভূমিতে আশ্চর্য অলৌকিক সন্ধ্যা নামিতেছে। একটা বড়ো অর্জুনগাছের নিচে একখানি শিলাখণ্ডের ওপর সে বসিল। অনেকদিন পরে এমন নির্জনতা সে উপভোগ করিতেছে। পৃথিবীর সমস্ত বড়ো শিল্প, তা সে সাহিত্যই হউক বা সংগীত কিংবা দর্শকই হউক, জন্ম লইয়াছে এই নির্জনতা, একাকীত্ব আর যন্ত্রণা হইতে। সে আজকাল বড়ো বেশি শহুরে হইয়া পড়িয়াছে। কোথায় গেল ছোটবেলার সেই সহজ আনন্দ, সেই দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠ, আলোর মধ্যে আরও এক আলো, চোখের মধ্যে আরও এক চোখ? জীবনকে সার্থক করিবার জন্য কী করিতেছে সে? হ্যাঁ, কিছু ভালো ভালো বই পড়িতেছে বটে, কিন্তু এই বিশাল বিশ্বজগৎটার দৃশ্যমান কর্মকাণ্ডের আড়ালে যে রহস্যময় শক্তি ক্রিয়াশীল, তাহার কতটুকু জানা হইল? সময় বড়ো কম, প্রতিদিন একদিন করিয়া সময় কমিয়া আসিতেছে।

কিছু করিতে হইবে না–ব্ল্যাকবোর্ডে বড়ো বড়ো দুর্বোধ্য অঙ্ক কষিবার প্রয়োজন নাই, ল্যাবোরেটরিতে জটিল যন্ত্র লইয়া নাড়াচাড়া করিবার দরকার নাই,

www.bengaliebook.com

দর্শনের দুরুহ তত্ত্বের জালে জড়াইবার আরশ্যকতা নাই, কেবলমাত্র এইরকম শান্ত পরিবেশে থাকিয়া দুই চোখ ভরিয়া বিশ্বের সৌন্দর্য দেখিলেই চলিবে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিদিনের বাঁচার ইতিহাস, প্রতি সকালের স্নিগ্ধ আমন্ত্রণ, মায়ের ভালোবাসা, প্রথম প্রণয়ের শিহরণ জাগানো পবিত্র অনুভূতি, মহাকাল ও মহাবিশ্ব সম্বন্ধে গভীর অনুধ্যানএই থাকিলেই চলিবে। দেহের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু প্রত্যেক চিন্তাশীল মানুষের উচিত পরবর্তী প্রজন্মের জন্য নিজের অভিজ্ঞতার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া বাখা। কীর্তিই মানুষকে অমর করে, স্বল্পকালের জীবন নহে।

আলো একেবারেই কমিয়া আসিয়াছে। সন্ধ্যার সময় বনকাটি আর বাসাডেরা পাহাড় হইতে বুনো হাতি নামে। কাজল ফিরিবার পথ ধরিল।

পেছনে শুষ্ক ঝরাপাতার ওপর কাহার যেন পায়ের শব্দ। সে ফিরিয়া তাকাইল। না, কিছু নাইকেহ নয়। হয়তো বাতাস। অথবা অতীত। অতীত তো পেছনেই থাকে।

মাঝে মাঝে একই ধরনের বিপর্যয় মানুষের জীবনের ওপর আসিতে থাকে। মৌপাহাড়ি হইতে ফিরিয়া কাজল খবর পাইল নিশ্চিন্দিপুরে তাহাদের ভিটা ও সংলগ্ন জমি কাহারা বেড়া দিয়া ঘিরিয়া লইতেছে। নিশ্চিন্দিপুরেরই একজন লোক, তাহাকে কাজল চেনে না, সে আসিয়া সংবাদটা দিয়া গেল। কোনো কোনো মানুষ দুঃসংবাদ দেওয়ার সুযোগ পাইলে ভারি খুশি হয় এমনিতে তাহারা কোনো যোগাযোগ রাখে না, কিন্তু কারুকে চিন্তিত করিয়া তুলিবার মতো পরিস্থিতি হইলে একেবারে দৌড়াইয়া আসে।

দিনদুয়েক পরে কাজল নিশ্চিন্দিপুর রওনা হইল। এখন আর আগের মতো অবস্থা নাই, একেবারে গ্রামে ঢুকিবার পথ পর্যন্ত বাস চলিতেছে। পথে-ঘাটে প্রায়ই মোটরগাড়ি দেখা যায়, গ্রামের ছেলেমেয়েরা অবাক বিস্ময়ে ছুটিয়া

আসে না। তাহার বাবা কিংবা পিসির মতো আর কি তাহারা রেলগাড়ি দেখিবার জন্য মাঠঘাট ভাঙিয়া আগ্রহে ছুটিয়া যায়? পৃথিবী বদলাইতেছে, মানুষ বদলাইতেছে, সবকিছুই বদলাইতেছে।

গ্রামে পৌঁছাইয়া কাজলের মন আরও খারাপ হইয়া গেল। পরিবর্তন এভাবে পরিচিত জীবনকে গ্রাস করে? নিশ্চিন্দিপুরের সেকালের আর বিশেষ কেহ বাঁচিয়া নাই, যাহারা আছে তাহারাও অনেকেই বিদেশে বাস করে। রানুপিসির বয়েস হইয়া গিয়াছে, চুলে পাক ধরিয়াছে, তবু সমস্ত নিশ্চিন্দিপুরে রানুপিসিই তাহার একমাত্র আশ্রয়—যাহার সঙ্গে বাল্যের একটা সম্পর্ক রহিয়াছে।

কিন্তু গ্রামে জনসংখ্যা বাড়িয়াছে। অচেনা সব লোক। এরা কোথা হইতে আসিল? দুপুরবেলা খাইতে খাইতে প্রশ্নটা সে রানুপিসিকে করিল।

রানু বলিল—আর বলিস না, আমাদের ছোটবেলার সে গা আর নেই, সব পালটে গিয়েছে। দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে দলে দলে লোক এসে জমি কিনে গাঁয়ে বাস করছে। যশোর খুলনা ঢাকা বরিশাল—আরও কত সব জেলা থেকে। আমরাই সবাইকে চিনি না, তা তুই চিনবি কোথা থেকে? অত বড়ো কুঠির মাঠ, গিয়ে দেখ তার সব প্রায় ভর্তি-

—বাড়ি উঠেছে?

—সার সার বাড়ি উঠেছে, মুদির দোকান হয়েছে, তিন-চারটে বড়ো পাড়া বসে গিয়েছে, তুই দেখলে আর চিনতে পারবি না—

তাহার পর কিছুটা যেন আত্মগত স্বরে বলিল—তোর পিসি দুর্গা আমার খুব বন্ধু ছিল। দুর্গা আর আমি মাঝেমাঝেই কুঠির মাঠে বেড়াতে যেতাম, জানিস? কত সুন্দর ছিল সে সব দিন! একটা এড়াঞ্চির ঝোপের পাশে বসে দুজনে

গল্প কবতাম-বিরাট বড়ো ঝোপ। গতবছর সুন্দরপুর যাচ্ছিলাম তোর পিসেমশাইয়ের এক আত্মীয়ের বাড়িতে, কুঠির মাঠের পাশ দিযেই পথ, দেখলাম আমাদের ছোটবেলার সে ঝোপটা আর নেই, কাবা যেন কেটে ফেলেছে। হয়তো ব্যাপারটা কিছুই না, বুঝলি? কিন্তু তোর বাবা আমার চোখ খুলে দিয়েছিল। হঠাৎ এমন মন-কেমন করে উঠল ঝোপটার জন্য যে কী বলব!

কাজল দেখিল রানুর চোখে জল আসিয়া টলটল করিতেছে।

কাজলের গলায় ভাত আটকাইয়া যাইতে লাগিল। রানুপিসির কাছে যেন তাহার এবং তাহার বাবার শৈশব জমা রহিয়াছে। কত স্মৃতি, বাবার কাছে শোনা কত গল্প, কত তুচ্ছ হাসিকান্নার মালায় গাঁথা বিস্মৃত অতীতদিন! সে বুঝিতে পারিল, পৃথিবীতে যেখানেই সে বাস করুক না কেন, আসলে তাহার আশ্রয় এই গ্রামে।

রানু বলিল–খাচ্ছিস না যে? খা–

কাজল বলিল–রানুপিসি, আমার বাবা এই গ্রামকে প্রাণেব মতো ভালোবাসতেন, তাব লেখাতেও এই গ্রামকে অমর করে রেখে গিয়েছেন। আমিও এক্ষুনি বুঝতে পারলাম আমাকেও একদিন আবার এখানে ফিরে আসতে হবে। তুমি দেখো, আমি ঠিক নিশ্চিন্দিপুবে এসে বাস করবো।

রানু যেন কেমন অবাক হইয়া কাজলের দিকে তাকাইল, তারপর বলিল–তোর বাবাও গাঁ ছেড়ে যাবার সময় ঠিক এই কথা বলে গিয়েছিল, কিন্তু কথা রাখে নি–

-বাবা যে অল্পবয়েসেই চলে গেল পিসি, নইলে ঠিক ফিরে আসত–

www.bengaliebook.com

-তুই সত্যি আসবি? সত্যি করে বলছিস?

--ঠিক আসবো পিসি। দেরি হবে হয়তো, কিন্তু সত্যি আসবো। আর—

কাজল চুপ করিয়া আছে দেখিয়া রানু বলিল—আর কী?

—তুমি ততদিন বেঁচে থেকো পিসি। নইলে আমার ফিরে আসবার মানে থাকবে না। কার কাছে, কার জন্য ফিরে আসবে বলো? কেউ তো নেই, যারা আছে তারাও বন্ধু নয়—

রানু বলিল—হারে, তোদের ভিটের চারপাশের জমিগুলো নাকি চনু ঘিরে নিচ্ছে? সত্যি?

-হ্যাঁ পিসি। কে ঘিরছে জানতাম না, খবর পেয়ে এসেছিলাম, এসে দেখি চনুর কাণ্ডচনু তোর ছোটবেলার বন্ধু না?

একসঙ্গে খেলতাম, খুব বন্ধুত্ব ছিল দুজনের।

-তোর সঙ্গে দেখা হয়েছে? কী বলল?

—এখনও দেখা হয়নি। এসেই যখন খবর পেলাম যে চনু জমি ঘিরছে, তখন ভাবলাম আগে ওর কাছেই যাই, দেখি ওর কী বলার আছে। তা ডাকাডাকি করতে চনুর ছেলে বেরিয়ে এসে বলল—বাবা বাড়ি নেই, বৈরামপুর গিয়েছে। কাল সকালে আর একবার যাবো

সামান্য বিশ্রাম করিয়া কাজল বলিল-পিসি, যাই একবার আমাদের ভিটের দিক থেকে ঘুরে আসি। ফিরে এসে চা খাবো। আজ সন্ধেবেলা চালভাজা খাওয়াবে পিসি? অনেকদিন খাইনি

www.bengaliebook.com

কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। মালতীনগরে রোজ সে চালভাজা খায় না সত্য, কিন্তু ইচ্ছা হইলেই মাঝে মাঝে সে মাকে বলে। হৈমন্তী ছেলের জন্য কাঠখোলায় চাল ভাঙ্গিয়া দেয়। আসলে সে জানে কোন আরদার করিলে রানুপিসি খুশি হইবে। রানু বলিল—একটু দাঁড়া, কাপড়টা বদলে নিই, আমিও তোর সঙ্গে যাবে।

বাঁশবাগানের ভিতর দিয়া পথ। বেলা এখনও বেশ আছে, কিন্তু বাঁশবনের মধ্যে কেমন একটা রহস্যময় আলোছায়ার জগৎ। প্রাণের শিকড় যে জমিতে আছে সেখানে উপস্থিত হইলে মানুষ যুক্তি ভুলিয়া যায়, প্রাচীন ঐতিহ্য রক্তের মধ্যে অশান্ত কল্লোল তোলে। কাজলের মনে হইল প্রতি পা ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে সে এক অদ্ভুত জগতে প্রবেশ করিতেছে-যেখানে সবই সম্ভব। এখুনি সে তাহার ঠাকুমা কিংবা ঠাকুরদাকে দেখিতে পাইবে, তাহার বাবাকে কিশোররূপে খেলা করিতে দেখিতে পাইবে। অনেকদিন আগের সে যুগটা আবার পুরাতন নাটকের মতো তাহার সামনে অভিনীত হইবে। বাহিরের পৃথিবীটা এখানে তাহার বুঢ় প্রভাব বিস্তার কবিতে পারে নাই। এখানে মেঘের ছাযাব মতে, ফুলের হাল্কা গন্ধের মতো, দূরত বাঁশির শব্দের মতো, মায়ের স্নেহের মতো নরম আলোয় পবিবেশ পরিপূর্ণ। সত্য জীবন এখানেই বিকশিত, যে জীবন হাজার বছর ধরিয়া নির্জনে শান্ত স্রোতস্বিনীর মতো প্রবাহিত।

রানু বলিল—ঠিক এইখানটায় ছিল তোদর খিড়কির দরজা। তোর ঠাকুমা ঘুমিয়ে পড়লে দুগগা এই দরজা দিয়ে পালিয়ে আসত, আমরা পুরোনো দীঘির আমবাগানে বসে গল্প করতাম, তেঁতুল মেখে খেতাম

আবার সেই বুনো গন্ধটা বাহির হইয়াছে, এখানে আসিলেই কাজল যেটা পায়।

বাড়ির সব দেওয়ালই পড়িয়া গিয়াছে, ঢুকিবাব আর কোনো পথ নাই। ঘেঁটু, কালকাসুলে আর আসশেওড়ার জঙ্গলে ভিটা ঢাকা পড়িয়াছে, গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে ধ্বংসস্তূপের দু-একখানা ইট দেখা যায়। শান্ত অপরাহ্ন। ওপাশের সজিনা গাছের ডালে বসিয়া কী একটা পাখি ডাকিতেছে।

কাজলের বুকের ভিতরটা অদ্ভুত এক অনুভূতিতে ভরিযা উঠিল। তাহার পিতা-পিতামহপ্রপিতামহ যেন মহাকালের স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, তেমনই একদিন সেও কোথায় অনির্দেশ্য ভবিষ্যতের অলিন্দপথে মিলাইয়া যাইবে। আজকের আনন্দ, ভালোবাসা, ওই নাম-না-জানা পাখিটা, সামান্য কয়েককাঠা জমি লইয়া বাল্যবন্ধুর ষড়যন্ত্র—এসব কোথায় থাকিবে সেই দূর ভবিষ্যতে?

থাকিবে বিশুদ্ধ আনন্দ আর থাকিবে মহাজীবন। সে থাকিবে না, মহাজীবন থাকিবে।

সন্ধ্যার পর চনুর সঙ্গে দেখা হইল। তাহার কথাবার্তার ধরনে কাজলের দৃঢ় বিশ্বাস হইল সে মিথ্যাকথা বলিতেছে। সে বৈরামপুর যায় নাই, বাড়িতেই ছিল। কাজল যে খবর পাইয়া হঠাৎ আসিয়া পড়িবে, এটা সে ভাবে নাই, কাজেই কী বলিবে তাহা ঠিক করিবার জন্য দেখা করিবার সময়টা পিছাইয়া দিতেছিল।

শুক্লপক্ষ। চমৎকার জ্যোৎস্নায় চারদিক মায়াময় দেখাইতেছে। এমন সুন্দর পরিবেশে কাজল চনুর সঙ্গে বৈষয়িক আলোচনায় বসিল। কাজল জিজ্ঞাসা করিল—কেমন আছিস বল, অনেকদিন দেখা হয় না—

www.bengaliebook.com

–ওই একরকম। আমাদের আবার থাকা! তোমরা শহরে বড়ো বড়ো ব্যাপার নিয়ে থাকো, তোমাদের ব্যাপারই আলাদা। আমরা ভাই গাঁয়ের মানুষ খেটে খেতে হয়, আমাদের দুঃখ তোমরা বুঝবে না–

চনুর ঠেস দেওয়া কথার ধরনে কাজলের মনটা খারাপ হইয়া গেল। একটু কুশল প্রশ্ন নাই, কিছু নাই, বহুদিন পর প্রথম দেখায় শৈশবের বন্ধুর মুখে এসব কী কথা? আর শহরে থাকে বলিয়া সে কি শ্রম করে না? হয়তো মাঠে চাষের কাজ করে না, কিন্তু যে কাজ সে করে তাহাতে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয়। যাহার যা কাজ!

সে বলিল–তুই আমাকে তুমি করে কথা বলছিস যে বড়ো? আমরা ছোটবেলার বন্ধু না?

–না ভাই, ছোটবেলার কথা ছেড়ে দাও। এখন কি আর তোমাদের সঙ্গে আমার মেলে?

তাহাদের পুরানো ভিটার দিকের বকুল গাছটা হইতে একটা নিমপেঁচা ডাকিয়া উঠিল। উঠানে জ্যোৎস্নায় গাছপালার পাতা আর ডালের ছায়া পড়িয়া কাঁপিতেছে।

কাজল বলিল–বিকেলে আমাদের ভিটের দিকে গিয়েছিলাম, দেখলাম অনেকখানি জমি কারা বেড়া দিয়ে ঘিরে রেখেছে–তুই এ ব্যাপারে কিছু জানিস?

চনু অকারণেই একটু গরম হইয়া বলিল–আমি ঘিরেছি। আমাদের জমি আছে, তাই ঘিরেছি। কেন, তাতে কী হয়েছে?

www.bengaliebook.com

-রাগ করছিস কেন ভাই? আমি কি অন্যায় কিছু বলেছি? ওদিকটায় তোর কিছুটা জমি আছে সে আমি জানি, কিন্তু দেখে মনে হল আমাদের কিছু জমি তোর দেওয়া বেড়ার মধ্যে ঢুকে গিয়েছে। তাই

-তাই কী? তুমি ভুল করছে, ওখানে তোমার কোনো জমি নেই-

কাজল দুঃখিত গলায় বলিল—আছে কিনা সে আমরা দুজনেই জানি। মনের অগোচরে তো কোনো সত্য গোপন থাকে না। তুই এমন করলি কেন? আমাকে একবার খবর দিলে তো পারতিস! তোর জমির প্রয়োজন থাকে, আমি তোকে অন্য জায়গায় জমি দিতাম। বাবা মারা যাবার আগে গ্রামে কিছু জমি মায়ের নামে কিনে দিয়ে গিয়েছিলেন, তার থেকে দিতাম। তোর পছন্দমত প্লট বেছে নিতে পারতিস, আমি টাকা নিতাম না। তুই ছোটবেলার বন্ধু হয়ে আমার সঙ্গে এমন করলি?

-অন্য জায়গায় জমি নিয়ে আমি কী করবো? বাড়ির লাগোয়া না হলে আমার চলবে না। তাছাড়া আমি কোনো অন্যায় করিনি-জমি আমার।

-পুরোনো ভিটের পাশে পৌনে একবিঘে জমির টুকরোটা কি করে তোর হল চনু?

চনু বলিল—এটা তোমার বাবা আমার মাকে দান করেছিলেন। আমার কাছে কাগজ আছে—

কাজল প্রথমটা এত অবাক হইয়া গেল যে তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, তাহার পর সে বলিল—কাগজ আছে? কী কাগজ? পাকা দলিল, না দানপত্র?

-কেন, পাকা দলিল না হলে কি তুমি মানবে না?

www.bengaliebook.com

–তা নয়, বাবা যদি সাদা কাগজেও কাউকে কিছু লিখে দিয়ে থাকেন আমি তার মর্যাদা দেব। কই সে কাগজ?

চনু বলিল–আজ রাত্তিরে খুঁজে বার করতে পারব না। কাল সকালে এসো, দেখাব।

নিমপেঁচাটা আবার ডাকিয়া উঠিল।

জ্যোৎস্নাভরা এই উঠানে সে আর চনু ছোটবেলায় খেলা করিত। তে হি নো দিবসাঃ গতা।

কাজল বলিল–আচ্ছা ভাই উঠি। কাল সকাল আটটা নাগাদ একবার আসব, দেখাস কাগজখানা। বাবা যদি সত্যি ও জমি তোদের লিখে দিয়ে থাকেন, তাহলে অন্তত আমার দিক থেকে তোর কোনো চিন্তা নেই। চলি।

হেমন্তরাত্রিতে হালকা কুয়াশার আররণে তাহাদের গ্রামের কী অপূর্ব রূপই না বিকশিত হইয়াছে! হায় রে, ইহার সঙ্গে মানুষগুলিও যদি ভালো হইত! সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে ইহাদের মন সঠিকভাবে বাড়িয়া ওঠে নাই, এই গ্রামের দিগন্তেই তাহাদের জীবনের দিগন্তের সীমা। সংস্কৃত উপকথার সেই যাযাবর হাঁসেদের কথা মনে পড়িল, যাহারা মানস সরোবর যাইবার পথে বাংলাদেশের এক গ্রামে একটি ছোট পুকুরের ধারে রাত্রির আশ্রয় লইবার জন্য নামিয়াছিল। স্থানীয় গ্রাম্য হাঁসেরা বুঝিতে পারিল না, এত কষ্ট করিয়া তাহারা কেন মানস সরোবরে যাইতেছে, কী আছে সেখানে? যাযাবর হাঁসেরা হিমালয়ের পর্বতশৃঙ্গ, তুষার আর অপার্থিব সৌন্দর্যের বিবরণ দিল। শুনিয়া গ্রাম্য হাঁসেরা হাসিয়া আকুল। সেখানে তাহাদের পুকুরের মতো গুগলি পাওয়া যায় কি? তাহা না হইলে এত কষ্ট করিয়া কী লাভ?

রানুপিসিদের বাড়ির পথে বাঁশবাগানটায় ঢুকিয়া কাজল দাঁড়াইয়া পড়িল।

এমন সৌন্দর্যময় রাত্রিও পৃথিবীতে আসে! চারিদিক নিঃশব্দ, কেবল দূরে কাহাদের বাড়িতে একটা কুকুর ডাকিতেছে। জ্যোৎস্নায় বাঁশপাতার নকশাকরা ছায়া মাটিতে পড়িয়াছে। বাতাসে আসন্ন শীতের মনোরম স্পর্শ আর কীসের যেন মৃদু সুগন্ধ। কবেকার সব কথা যেন মনে পড়িয়া যায়, তাহার জন্মেরও আগে ঘটিয়া যাওয়া সেসব ঘটনা কী করিয়া তাহার চেতনায় ধরা দিতে পারে তাহা সে বুঝিতে পারে না, কিন্তু কেমন একটা মেদুর অনুভূতি হয় সে কথা সত্য। জীবনের পটভূমি অকস্মাৎ অনেক বিস্তৃত হইয়া যায়। সে কেবল তাহার গৃহাঙ্গনে, ভারতবর্ষে কিংবা পৃথিবী নামক এই গ্রহটায় বাস করে না, বিশাল অনন্ত বিশ্ব সমস্ত নক্ষত্র নীহারিকাসহ তাহার অস্তিত্বের অংশ, এই সুন্দর জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি সেই মহত্তর জীবনের সংবাদ পৌঁছাইয়া দিতেছে। আনন্দ–আনন্দেই মুক্তি, আনন্দেই সত্যকার বাঁচিয়া থাকা।

পরের দিন চনু তাহাকে একটা ময়লা কাগজের টুকরা হাতে দিয়া বলিল–এই যে, পড়ে দেখ–

কাজল হাসিবে কী কাঁদিবে ঠিক করিতে পাবিল না। বহু ভাঁজ হওয়া একটা নোংরা কাগজ, তাহাতে আঁকাবাঁকা অক্ষরে, ভুল বানানে একখানি হিজিবিজি জমি দানের প্রতিশ্রুতি। নিচে লেখা– অপূর্বকুমার রায়। এই হস্তাক্ষর কখনওই তাহার বাবার নহে। স্বাক্ষরের নিচে যে তারিখ, তাহার দেড় বৎসর আগেই তাহার বাবা মারা গিয়াছে। বেচারা চনু! গ্রাম্যবুদ্ধিতে সঠিক হিসাব করিয়া উঠিতে পারে নাই। এরূপ ভৌতিক দানপত্র সহসা দেখা যায় না।

কাগজটা চনুর হাতে ফেরত দিয়া কাজল বলিল–চনু, আমার এক মাস্টারমশাই বলতেনসত্যি কথা বলতে প্রয়োজন সাহসের, আর মিথ্যে কথা বলতে বুদ্ধির। ঠিক বলতেন না?

-কী বলতে চাও তুমি?

–কিছুই না। এটা আমার বাবার হাতের লেখা নয়।

–আমি এই কাগজ জাল করেছি বলতে চাও?

–সেটা তো আমার চেয়ে তুই-ই ভালো জানিস। তাছাড়া এমন একটা লেখাকে দানপত্রও বলে না। আইনের চোখে এ জিনিস টিকবে বলে মনে হয় না। এতে অনেক গোলমাল রয়েছে।

চনু রাগিয়া অস্থির হইল। জমি সে কাহাকেও ছাড়িয়া দিবে না, তাহার জন্য সে শেষ অবধি দেখিতে রাজি।

কাজল চুপ করিয়া সব শুনিল, তারপর বলিল–কাউকে পোড়াতে নিয়ে গিয়েছিস কখনও?

আলোচনার দিক বদলে থতমত খাইয়া চনু বলিল–তার মানে?

-গিয়েছিস কখনও?

-গিয়েছি তো, তাতে কী?

শান্ত গলায় কাজল বলিল–আমি প্রথম আমার দাদামশাইকে দাহ করতে নিয়ে যাই। তুই তো তাঁকে দেখেছিস-সুরপতিবাবু, মনে আছে? তার আগে আর কখনও চোখের সামনে শবদাহ দেখিনি। দাদু খুব রাশভারী মানুষ ছিলেন, লোকে তার চোখে চোখ রেখে কথা বলতে সাহস পেত না। সেই দাদুকে যখন চিতায় ওঠানো হল, দেখলাম কী অসহায়ভাবে তার দেহ চিৎ

হয়ে পড়ে আছে। মন্ত্র পড়া হলে শ্মশানের পুরোহিত দাদুর দেহের ওপর আরও কখানা কাঠ চাপিয়ে দিয়ে তলা থেকে টেনে তার শরীরে ঢাকা দেবার শেষ কাপড়টুকুও বের করে নিল। উলঙ্গ ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, উলঙ্গই চলে গেলেন।

চনুর গলার তেজ কমিয়া আসিয়াছে, অবাক গলায় সে বলিল–কী বকছো পাগলের মতো? কী বলতে চাও তুমি?

-বলতে চাইছি যে, সেই প্রথম আমার মনে হল–এ দুনিয়া থেকে কেউ কিছু নিয়ে যেতে পারে না। আমরা সবাই কথাটা জানি, কিন্তু কেউ মনে রাখি না। খামোকা পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কয়েকটা বছর ঝামেলা করে কাটাই। ও জমি আমি কোনেদিন ভোগ করতে আসবো না চনু, ওখানে আমার বাবার স্মৃতিভবন তৈরি হবে। তাকে অনেক লোক ভালোবাসে। তাদের সেই ভালোবাসার জোর থাকলে ওখানে স্মৃতিভবন হবেই, কেউ আটকাতে পারবে না। সে বন্যার জল তুই ঠেকাতে পারবি না। যদি তা না হয়, তাহলে সেটাকেই ভবিতব্য বলে মেনে নেব। তোর সঙ্গে আমার কোন ঝগড়া নেই। ততদিন কলাবাগান কর না, ক্ষতি কী-তবে আমাকে বলে কবলেই পারতিস, তাতে অন্তত আমাদের বন্ধুত্বটা নষ্ট হত না।

খাওয়া-দাওয়া করিয়া একটু বেলায় কাজল বাড়ির দিকে রওনা হইল। বানু ছোটবেলার মতো তাহার চিবুক ধরিয়া চুমু খাইয়া বলিল–তাড়াতাড়ি আবার আসবি, কেমন? একবার মাকে নিয়ে আয় না

-মায়ের শরীর মোটে ভালো যাচ্ছে না পিসি। আসলে বাবার মারা যাওয়াটা মা কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি, মনের কষ্টে ভেতরটা আস্তে আস্তে ক্ষয়ে যাচ্ছে। এমন দিন যায় না যেদিন বাবার কথা বলতে বলতে মা কাঁদে না

রানু বলিল–আমরা কেউ তোর বাবাকে ভুলি নি, তোর মাকে সে কথা বলিস-

www.bengaliebook.com

গ্রামের পথ আঁকিয়া- বাঁকিয়া পাকা সড়কের দিকে চলিয়াছে। সে পথ ধরিয়া বাঁদিকে গেলে আষাঢ়, আর ওপাশে সোনাডাঙার মাঠ। অনেক-অনেকদিন আগে দুইটি গরিব ঘরের বালকবালিকা ওই পথ দিয়া রেলগাড়ি দেখিবার আশায় ছুটিয়া গিয়াছিল। তাহাদেব একজন এই গ্রামেই রহিয়া গিয়াছে, এই গ্রামেরই শান্ত নদীতীরে তাহার শেষ শয্যা রচিত হইয়াছিল। নির্জন বসন্ত দ্বিপ্রহরে এখনও কি সে গহন লতাকুঞ্জে কঁচপোকা খুঁজিয়া বেড়ায়?

কতদিন আগে স্বরূপ চক্রবর্তী গ্রামের নদীতীরে সন্ধ্যাবেলা দেবী বিশালাক্ষ্মীকে দেখিয়াছিলেন? সে কবেকার কথা? দেবী কি নিশ্চিন্দিপুর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন?

বিংশ পরিচ্ছেদ

অল্পবয়েসে জীবনটা একরকম বেশ সুখেই চলিতে থাকে। মাথার ওপরে একটা বড়োসড়ো আকাশ, দিগন্ত অবধি বিস্তৃত পৃথিবী তার সমস্ত আনন্দ দুঃখ হর্ষ আর পথের প্রতি বাঁকে আস্বাদিত চমক লইয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। সবকিছুই ঘটতে পারে, ঘটিবেও। আজ কিছু হইল না বটে, কিন্তু কাল নিশ্চয় হইবে। প্রত্যেকদিন সকালে উঠিয়াই আনন্দে মন ভরিয়া যায়, নতুন সম্ভাবনা লইয়া আর একটি দিন শুরু হইল। বাতাসে সমুদ্রপারের মশলাদ্বীপ হইতে ভাসিয়া আসা সুগন্ধ, চেতনায় মুক্তির সুর।

সময় কাটিতে আরম্ভ করিলে জীবনের এই পট বদলাইতে থাকে। দায়িত্ব, কর্তব্য, ছকে বাঁধা সময়সুচি আর বহুবিধ সমস্যা আসিয়া পূর্বের সরল আনন্দকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। বাতাস আর তেমন করিয়া বয় না, আকাশের নীল বিবর্ণ হইয়া আসে। নদীর স্রোতের শব্দে আর আগের মতো প্রকৃতির রহস্যময় গোপন সংগীত বাজে না। সে বড়ো ভয়ের সময়, বড়ো কষ্টের সময়।

কাজলের এখন সেই বয়েস। যন্ত্রণা একা সহ্য করিতে হয়, সব সমস্যায় দৌড়াইয়া মায়ের কাছে আসিয়া পরামর্শ চাওয়া যায় না, অনেক সমস্যার কোন উত্তরই থাকে না। ছোটবেলার বিশ্বাস, প্রথম যৌবনের মূল্যবোধ, আজীবন সঞ্চিত যা কিছু ভালোলাগার সম্পদ—সব একে একে বদলাইয়া যায়। চেনামুখ সরিয়া যায়, অচেনা মুখ নতুন বন্ধুত্ব লইয়া আসে না—এ বড়ো কঠিন সময়।

তুলিকে সে ফেলিতে পারিবে না। তুলির সঙ্গে তাহার আজ পর্যন্ত একটাও এমন কোন কথা হয় নাই, যাহাকে মন দেওয়া-নেওয়ার ভূমিকা বলা যাইতে পারে। আর দেরি করা যায় না, অপালার প্রতি তাহার আচরণ একান্ত নিষ্ঠুর হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তুলিকে স্বীকৃতি না দিলে আরও বেশি অন্যায় করা

হইবে। অপালা উচ্চশিক্ষিতা, প্রতিপত্তিশালী পিতার সুন্দরী কন্যা, তাহার ভালো বিবাহ হইতে সময় লাগিবে না। কিন্তু তুলির কেহ নাই, বিমলেন্দুর বয়েস হইয়া আসিতেছে, তিনি আর কতদিন ভাগ্নীকে দেখিবেন? মায়ের কলঙ্কের জন্য কেহ তাহাকে বিবাহ করিতে রাজি হইবে না। বাঙালি সমাজে এসব কথা চাপা রাখা কঠিন, নির্যাতন করিতে পারিলে মানুষ আর কিছু চায় না।

সরল তুলি-জীবনের বিরুদ্ধ স্রোতের তীব্রতায় কোথায় ভাসিয়া যাইবে।

আচ্ছা, এমনও তো হইতে পারে যে, সে এত চিন্তা করিতেছে, কিন্তু তুলি তাহাকে পছন্দ করিবে না? সব মেয়েরই মনে স্বামী সম্বন্ধে একটা ভাবমূর্তি থাকে। তুলির কল্পনার সঙ্গে তাহার ব্যক্তিত্ব হয়তো একেবারেই মেলে না। বিমলেন্দুর ব্যবস্থা সে হয়তো নীরবে মানিয়া লইবে, কিন্তু বিবাহিত জীবনে সুখী হইবে না।

কী করা যায়? সে কি সংকোচ কাটাইয়া সরাসরি তুলির সঙ্গে কথা বলিবে? নাঃ, সে তাহা পারিবে না। চিঠি লিখিয়া মন জানিতে চাহিবে? না, তাহাও বড়োই নাটকীয় হইয়া যাইবে। অবশ্য এমনি একবার দেখা করিতে যাওয়া যায়। কে কেমন আছে জানিতে যাওয়াটা এমন অন্যায় কিছু নয়।

অনেক ভাবিয়া সে যাওয়াই ঠিক করিল।

তবে সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝিতে পারিল যে, কেবলমাত্র কুশল প্রশ্ন করিবার আগ্রহে সে ছুটিয়া যাইতেছে না। নমুখী এক সুন্দরী তরুণীর সহিত দেখা হইবার সম্ভাবনা তাহাকে প্ররোচিত করিতেছে। অবশ্য তাহাতে কিছু আসে-যায় না, নিজের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করিয়া কী লাভ? সে যে তুলিকে ভালোবাসিতে শুরু করিয়াছে ইহাতে তত সন্দেহ নাই।

www.bengaliebook.com

সিদ্ধান্ত লইবার পরদিনই কাজল খুব সকালের ট্রেনে কলিকাতায় রওনা হইল। বিমলেন্দুর বাড়ি পৌঁছাইয়া দেখিল তিনি বাহিরের ঘরে বসিয়া স্টেটসম্যান পড়িতেছেন। তাহাকে দেখিয়া বিমলেন্দু যথার্থই খুশি হইলেন, বলিলেন-তোমার খবর কী হে? কলকাতায় আর আসছ না নাকি, মা কেমন আছেন?

যথাবিহিত কুশল বিনিময়াদির পর বিমলেন্দু বলিলেন—এত সকালে এসেছ মানে নিশ্চয় কিছু খেয়ে বের হওনি? দাঁড়াও, তোমার জলখাবারের ব্যবস্থা করি। এমনি কি বিশেষ কোনো কাজ আছে কলকাতায়? নেই? তাহলে দুপুরেও এখানে খেয়ে একেবারে ওবেলা যাবে। কী ভালোবাসো বলমাংস না মাছ? আমি নিজে তোমার জন্য বাজার করব

কাজল বাধা দিবার চেষ্টা করিল, বলিল—অকারণে বাজারে ছুটির প্রয়োজন নাই, বাড়িতে যা আহে তাহই যথেষ্ট।

বিমলেন্দু সে-সবে কর্ণপাত করিলেন না, গলা উঠাইয়া ডাকিলেন-তুলি! তুলি!

কাজলের বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। এইবার দেখা হইবে—এইবার তুলি আসিবে।

একখানি বেগুনী রঙের শাড়ি পরনে, মামার ডাকে তুলি আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

সামাজিকতা ভূলিয়া কাজল অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিল।

এই সকালেই তুলির স্নান সারা হইয়া গিয়াছে। ভেজা চুল পিঠের উপর বিন্যস্ত। মুখে কোনো প্রসাধনের চিহ্ন নাই, তবু তুলিকে দেবীর মতো

www.bengaliebook.com

দেখাইতেছে। বাবার ডায়েরিতে তুলির মায়ের কথা কাজল পড়িয়াছে। মেয়েকে দেখিলে মায়ের সে সৌন্দর্য আন্দাজ করিতে পারা যায়।

তুলির মা সুখী ছিলেন না, মেয়েরও কি সেই ভাগ্যই হইবে?

না, তুলিকে সে সমস্ত কষ্ট হইতে রক্ষা করিবে। তাহার গায়ে রৌদ্র লাগিতে দিবে না।

বিমলেন্দু বলিলেন-তোমার ইয়ে, কী বলে—অমিতাভদা এসেছেন। চট করে কিছু লুচি ভেজে দাও।

কাজল বলিল—কেমন আছো তুলি? আর দুর্বলতা নেই তো?

তুলি হাসিয়া বলিল—ভালো আছি। আপনারা কেমন আছেন? মা?

কাজলের ভালো লাগিল, তুলি মাসিমা বা কাকিমা বলিয়া হৈমন্তীকে নির্দেশ করিল না, একেবারে মা বলিয়া ডাকিল। চেহারায় আচরণে এমন কমনীয় মেয়ে সে আর কখনও দেখে নাই।

জলখাবার তৈরি করিবার জন্য তুলি বাড়ির ভিতরে গেলে বিমলেন্দু তাহার সঙ্গে সাহিত্য, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ইউ.এন.ও-র অপদার্থতা, সেকালে সবকিছুই ভালো ছিল ইত্যাদি লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। কাজল বলিল—সে কী মামা, পৃথিবীসুদ্ধ লোক ইউ এন.ও. নিয়ে এত মাতামাতি করছে, আর আপনি বলছেন ও দিয়ে কোনো কাজ হবে না!

-হবে না তো! তুমি মিলিয়ে দেখে নিয়ে আমার কথা খাটে কিনা। লীগ অফ নেশনস হবার পরে কেউ কি আর ভেবেছিল আরও একটা মহাযুদ্ধ হবে? আসলে মানবজাতির চবিত্রের মধ্যে বর্বরতার বীজ আছে। সভ্যতার পালিশ

দিয়ে আমরা সেটা ঢেকে রাখি মাত্র। সে পালিশটাও খুব হালকা, মাঝে মাঝেই নিচের কালো রঙটা বেরিয়ে পড়ে। যুদ্ধ আবার হবেই, আজ না হোক বিশ পঞ্চাশ কী সত্তর বছর পরে হলেও হবে। আর ছোটখাটো ঘরোয়া ক্ষেত্রে তো যুদ্ধ চলছেই, তাই না? সংসারে কর্তৃত্বের জন্য, অফিসে ক্ষমতা আর পদোন্নতির জন্য, রাজনীতিতে সর্বশক্তিমান হবার জন্য, যে কোনো উপায়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার জন্য যুদ্ধ চলছেই। এসবই বাড়তে বাড়তে একদিন বৃহৎ আকারে ফেটে পড়ে।

কাজল বলিল—ইউনাইটেড নেশনস ব্যর্থ হবে বলছেন, তাহলে মানুষের বাঁচবার উপায় কী?

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া বিমলেন্দু বলিলেন—লোভ ত্যাগ করা। অল্পে সন্তুষ্ট থাকা।

-তাহলে তো জ্ঞান-বিজ্ঞান, কল-কারখানা, সভ্যতার অগ্রগতি সব থেমে যাবে। লোভই বলুন আর যাই বলুন, মানুষ নিজের অবস্থার আরও উন্নতি ঘটাতে চায় বলেই বিজ্ঞানের আবিষ্কার ঘটে, দেশ এগিয়ে যায়

-না, সম্পূর্ণ ভুল। কল-কারখানা বা ঐশ্বর্য দিয়ে সভ্যতার অগ্রগতি মাপা যায় না, সেটা মাপা হয় সংস্কৃতির মান দিয়ে। শেকীয়ার কিংবা কালিদাস অথবা ব্যাসদেবের সময়ে প্রযুক্তি তার শৈশবে ছিল, কিন্তু তাদের কীর্তি নিয়েই তো আমরা গর্ব করি, গবেষণা করি। আমি বলছি না যে বিজ্ঞানচর্চা ছেড়ে দাও, প্রযুক্তি থামিয়ে দাও—আমি বলছি এ ধরনের উদ্যোগকে একটা সীমার মধ্যে আরদ্ধ রাখো। ভোগের তৃষ্ণা বাড়ালেই বাড়ে, সময়মত না থামালে সর্বনাশ!

তুলি এই সময়ে জলখাবার লইয়া আসায় বিমলেন্দুর বক্তৃতাস্রোতে বাধা পড়িল। তিনি উঠিয়া একটা জামা গায়ে গলাইতে গাইতে বলিলেন-তুমি বসে

তুলির সঙ্গে কথা বলে, আমি চট করে একবার বাজার থেকে ঘুরে আসি। তুলি, দেখিস ওর আর কী লাগে–

কাজলের আপত্তিতে কর্ণপাত না করিয়া বিমলেন্দু ব্যাগ হাতে বাহির হইয়া গেলেন।

সুচি খাইবার মতো মনের অবস্থা কাজলের ছিল না। সে মাথা নিচু করিয়া খাবার নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। তুলনায় তুলির আচরণ অনেক সহজ, কারণ শৈশব হইতে যেভাবে সে বড়ো হইয়াছে তাহাতে লজ্জার বোধ জন্মাইবার কোনো সুযোগ ছিল না। মামাকে ছাড়িয়া দিলে কাজল তাহার জীবনে প্রথম পুরুষ যাহার সঙ্গে বসিয়া সে একান্তে কথা বলিতেছে। লজ্জা করিতে সে শেখে নাই, কিন্তু তাহার ন, একান্ত মেয়েলি স্বভাব তাহাকে অনন্য করিয়া তুলিয়াছে।

মাথা নিচু করিয়াই কাজল বলিল–তুলি, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে,

বাড়ি খালি, ফিসফিস করিয়া কথা বলিবার কোনো প্রয়োজন নাই, তবু গোপন ষড়যন্ত্র করিবার সময় মানুষের কণ্ঠস্বর যেমন খাদে নামিয়া যায়, কাজলের গলাও তেমনই শুনাইল। এই পরিবেশে অমনভাবে কথা বলিলে তাহার একটিই অর্থ হয়। কিন্তু তুলি তো পূর্ণ নারীত্বে পৌঁছায় নাই। সে কাজলের মুখের দিকে নিঃসংকোচ দৃষ্টি রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল–আমার সঙ্গে? কী কথা?

এবার কাজল মুখ তুলিল, গলা পরিষ্কার করিয়া বলিল–তোমার মামা এখন বাড়ি নেই, এভাবে একথা বলা উচিত হচ্ছে কিনা জানি না। কিন্তু কথাটা কেবল তোমাকেই বলবার মতো, আর কেউ সামনে থাকলে বলা যাবে না। মনোযোগ দিয়ে শুনে তোমার উত্তর দাও

www.bengaliebook.com

এইবার বোধহয় পরিস্থিতি তুলি কিছুটা বুঝিল। মেয়েদের স্বাভাবিক উপলব্ধির ক্ষমতা দিয়া সে বুঝিল তাহার জীবনের সম্পূর্ণ নূতন এক পর্বের প্রস্তাবনা হইতে চলিয়াছে। একটু একটু করিয়া তাহার মুখে অরুণাভা ছড়াইয়া পড়িল। এইবার সেও ফিসফিস করিয়া বলিল—বলুন!

-তুমি তো জানো, তোমার মা আর আমার বাবা বন্ধু ছিলেন। হয়তো এই বন্ধুত্ব আরও গভীর সম্পর্কের দিকে গড়াতো, কিন্তু আমার বাবা দরিদ্র ছিলেন, খুবই সাধারণ অবস্থার মানুষ দুবেলা তার খাওয়া জুটতো না। তোমরা ছিলে বড়ো ঘব, তোমার মা রাজার ঐশ্বর্যের মধ্যে বড়ো হয়েছেন। ছোটবেলায় বন্ধুত্ব হতে হয়, কিন্তু তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। শেষপর্যন্ত তোমাদের বাড়ির দিক দিয়ে কেউ ব্যাপারটা মেনে নিতো না। অবশ্য সে প্রশ্নও ওঠে না, কারণ খুব অল্পবয়েসেই বাবা আমার ঠাকুমাব সঙ্গে তোমাদের বাড়ি ছেড়ে মনসাপোতায় চলে যান। আই.এ পাস করার পর অদ্ভুত পরিস্থিতিতে বাবার বিয়ে হয়। সে গল্প হয়তো তোমার মামার কাছে তুমি শুনে থাকবে। তোমার মায়েরও বিয়ে হয়ে যায়। আমাকে জন্ম দিতে গিয়ে আমার মায়ের মৃত্যু হয়। মা বলতে আমি এই মাকেই জানি, তিনিও সন্তান বলতে আমাকেই জানেন।

কাজল একটু থামিল। তুলি পূর্ণদৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া আছে।

—তোমার মায়ের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বাবার সঙ্গে তার সম্পর্ক খুব মধুর ছিল, ঘনিষ্ঠ ছিল। এ যে কত পবিত্র ঘনিষ্ঠতা তা আমি বলে বোঝাতে পারবো না। দুজনে পরস্পরের নিঃসীম একাকীত্বকে গভীর আত্মিক সান্নিধ্য দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছিলেন। তোমার ছোটবেলায় ভবানীপুরের বাড়িতে বাবা তোমাকে প্রথম দেখেন-তখন তোমার মা মারা গিয়েছেন। তোমাকে দেখে সেই রাত্তিরেই বাবা তার ডায়েরিতে একটা ইচ্ছের কথা লিখে যান—সে ইচ্ছে তোমাকে আর আমাকে ঘিরে।

www.bengaliebook.com

কাজল আবার থামিল। মরিয়ার মতো অনেক কথা বলিবার পর তাহার বুক ঢিপ ঢিপ করিতেছে। তুলি কি কিছু মনে করিল? সে কি ভাবিতেছে যে, নির্জন বাড়িতে একা পাইয়া কাজল তাহাকে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করিবার চেষ্টা করিতেছে? খুব অস্পষ্ট স্বরে তুলি বলিল—এসব আমি কিছুটা জানি। আপনি কী বলবেন?

তুলির কথায় কাজল অবাক হইল, বেশ ভালোও লাগিল। তুলি সরল, ন; কিন্তু তাহার আড়ষ্টতা নাই-সে বোকাও নয়। ঠিক কথা ঠিক সময়ে বুঝিতে পারে।

কাজল বলিল—তুমি কী করে জানলে? কে বলেছে তোমাকে?

-মামা। মানে ঠিক ওভাবে বলেন নি, তবে মাঝে মাঝেই নানা কথায় আমি বুঝতে পারছিলাম এমন একটা কিছু ঘটতে চলেছে।

কাজলের গলার কাছে কী একটা গুটলি পাকাইয়া উঠিতেছে। তুলির শরীর হইতে কেমন একটা মৃদু সুগন্ধ পাওয়া যায়, তার সবটাই এসেন্স নহে, তরুণী-শরীরের নিজস্ব ঘ্রাণ-রৌদ্রের গন্ধের মতো, বৃষ্টিভেজা কদমের গন্ধের মতো, শাশ্বতী মানবীর মতো।

সে বলিল—এমন কিছু ঘটলে তোমার কি আপত্তি হবে?

এবার তুলি চুপ করিয়া রহিল।

কাজল বলিল-চুপ করে থাকলে তো চলবে না, মামা এসে পড়ার আগে তোমার মতটা আমার জানা প্রয়োজন। তাহলে আমিও ওঁর সঙ্গে কথা বলে যাব।

–আমার মত জানা কেন প্রয়োজন?

–কারণ তুমি খেলার পুতুল নও যে, দোকান থেকে পছন্দ করে কিনে নিয়ে যাব। তাছাড়া আমার বাবা চেয়েছিলেন বলেই এতে তোমারও মত থাকবে তার কী মানে আছে? যাক, এসব ছেড়ে দিলেও তোমার দিক থেকে আরও অনেক ভাববার বিষয় থেকে যায়–

–কী?

–যেমন ধরো, আমার বাবার খ্যাতি আছে সত্য, কিন্তু আমরা বড়োলোক নই। তুমি অভিজাত ধনী পরিবারের মেয়ে, তুমি মানিয়ে নিতে পাববে তো? এ তো দুদিনের খেলা নয়, সারাজীবনের মতো সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তোমার কী মত? ভেবে বলো–

তুলি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল, তাবপব আস্তে আস্তে বলিল-বাবা যা ঠিক কবে গিয়েছেন, তার ওপরে আমার আর বলাব কী আছে?

কাজলের সমস্ত শবীরে একটা কেমন ভালো লাগার, তৃপ্তির শিহরণ বহিযা গেল। সে বুঝিল তাহার বাবাকে তুলিও বাবা বলিয়া উল্লেখ কবিতেছে। তবু সে বলিল-না, আরও ভাববার কথা আছে।

-কী?

-আমার বলতে সংকোচ হচ্ছে, তুমি হয়তো ব্যাপারটা জানো, তবু একবার নিজের মুখে না বলে নিলে আমি শান্তি পাবো না

তুলি বিস্মিত চোখে তাকাইয়া বলিল—কী বলবে তুমি? আমি বুঝতে পারছি না—

—দেখ, আমার ঠাকুমা সর্বজয়া দেবী, তোমাদের বাড়িতে—

কাজল থামিয়া গেল। তুলি অপলকে তাকাইয়া আছে।

মনের জোর সংগ্রহ করিযা কাজল বলিল—আমার ঠাকুমা তোমাদের বাড়িতে রাঁধুনির কাজ করতেন। আমাকে বিয়ে করলে তোমার সম্মানে আঘাত লাগবে না তো?

এইবার যাহা ঘটিল তাহা সত্যই বিস্ময়জনক। কাজল এতদিন তুলিকে নিতান্ত লাজুক আর স্বল্পভাষিণী বলিয়া ভাবিয়া আসিয়াছে, কিন্তু প্রয়োজনের সময় মেয়েবা যে কত সরল অথচ বলিষ্ঠভাবে নিজের কথা বলিতে পারে তাহা সে আজ দেখিল।

তুলি তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল—যুধিষ্ঠির বিরাটরাজের চাকরি স্বীকার করেছিলেন, ভীম রাঁধুনির কাজ করতেন, দ্রৌপদী রানীর পরিচারিকা চিলেন। তাঁরা কি সম্মানে কারও চেয়ে কম ছিলেন? অবস্থায় রকমফের সবারই হয়, তার জন্য মানুষ ছোট হবে কেন? আজ বাবার যে দেশজোড়া খ্যাতি, মানুষ তাকে উপনিষদকাব ঋষির সঙ্গে তুলনা করছে, সে খ্যাতি আর সম্মানের কাছে জমিদারির গর্ব দাঁড়াতে পারে? আজ কোথায় আমাদের সে জমিদারি? কোথায় সে সম্মান? আর বাবাকে দেখ, তিনি সবাইকে ছাড়িয়ে মাথা তুলে উঠেছেন।

তারপর একটু হাসিয়া বলিল—আচ্ছা আমি তোমাদের রাঁধুনি হয়ে সবকিছু শোধবোেধ করে দেব, তাহলে হবে তো?

www.bengaliebook.com

বিমলেন্দু বাজার হইতে ফিরিলেন। তুলি উঠিয়া রান্নার জোগাড় দেখিতে গেল। অন্যমনস্ক কাজল অনেকক্ষণ বাদে খেয়াল করিল তুলি তাহাকে কখন যেন তুমি সম্বোধন করিতে শুরু করিয়াছে। কখন হইতে এটা ঘটিল? সে খেয়াল করে নাই তো!

সারাদিনে তুলির সঙ্গে আর বিশেষ কথা হইবার সুযোগ হইল না। খাওয়া সারিয়া বিমলেন্দু কাজলকে লইয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিলেন এবং ক্রমাগত একালের দোষ ও সেকালের গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। কোনো কোনো প্রসঙ্গে কাজল তাহার সহিত একমত হওয়া সত্ত্বেও সে আলোচনায় যোগ দেওয়ার উৎসাহ পাইল না।

মাথার মধ্যে যেন কেমন করিতেছে। অথবা ঠিক মাথার মধ্যে নয়, সমস্ত চেতনায় কেমন একটা অস্থিরতার ভাব।

অনেকদিন আগে, তাহার বাবার কৈশোরে যে নাটক শুরু হইয়াছিল, এতদিনে বোধহয় তাহা স্থির পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। মৃত্যুর ওপারের জগৎ হইতে তাহার বাবা ও তুলির মা নিশ্চয় তৃপ্তিলাভ করিবেন। নিজেদের বিচ্ছেদ সন্তানের মিলনে পূর্ণতা লাভ করিবে। মহাকালের কী বিচিত্র গতি।

বিকালে বিদায় লইবার সময় সে বিমলেন্দুকে বলিল—মামা, আপনি একবার আমাদের বাড়ি যাবেন না?

বিমলেন্দু বলিলেন-হাঁ, সে তো যাবো নিশ্চয়। দেখি এইবার-

হঠাৎ থামিয়া তিনি তীক্ষ্ণচোখে কাজলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—তুমি কি—মানে, বিশেষভাবে যাওয়ার কথা বলছো?

মাথা নিচু করিয়া কাজল বলিল–আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি আপনার কাছ থেকে ভেবে দেখবার জন্য সময় চেয়ে নিয়েছিলাম, আমি মনস্থির করে ফেলেছি, এবার আপনি একবার চলুন–

বিমলেন্দুর মুখ দেখিয়া মনে হইল তিনি আগেই আন্দাজ করিয়াছিলেন, কাজল আজ এই কথা বলিবে। তিনি বলিলেন–তোমার মা?

-মায়ের অমত হবে না।...

বিমলেন্দু চুপ করিয়া একমুহূর্ত কী ভাবিলেন, তারপর বলিলেন–আমার দিদির জীবনের সব কথা কি তোমার মা ঠিকঠাক জানেন? সমাজ খুব হিংস্র অমিতাভ, মানুষ মানুষকে পীড়ন করে বড়ো সুখ পায়। বিয়ের পর যদি কেউ এসব পুরোনো কথা দিয়ে ঘাটাঘাটি করে।

কাজল বলিল–আমার মা সব জানেন। সমাজকে তিনি মানেন, কিন্তু সমাজের অন্যায় আচরণকে ভয় পান না। তাছাড়া বাবা যাকে সমর্থন করে গিয়েছেন, সে কাজ করতে মায়ের কোনো দ্বিধা হবে না। ও নিয়ে চিন্তা করবার কারণ নেই।

বিমলেন্দুর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন–আমি যাব, খুব শিগগীরই যাব, তোমার মাকে বোলো। অমিতাভ, তুমি যে আমাকে কতবড় দায় থেকে উদ্ধারের আশা দিলে, তা আমি কী করে বোঝাবো? পিতার উপযুক্ত সন্তান তুমি, তোমার মঙ্গল হোক–

ছুটির দিনের সন্ধ্যার ট্রেনে বেশি ভিড় নাই। জানালার ধারে বসিয়া কাজল বাহিরে তাকাইয়া ছিল। একটু একটু করিয়া অন্ধকার নামিতেছে, ঝোপঝাড় বাড়িঘর সস পিছাইয়া যাইতেছে।

কাজলের মন এক বিচিত্র অনুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। কবেকার ফুরাইয়া যাওয়া আতরের শিশি খুলিলে যেমন অস্পষ্ট সুগন্ধের রেশ মনকে উদাস করে, তেমনি তাহাদের পরিবারের ইতিহাস, তাহার বাবার পুণ্যস্মৃতি, তুলির মায়ের ব্যর্থ জীবন, নিশ্চিন্দিপুর আর মৌপাহাড়িতে কাটানো তাহার স্বপ্নের শৈশব-সমস্ত তাহার চেতনার পটে একসঙ্গে ভাসিয়া উঠিল।

বাবা যদি বাঁচিয়া থাকিত।

কত কথা বলিতে ইচ্ছা করে, ছোটবেলার মতো চুপ করিয়া বাবার পাশে শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু উপায় নাই। নির্মম মহাকাল তাহার বাবাকে কোন অজানা দেশে লইয়া গিয়াছে। বাবা এখন কেবলমাত্র অতীতের এক সুখস্মৃতি।

কিংবা সত্য কি তাই? বাবাকে কি সে প্রতিমুহূর্তে নিজের রক্তের ভিতর, চেতনা ও উপলব্ধির ভিতর অনুভব করিতেছে না? বাবার চাইতে তাহার কাছে আর কে বেশি করিয়া জীবিত?

মায়ের শরীর ভালো নয়। তুলি আসিয়া মাকে যত্ন করিবে, মায়ের হাত হইতে কাজ তুলিয়া লইবে। সামনে কঠিন কাজ আসিতেছে, বাবার স্মৃতিরক্ষার কাজ, সেই কাজে তাহাকে সাহায্য করিবে। যে কাজ প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ, একান্ত আপন ছাড়া তাহাতে কেহ সহায়তা করিতে পারে না।

একজন খুব কষ্ট পাইবে। সবদিক দিয়াই সে বঞ্চিত হইল।

বাহিরে অন্ধকারে চাহিয়া কাজল মনে মনে তাহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। সেদিন রাত্রে □□□ □□□□□ □□ □□□□□□, □□□□ □□□ □□□□□ পড়িতে পড়িতে ঘুম আসিল। আলো

www.bengaliebook.com

নিভাইবার পর ঘুমাইয়া পড়িবার আগে পর্যন্ত যে স্তিমিত চেতনার রাজত্ব, সেইখানে কাজলের মন সামান্য সময়ের জন্য দাঁড়াইয়া গেল।

ঈর্ষা, যুদ্ধ, লোভ আর মৃত্যুর সীমাবদ্ধতার পরপারে অনন্ত শূন্যের ভিতর দিয়া সৌরবাতাস বহমান। বিশ্বের ইতিহাস মেসোপটেমিয়া, শানিদার গুহাবাসী নিয়ানডার্থাল কিংবা জলচর ট্রাইলোবাইটদের সিরিয়ান যুগে শুরু হয় নাই, পৃথিবীর জন্মেরও আগে-নক্ষত্রদের জন্মের আগে, নক্ষত্র-নীহারিকা,মহাশূন্য-মহাকাল যখন একটিমাত্র বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত সম্ভাবনা হিসাবে বিরাজমান ছিল, ইতিহাসের প্রথম পাতা তখন লেখা হইয়াছে। বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে মানুষ আসিয়াছে এই সেদিন, কিন্তু সৃষ্টির সেই আদিম মুহূর্ত হইতে চরাচরব্যাপী এক মহাচেতনা দেশকালে ব্যাপ্ত হইয়া ছিল। তাহা হইতেই জগৎ, তাহা হইতেই যাবৎ বস্তুপিণ্ড। প্রেম, কবিতা, দর্শন, বিজ্ঞান–যে ছোট ফুলটি সুবর্ণবেখার তীরে সে ঘাসের মধ্যে ফুটিয়া থাকিতে দেখিয়াছে, সেটি হইতে দূর ভবিষ্যতে সময়ের শেষ ভগ্নাংশ পর্যন্ত সমস্ত কিছু সৃষ্টিপূর্ব ওই মহাচেতনাব মধ্যে লুকাইয়া ছিল।

তুলির সঙ্গে তাহার যোগাযোগ সেই বিশ্ব-পরিকল্পনারই অংশ। আকস্মিক নহে নির্ধারিত।

ঘুম আসিবে–ঘুম আসিতেছে।

কোথায় যেন এক বিস্তৃত শাল-পিয়াশাল-অর্জুনের বন। সে বনের মাথায় পূর্ণিমার চঁদ উঠিয়াছে। রাতজাগা পাখি ডাকিতেছে কোথায়। দক্ষিণ হইতে আসা বাতাসে শুষ্কপত্র মর্মরশব্দে সরিয়া যাইতেছে। গানের সুর জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিকে উতলা করিয়াছে। অজানা অদ্ভুত এক সুর, পৃথিবীর সব মানুষই সে সুর শুনিয়াছে। আন্তনাক্ষত্রিক শূন্যে সঞ্চরমাণ নীহারিকাদের সে সংগীত। যে শুনিয়াছে, ঘরে আর তাহার মন বসে না। প্রথম যৌবনে আকাশের দিকে

www.bengaliebook.com

তাকাইয়া সেই আদিম রহস্যময় সুর সে একবার শুনিতে পাইয়াছিল, তাই অল্পে সে আর ভোলে নাই। হয়তো এবার আর কিছু হইল না, এ জন্মটা হয়তো বৃথাই গেল, কিন্তু তাই বলিয়া সে নকল সোনা কিনিতে যায় নাই। যেখানে থাকুক, যাহাই করুক, বুকের পাঁজরে সেই অনির্বাণ সংগীত বাজিয়াছে।

ওই জ্যোৎস্নালোকিত অরণ্যভূমির প্রসার পার হইয়া কে যেন তাহার দিকে আসিতেছে।

কে? অপালা? তুলি? তাহার না-দেখা হারানো মা?

না, যে আসিতেছে তাহাকে সে চেনে না। সমস্ত সৃষ্টির নির্যাস লইয়া ইহার অবয়ব। সে মানব নয়, মানবীও নয়, পৃথিবীর কোনো পরিচিত আকারের স্বীকৃত মাত্রায় ইহাকে ধরা যায় না।

কাজলের জাগতিক চেতনা তখন প্রায় নিদ্রাকে স্পর্শ করিয়াছে। তবু তাহার গায়ে শিহরণ জাগিল। যে আসিতেছে তাহারই জন্য কাজলের এতদিনের অপেক্ষা ছিল। এতদিনে আসিল তবে।

কিন্তু চিরপ্রার্থিত সেই মুহূর্তটি শেষ পর্যন্ত আসিল না। যে আসিতেছিল, সে মানুষের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর লইয়া পরম সার্থকতা হিসাবে আসিতেছিল। সে পৌঁছাইবার ঠিক আগেই কাজল ঘুমাইয়া পড়িল।

সুপ্তির প্রান্ত হইতেই শুরু হয় স্বপ্নের অধিকার।

ঘুমাইয়া কাজল সেই রাত্রে অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখিল। যে গ্রহণ করিতে জানে প্রকৃতি তাহাকেই গ্রাহ্যবস্তু দেন। কাজলের সংবেদনশীল মন জীবনের প্রধান এক বাঁকে আসিয়া আরও সংবেদী হইয়া উঠিয়াছিল। স্বপ্নের জগতে সত্যকে

www.bengaliebook.com

যুক্তির জাল দিয়া ধরিতে হয় না, সত্য প্রকাশ ও সম্পূর্ণ হইয়া আপনিই ধরা দেয়। স্বপ্নের মধ্যে কাজল সমস্ত বস্তুবিশ্বকে কী এক জাদুবলে একসঙ্গে দেখিতে পাইল। সেখানে কশা কশা হাইড্রোজেন সঞ্চিত হইয়া আলোকবর্ষব্যাপী নীহারিকার সৃষ্টি হইতেছে, নীহারিকার গর্ভে জন্ম লইতেছে নক্ষত্রের দল। সীমাহীন শূন্যে জ্যোতিষ্কেরা বিশাল দূরত্বের ব্যবধানে ভ্রাম্যমাণ।

আর সেই নক্ষত্রের কেন্দ্রে আবির্ভূত হইতেছে জীবনের মৌলকণা। যে পদার্থে তাহার শরীর গঠিত, নদী পাহাড় বনস্পতি ও সমগ্র জীবজগৎ গঠিত, সেই বস্তুপুঞ্জ সমস্ত বিশ্ব হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার শরীরে মিলাইয়া যাইতেছে।

মহনীয়, উদার অনুভূতিতে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। সে নক্ষত্রের সন্তান, মরণশীলতা দ্বারা তাহার জীবন সীমাবদ্ধ নয়। সে মহাবিশ্বের তাৎপর্যবাহী অধিবাসী, সে নক্ষত্রের সন্তান।

শীতের শেষে সে বৎসর বসন্ত আসিল একখানি গীতিকবিতার মতো।

হিমের আড়ষ্টতা ভাঙিয়া সমস্ত জগৎ যখন নতুন প্রারম্ভের ভূমিকা হিসাবে কচি পাতায় আর দক্ষিণ হইতে আসা বাতাসে নিজেকে প্রকাশ করিতেছে, তেমনই এক দিনে হৈমন্তী কলিকাতায় গিয়া তুলিকে আশীর্বাদ করিয়া আসিল। সঙ্গে গেল প্রতাপ আর পরিবারের বন্ধু দু-একজন। বিবাহ হইবে আষাঢ়ের একত্রিশ তারিখে। উভয়পক্ষেরই লোকবল কম, প্রস্তুতির জন্য এই সময়টা প্রয়োজন।

আশীর্বাদের আগের দিন রাত্রে হৈমন্তী একবার কাজলের ঘরে গেল। সকাল সাতটার মধ্যে পুরোহিতের আসা প্রয়োজন, না হইলে ট্রেন ধরা যাইবে না। পুরোহিত মশাইকে খবর দেওয়া হইয়াছে তো?

www.bengaliebook.com

ছেলের ঘরে ঢুকিয়া হৈমন্তী দেখিল কাজল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। টেবিলের ওপর একটি পুরানো, প্রায় মলাট-ছেঁড়া অ্যালবাম আর কাজলের ডায়েরিখানা। অ্যালবামটি সে চেনে, অপুর উদাসীন, ভবঘুরে জীবনের ঘূর্ণি হইতে রক্ষা পাওয়া কিছু ছবি তাহাতে আছে।

কিন্তু বিশেষ করিয়া আজই এটি ছেলের টেবিলে কেন?

হৈমন্তী সামান্য ইতস্তত করিয়া অ্যালবাম খুলিল।

প্রথম পাতাতেই অপর্ণার একখানি ছবি কেবলমাত্র মুখ ও গলার খাজ পর্যন্ত ছবিতে দেখা যাইতেছে, দৈর্ঘ্যে বারো ইঞ্চি, প্রস্থে দশ ইঞ্চির এনলার্জমেন্ট।

হৈমন্তীর বুকের ভেতরটা একবার টনটন করিয়া উঠিল। সে সব জানিয়া, সব মানিয়াই বিবাহ করিয়াছিল। প্রথমা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আমৃত্যু গভীর ভালোবাসার কথা সে যে জানে না এমন নয়। তবু মন-কেমন করে। অপর্ণার প্রতি তাহার কোন ঈর্ষা নাই, স্বামীর অনির্বাণ ভালোবাসার জন্য কোন ক্ষোভ নাই—তবু মন-কেমন করে। ভাগ্যের অনিবার্যতায় স্বামীকে সে সম্পূর্ণ নিজের করিয়া পায় নাই। তাহার দেবতার মতো স্বামী, কোনদিন কষ্ট দেয় নাই, তাহার মন খারাপ হইতে পারে ভাবিয়া কখনও অপর্ণার প্রসঙ্গ তোলে নাই, স্বামীকে হৈমন্তী কোন দোষ দিতে পারিরে না। কিন্তু মেয়েদের মন বড়ো অদ্ভুত, বিচিত্র। আজ ছেলের টেবিলে মায়ের ছবি দেখিয়া অকস্মাৎ হৈমন্তী আবিষ্কার করিল অপর্ণা এই সংসারে এখনো পরিপূর্ণভাবে জীবিত। কাজল তাহার বিবাহের আশীর্বাদের আগের দিন মায়ের ছবি দেখিতেছিল, ডায়েরিতেও নিশ্চয় মায়ের কথা লিখিয়াছে। একটু ইচ্ছা হইলেও সে নিজেকে সংযত করিল। না, ছেলের ডায়েরি সে পড়িবে না।

www.bengaliebook.com

স্বামীর মতো ছেলেও। শৈশব হইতে যাহাকে নিজের অপূর্ণ মাতৃত্বের বঞ্চনা ভুলিয়া মানুষ করিয়াছে, সেও সম্পূর্ণ নিজের হইল না, অর্ধেক আরেকজনের রহিল।

কাল তুলির আশীর্বাদ। কিছুদিন পরেই এ সংসারে একজন বহিরাগত আসিবে। অন্য কিছু না, নিজের ওপর তাহার বিশ্বাস আছে, সে নিশ্চয় যে কোনো অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিবে, কিন্তু ছেলের ওপর যে অর্ধেক অধিকার তাহার ছিল, আবার তাহার অর্ধেক আর একজনকে ছাড়িয়া দিতে হইবে।

ছাড়িয়া দেওয়াই নিয়ম। ছাড়িয়া দেওয়াই তো উচিত।

সব ঠিক ঠিক, সব যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু তাহার শেষ সম্বলটুকুরও অর্ধেক ছাড়িয়া দিতে হবে। কাজল একাধারে তাহার ছেলে ও স্বামীর প্রতিনিধি। যদি সবটাই ছাড়িতে হয়?

এমন তো হয় সে শুনিয়াছে। তাহারও হইবে না তো?

আশঙ্কায় তাহার বুকের ভিতরটা কেমন হিম হইয়া গেল!

পরক্ষণেই ছেলের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকাইয়া তাহার সুপ্ত মাতৃত্ব স্নেহের স্তন্যধারায় উৎসারিত হইয়া উঠিল। না, তাহার ছেলে তাহাকে ভুলিবে না। তেমন হইতেই পারে না।

জীবনে কিছু বিপ্লব আসে সরবে, ঢাকঢোল পিটাইয়া। কিছু আসে নিঃশব্দে, মসৃণ সঞ্চারে, কিন্তু সমস্ত জীবনে এক ব্যাপক, সার্বিক পটপরিবর্তন ঘটাইয়া দেয়। তুলির সহিত বিবাহ কাজলের জীবনে সেই আশ্চর্য রূপান্তর লইয়া আসিল। প্রেম মানে যে কেবল শরীর নয়, বিবাহ মানেই কেবল শয্যা নয়,

সেকথা কাজল জানিত। কিন্তু একটি তরুণী, সুন্দরী, মৃদু নারীর সান্নিধ্য মানুষকে যে কী স্বর্গের সন্ধান দিতে পারে তাহা সে এবার বুঝিল।

হৈমন্তীকে কিন্তু সত্যিই অনেকটা ছাড়িতে হইল। আগে নিজের লেখা ও পড়ার সময় বাদ দিয়া বাকি অবসরের সবটুকুই কাজল মাকে দিত। এখন হৈমন্তীর নিঃসঙ্গতা বাড়িয়া উঠিল। এক-একদিন ভুলিয়া ছেলের সঙ্গে কথা বলিবার জন্য দরজা পর্যন্ত গিয়া হৈমন্তী ফিরিয়া আসিয়াছে। ভিতরে পুত্রবধূর সঙ্গে ছেলে গল্প করিতেছে। কিছুই না, ব্যবধান কেবল একটি ভেজানো দরজা অথবা টানিয়া দেওয়া পর্দার, কিন্তু একদিন যেখানে অসংকোচ বিচরণের অধিকার ছিল, এখন সেখানে স্বপ্রযুক্ত বিচ্ছেদেব প্রান্তর।

হৈমন্তী ঘরে ফিরিয়া আসিয়া একটা বই খুলিয়া বসে।

তাহার আছে বই, আছে অপুর স্মৃতি, আছে জানালার বাহিরে রুদ্রপলাশ গাছে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত পাখি আর কাঠবেড়ালির খেলা, দিনের বিভিন্ন সময়ে আকাশের রঙ বদলানো। বয়েস বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে এইসব জিনিসকে হৈমন্তী অপরিবর্তনীয় এবং প্রকৃত সত্যের প্রকাশ হিসাবে নিজের জীবনে লাভ করিয়াছে।

এই অবস্থার অবসান ঘটিল আপনিই।

একদিন দুপুরের পর আকাশ কালো করিয়া মেঘ ঘনাইয়া আসিল। নিবিড় মেঘের ছায়ায় পৃথিবী মেদুর জলভরা ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে শুরু করিযাছে, বৃষ্টি নামিল বলিয়া। পুরোনো দিনের অভ্যাসমত হৈমন্তী ডাকিয়া উঠিল-ওরে খোন, দেখে যা কেমন সুন্দর মেঘ করেছে!

ডাক শুনিয়া ছেলের আগে ঘরে ঢুকিল তুলি। পেছন পেছন কাজল।

www.bengaliebook.com

হৈমন্তীর একেবারে কোল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া তুলি বলিল—তাই তো মা, কী সুন্দর দেখাচ্ছে! তোমার ঘরের জানালা দিয়ে বেশি ভালো করে দেখা যায়। এদিকে একটু সরে যাও, আমরা তোমার কাছে বসি। আচ্ছা মা, নিশ্চিন্দিপুরে বা মৌপাহাড়িতে থাকার সময় এমন দিনে বাবা আর তুমি কী করতে বলল না—

তৃপ্তিতে হৈমন্তীর মন ভরিয়া গেল। সে বলিল—এরকম মেঘ দেখলেই তোমার শ্বশুরমশাই বলতেন-দ্যাখো দ্যাখো, কাকের ডিমের মতো মেঘ করেছে-

তুলি জিজ্ঞাসা করিল-কাকের ডিমের মতো মানে?

হৈমন্তী সস্নেহে বলিল—তুমি দেখ নি কখনও, না? কাকের ডিম কালোরঙের হয়। মেঘ ঘনিয়ে আসছে দেখলেই আমরা বেরিয়ে পড়তাম বেড়াতে-

—বৃষ্টি এলে ভিজতে না?

-ভিজতাম তো! হয়তো কুঠির মাঠ কিংবা কাচিকাটার পুলের কাছে চলে গিয়েছি, এমন সময় ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি নামতো। সেখানে আর কোথায় আশ্রয়? একটা গাছতলায় দাঁড়ালাম হয়তো, তা একটু পরে পাতা ফুড়ে সেখানেও জল পড়তে শুরু করল। তখন আবার হাঁটতে শুরু করতাম, দাঁড়িয়ে ভেজার চেয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভেজা আনন্দের। তোমার শ্বশুরমশাই গলা ছেড়ে গান গাইতে শুরু করে দিতেন, আমিও গাইতাম-

তুলি বলিল—বাবার গানের গলা খুব সুন্দর ছিল, না মা?

—হ্যাঁ বৌমা। তোমার শ্বশুরবংশে সবাই কিছু কিছু গাইতে পারে, তোমার বাবা খুব ভালো গাইতেন। দরাজ গলা ছিল। সুরের বোধ ছিল। নদীতে স্নান করবার

সময় বিশুদ্ধ সংস্কৃতে শ্লোক উচ্চারণ করতেন, স্তবগান করতেন। সে সব গান আবার আমাকে শেখাতেন–

তুলি আরদারের সুরে বলিল–সে গান একটা শোনাও না মা–

লজ্জিতমুখে হৈমন্তী বলিল-না, সে কি আর এখন পারি বৌমা? সে থাক-

-না মা, একটা গান গাইতেই হবে, আমি তুলে নেব তোমার কাছ থেকে।

নদীতে স্নান করিবার সময় আরক্ষ জলে দাঁড়াইয়া অপু যে সংস্কৃত মন্ত্রটি গাহিত হৈমন্তী সেটি শুনাইল। তাহার গলা এখনও বেশ ভালো আছে, উচ্চারণও সুন্দর।

কয়েকদিন পরে কাজল অবাক হইয়া শুনিল তুলি ঘরের কাজ করিতে করিতে গুনগুন করিয়া সেদিনের শেখা গানটি গাহিতেছে। সে বলিল–বাঃ, এর মধ্যে শিখে নিলে গানটা?

–হুঁ মাকে আবার গাইতে বললাম, দু-তিনবারে উঠে গেল–

-বেশ, ভালো। তুমি গান শিখবে তুলি? তোমার গলা তো খুব সুন্দর!

তুলি রাজি হইল। কাজল স্থানীয় এক প্রবীণ গায়ককে অনুরোধ কৰায় তিনি সপ্তাহে একদিন তুলিকে গান শিখাইয়া যাইতেন। গানের ব্যাপারে তুলির স্বাভাবিক দক্ষতা কিছুদিনের মধ্যেই প্রকাশ পাইল। সমস্ত গানই সে অনায়াস দক্ষতায় শিখিয়া ফেলিত। শিক্ষক ভদ্রলোক একদিন কাজলকে বলিলেন–বৌমার সুরের বোধ খুব উঁচুদরের। অনেকদিন ধরে গান শেখাচ্ছি, এমনটি কমই দেখেছি। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত কিংবা টপ্পা অঙ্গের গান বৌমার গলায় খুব ভালো আসে। ওসব কঠিন গান সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী শিখতে

চায় না, তারা চায় হালকা বাজার-চলতি গান চটপট তুলে নিতে। বৌমাকে শিখিয়ে আমার গান সার্থক হল-

কোন-কোনদিন খুব ভোরে উঠিয়া কাজল মা আর স্ত্রীকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হয়। ঘাসের ওপর তখনও শিশির শুকায় নাই, সূর্য উঠি উঠি করিতেছে। বাতাসে সকালের পবিত্রতা, কতরকম পাখি ডাকিতেছে গাছে গাছে। শহর হইতে বাহির হইয়া যে রাস্তাটা নদীর ধারে গিয়াছে তাহার দুধারে তেঁতুল, মেহগনি, শিরীষ, বকাইন আর কাঠবাদাম গাছ। মাঝে মাঝে দুয়েকটা জারুল বা ছাতিম। পথের ধারেই ঘন ঝোপঝাড়। এধারে বিশেষ বসতি গড়িয়া ওঠে নাই-শান্ত, স্নিগ্ধ বাতাস গায়ে মাখিয়া গল্প করিতে করিতে বেড়াইবার কী আনন্দ।

কঠ-র-র-র শব্দে কী একটা পাখি ডাকিয়া উঠিল। হৈমন্তী তুলির দিকে তাকাইয়া বলিল– শুনলে বৌমা?

–হ্যাঁ মা, কী পাখি ওটা?

–বলল তো কী?

তুলি চুপ করিয়া একটু ভাবিয়া বলিল-জানি না। তুমি বলে দাও–

হৈমন্তী হাসিয়া বলিল-ও হচ্ছে কাঠঠোকরা। ওটা ঠিক ডাক নয়, গাছের ডালে ঠোঁট ঠুকে ওইরকম আওয়াজ করে। ডাক অন্যরকম, শুনিয়ে দেবখন যদি ডাকে–

একটু একটু করিয়া তুলির জীবন সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেল। ইহার পূর্বে সে বিশেষ বাড়ির বাহিরে পা দেয় নাই, প্রকৃতির সহজ মজাগুলির সঙ্গে পরিচিত করাইয়া দিবার কেহ ছিল না। এখন শাশুড়ি ও স্বামীর মধ্যে দুইজন পরম

www.bengaliebook.com

সহানুভূতিশীল শিক্ষক পাইয়া তাহার জীবনের প্রকৃত শিক্ষা সবেগে অগ্রসর হইল। হৈমন্তী ঠিক সাধারণ মাপের নারী নহে, অপুর সঙ্গে অতিবাহিত জীবন তাহার অন্তরের সুর অনেক চড়া পর্দায় উঠাইয়া দিয়াছিল। পুত্রবধূকে হৈমন্তী সেই শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে লাগিল।

কাজল বাবার ডায়েরিতে তাহার শাশুড়ি লীলার কথা পড়িয়াছে, কিন্তু কখনও তাহার ছবি দেখে নাই। বিবাহের পর সে বিমলেন্দুর কাছ হইতে চাহিয়া লীলার একখানা ছবি জোগাড় করিয়াছে এবং ছবিখানা অ্যালবামে অপর্ণার ফোটোগ্রাফের পাশে লাগাইয়াছে। মাঝে মাঝে সে একান্ত মুহূর্তে ছবি দুটি দেখে।

হ্যাঁ, বাবা অথবা অন্যেরা মিথ্যা বলে নাই, তাহার শাশুড়ি দেখিতে সুন্দরী ছিলেন। দক্ষ শিল্পীর হাতে গড়া মূর্তির মতো অপার্থিব, অলৌকিক সৌন্দর্য পৃথিবীর পথেঘাটে এমন দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু–

কিন্তু তাহার মা যেন আরও সুন্দর।

পাতাকাটা চুল, পানের পাতার মতো মুখের গড়ন। ঠোঁটের সুকুমার ভঙ্গি তাহার মায়ের চেহারায় এক আশ্চর্য দেবীত্ব দান করিযাছে। কাহারও সঙ্গে তুলনা হয় না।

নাঃ, এসব ছেলেমানুষি দুজনেই মা, মায়েব রূপের তুলনা চলে না।

এইসময় হঠাৎ কাজলের কবিতা লিখিবাব ঝোঁক বাড়িয়া উঠিল। তুলির উদ্দেশে কবিতা লিখিয়া স্লিপগুলি ভাঁজ করিয়া বালিশের নিচে, টেবিলক্লথেব তলায় কিংবা তুলি যে বইখানা পড়িতেছে তাহার ফাঁকে রাখিয়া দিত। কবিতাগুলিকে বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য রতন হিসাবে উল্লেখ করা হয়তো

www.bengaliebook.com

একান্তই বাড়াবাড়ি হইবে, কিন্তু তুলি সেগুলি পাইযা ভারি খুশি হইত। ক্রমে ঘবের সমস্ত সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য স্থান কিছুক্ষণ বাদে খুঁজিযা দেখা তুলির অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গেল। কবিতা না পাইলে তাহার অভিমান হইত, মুখ গম্ভীর হইত। নিজের সৃষ্ট বিপদে কাজল আরক্ষ ডুবিয়া গেল। তুলির মুখ ম্লান হইলে তাহার জগৎ অন্ধকার হইয়া যায়, কিন্তু পত্নীকে প্রফুল্ল রাখিবার জন্য প্রতিদিন ডজনখানেক কবিতা স্বয়ং মহাকবি কালিদাসও লিখিতে পারিতেন কি? প্রাণের দায়ে কাজল এই অসম্ভব কাজেও প্রায় অভ্যস্ত হইয়া আসিল।

এক ছুটির দুপুরে সদ্য আবিষ্কৃত গোটাদুই কবিতা পাঠান্তে তুলি বলিল–বেশ হয়েছে, তোমার কবিতার হাত বেশ ভালো। আমি একটাও হারাই নি, জানো তো? সবগুলো একজায়গায় করে বাক্সে রেখে দিয়েছি। এই এত মোটা হয়েছে। আচ্ছা, তুমি ছবি আঁকতে পারো না? কবিতার সঙ্গে ছবি থাকলে দেখতে কত ভালো লাগে–

প্রিয়ার অনুরোধ রক্ষার জন্য যুগে যুগে মানুষ রাক্ষস-রক্ষিত সরোবর হইতে সোনার পদ্ম তুলিতে গিয়াছে, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধ করিয়াছে, স্বর্ণমৃগের সন্ধানে গহন বনে ফিরিয়াছে, ছবি আঁকা আর এমন কী কাজ?

কাজল চিত্রশিল্পীতে পরিণত হইল।

সাধনার পথে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া কাজল বুঝিল বিপদ এইবার গভীরতর। কিছুটা সাহিত্যপ্রতিভা থাকিলে যা হোক করিয়া একটা কবিতা দাঁড় করাইয়া দেওয়া যায়, বিশেষ করিয়া যে কবিতা মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করিয়া পড়া হইবে না, বস্তুত মাত্র একজন ব্যতীত সমস্ত পৃথিবীতে যে কবিতার আর পাঠকই নাই। কিন্তু ছবি আঁকিতে গেলে কিঞ্চিৎ বেশি দক্ষতা ও স্বভাবনৈপুণ্যের প্রয়োজন হয়। কাজে নামিয়া কাজল বুঝিল এ কাজ তাহার নয়। পাখি আঁকিলে বিকলাঙ্গ জিরাফের ছানার মতো দেখায়, মেঘের আড়াল

www.bengaliebook.com

হইতে সূর্যরশ্মি বাহির হইতেছে আঁকিলে মনে হয় বড়ো একতাল ময়দার মধ্যে কয়েকটা সরু কাঠি গোঁজা আছে। একবার তুলির মুখখানিকে পদ্মের সঙ্গে তুলনা করিয়া পুকুরে অনেক পদ্মপাতার মধ্যে একখানি ফুল ফুটিয়া আছে এমন একটি ছবি আঁকিতে চেষ্টা করিল। আঁকা শেষ হইলে মনে হইল জলে অনেকগুলি তেলেভাজা মশলাপাপড় ভাসিয়া আছে, তাহার মাঝখানে একটা জটিল কী যেন—আর যা হউক, সেটি পদ্ম নয়।

প্রায় হতাশ হইয়া পড়িবার মুখে আশার আলো দেখা দিল।

কাজল আবিষ্কার করিল সে খুব সহজেই বেড়াল আঁকিতে পারে। সেগুলি যে অবিকল বেড়াল হয় এমন নয়, কিন্তু সাদৃশ্যের যাবতীয় গুরুতর অসঙ্গতি সত্ত্বেও তাহাদের চিনিতে ভুল হয় না। তুলির স্বভাব, চেহারা ইত্যাদির সঙ্গে বেড়ালছানার তুলনা করিয়া কাজল একখানি দুইপাতাব্যাপী কবিতা লিখিল এবং স্থানে স্থানে গোটাকতক মার্জারশাবকের বিভিন্ন ভঙ্গিমার ছবি আঁকিয়া বসাইয়া দিল। একরঙা ছবিতে মজা নাই, তাই রঙপেন্সিল দিয়া ছবিগুলিকে মনোহারী রঙে রঞ্জিত করিল। নেহাত প্রেম যৌক্তিকতার ধার ধারে না তাই রক্ষা, নহিলে নীল, সবুজ আর ম্যাজেন্টা রঙের চৌখুপিওয়ালা শতরঞ্চির ডিজাইনের বেড়াল দেখিলে স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টাও চমকাইয়া উঠিতেন।

যাহার জন্য ছবি সে কিন্তু খুব খুশি হইল।

কবিতা পড়া হইলে ছবিগুলি ভালো করিয়া আবার দেখিতে দেখিতে উজ্জ্বলমুখে তুলি বলিল—তুমি ছবিও আঁকতে পারা কখনও বলল নি তো! চমৎকার বেড়াল, বেশ বেড়াল।

কাজল বলিল-বেড়ালছানাগুলো কিন্তু তোমাকে ভেবে আঁকা-

–আমাকে? কেন?

–তুমিও ওইরকম নরম নবম, তুলতুলে–

তুলি লজ্জা পাইল, বলিল–যাঃ, যতসব বাজে কথা–

তাহার পর কী ভাবিয়া বলিল–তা হোক, তুমি কবিতার সঙ্গে বেড়াল এঁকো।

অতঃপর কাব্য ও শিল্পচর্চা সমান্তরালভাবে সমানবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কাজল চিরকালের অভ্যাসমত অনেকরাত অবধি পড়াশুনা করে। এক-একদিন বই হইতে চোখ সরাইয়া দেখিত তুলি তাহার পাশে পরম নির্ভরতায় ঘুমাইয়া আছে। রবীন্দ্রনাথ নৌকাডুবিতে যেমন লিখিয়াছেন, তাহার মুখখানি যেন তেমনই সমস্ত বিশ্বচবাচরে একটিমাত্র দেখিবার জিনিসের মতো ফুটিযা আছে। তুলিব ঘুমন্ত মুখে গার্হস্থ্য শান্তি আলো।

মনে কেমন একটা আনন্দ। দুর্লভ বস্তু একান্তভাবে লাভ করিবার আনন্দ।

সরল পৃথিবীর যে স্বপ্নের মধ্যে কাজলের বড়ো হইয়া ওঠা, তাহা একটু একটু করিয়া ভাঙিয়া যাইতেছিল। এবার একটি ঘটনায় সে বুঝিল মানুষের মুখ মোটেই তাহার মনের দর্পণ নয়। তিক্ততার মূল্যে সে কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিল।

একদিন সকালে নিশ্চিন্দিপুর হইতে একজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। কাজলকে দেখিয়া সে বলিল–দাদাবাবু না? নমস্কার দাদাবাবু, ভালো আছেন? কাকীমা কই?

কাজল বলিল–তোমাকে তো ভাই চিনলাম না! কে তুমি?

-চিনবেন আর কী করে? দেশে যাতায়াত বড্ডই কমিয়ে দিয়েছেন কর্তামশাই থাকলে চিনতে পারতেন। আমার নাম শিবু রায়, আপনাদের গাঁয়েরই চড়কতলার মাঠের ধারে আমার বাড়ি। তা পরিচয় দেবার মতো কিছু নেইও, ব্রাহ্মণবংশে জন্ম–এইমাত্র। গরিব ঘরে জন্মেচি দাদাবাবু, পয়সার অভাবে লেখাপড়া শিখতে পারিনি, জন খেটে পেট চালাই। কাকীমাকে প্রণাম করতে ইচ্ছে হল, তাই চলে এলাম। ভোর রাত্তিরের ট্রেন ধরিচি-

হৈমন্তীকে প্রণাম করিয়া এবং স্বর্গত কর্তামশাইকে স্মরণ করিয়া শিবু কাঁদিয়া আকুল হইল, তুলিকে দেখিয়া বার বার মা যেন আমার সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী বলিল, এবং বাহিরের বারান্দায় বসিয়া পরোটা, আলুচচ্চড়ি ও আখের গুড় সহযোগে অবিশ্বাস্য-পরিমাণ জলখাবার খাইল। তাহার হাঁটু পর্যন্ত খাটো কাপড়, ছেঁড়া নীলরঙের হাতকাটা ময়লা হাফশার্ট ও বুভুক্ষু চেহারা দেখিয়া কাজলের মায়া হইল! আহা, বেচারা ভালো করিয়া খাইতে পায় না। তাহারই গ্রামের লোক, উহাকে আজ দুপুরে ভালো করিয়া খাওয়াইতে হইবে।

কাজল বলিল–তুমি খেয়েদেয়ে একেবারে ওবেলা যাবে কিন্তু। মাংস খাও তো?

শিবু রায় আকর্শ হাসিল।–আজ্ঞে, খাই বইকি। খুব ভালোবাসি। তবে পাচ্ছি কোথায়? আমরা গরিব-গুরবো লোক, মাংস কি কিনে খেতে পারি? আজ আপনার দয়ায়-

শিবুর উচ্ছাসকে বাড়িতে না দিয়া কাজল ব্যাগ হাতে বাজারে বাহিরে হইল।

দুপুরে খাইবার সময় বোঝা গেল সকালে শিবুর জলখাবার খাইবার যে বহর দেখিয়া কাজল বিস্মিত হইয়াছিল, সেটা শিবুর প্রকৃত আহারগ্রহণ ক্ষমতার সামান্য ভূমিকামাত্র। আর একটু হইলেই কাজলকে সে-বেলা সপরিবারে উপবাসে থাকিতে হইত।

বেলা তিনটা নাগাদ শিবু ফিরিবার ট্রেন ধরিবার জন্য তৈরি হইয়া হৈমন্তীকে বলিল–ভালো কথা কাকীমা, আপনাদের অনেক জমি তো গ্রামে এমনি পড়ে রয়েছে, কাউকে দিয়ে চাষ করান না কেন? গ্রামের ভেতরের জমিতে তৈরি তবি-তরকারি লাগালে ভালো ফসল পেতেন। ফেলে রেখে লাভ কী? কখন বেদখল হয়ে যায়–বুঝলেন না?

হৈমন্তী বলিল–ওসব ঝামেলা কে করে বাবা? আমার তেমন লোক কই?

শিবু হাতজোড় করিয়া বলল–কেন, আমিই তো আছি কাকীমা। আপনাদের পুরোনো ভিটের পাশ দিয়ে যদি এখন বেগুনের চারা বসানো যায় তাহলে এবাব শীতে বেগুন খেয়ে শেষ করতে পারবেন না। দিন দেখি আমায় পঞ্চাশটা টাকা, আমি ভুই তৈরি করে চারা বসিয়ে দেব। তদারকও আমিই করব। ফসল অর্ধেক আমার, অর্ধেক আপনার।

কথাটা হৈমন্তীর ভালো লাগিল। বেগুন এমন কিছু জিনিস নয়, কিন্তু নিজেদের জমিতে তাহা উৎপন্ন হইবে ভাবিলে আনন্দ হয়। টাকা দিলে গরিব লোকটারও কিছু উপকার করা হইবে। নিজ শ্রমের বিনিময়ে শিবু শীতকালে কিছু উপার্জন করিয়া লইতে পারিবে।

হৈমন্তী তাহার হাতে পঞ্চাশটা টাকা দিল।

পনেরো-কুড়িদিন বাদে বাদে শিবু আসিতে লাগিল। প্রথমবার আসিয়া সে বলিল–চারা লাগানো হয়ে গিয়েছে কাকীমা। অনেকদিন পড়ে থাকা ভুই, চারা লাগানোমাত্র চট করে ধরে নিয়েছে, একেবারে নতুন করে বাড়ছে। তা গোটাকুড়ি টাকা যদি দেন তো বড়ো ভালো হয়, পাহারা দেবার জন্য একটা ছোঁড়াকে লাগাবো। এই বয়েসে রাত জাগতে পাবিনে আর–

টাকা পাইয়া সে চলিয়া গেল।

দিনকুড়ি বাদে আবার আসিয়া হাজির। হৈমন্তী বলিল—কী বাবা, জমির খবর কী?

-ওঃ, খুব ভালো কাকীমা। গাছে বেগুন ধরেছে। দেখবেন এখন এক-একখানা কেমন নিকাটা মুক্তকেশী বেগুন হবে। ইয়ে হয়েছে, গোটা পঁচিশ টাকা যে দরকার—

–আবার টাকা কী হবে?

—নিড়েন দিতে হবে জমিতে। আগাছায় ভরে যাচ্ছে। একা কি আর পারি?

মোট টাকা যা গেল প্রাপ্ত ফসলের দামের সহিত তাহার সঙ্গতি থাকিবে না বলিয়াই মনে হইল। কিন্তু এখন আর থামা যায় না।

শীতের প্রায় মাঝামাঝি শিবু সের দুই মাঝারি আকারের বেগুন গামছায় বাঁধিয়া আনিল।

-কাকীমা, নিন জমির বেগুন। খেয়ে দেখবেন কেমন স্বাদ।

ফসল তুলিবার খরচ বাবদ কুড়ি টাকা লইয়া সে বিদায় হইল।

হৈমন্তী জমির প্রথম ফসল পাইয়া ভারি খুশি। ভাগ্যিস শিবু ছিল।

কিন্তু শিবু আর আসিল না। ফসলের আকাঙ্ক্ষিত বাকি বস্তাও আসিয়া পৌঁছাইল না। খবর লইয়া জানা গেল পুরোনো ভিটের জমিতে একটিও বেগুনচারা বসে নাই। শিবু ওই দুই সের বেগুন আষাঢুর হাট হইতে কিনিয়া আনিয়াছিল। বর্তমানে সে চুরি করিয়া জেলে আছে।

কাজলদের পারিবারিক কৃষি-উদ্যোগ সে বৎসর বেগুনের মরশুমের সঙ্গেই শেষ হইয়া গেল।

www.bengaliebook.com

একবিংশ পরিচ্ছেদ

ঋতুর বদলের সময় যখন এলোমেলো বাতাস বয়, ঘরের মধ্যে সূর্যের আলো কেমনভাবে যেন আসিয়া মেঝেতে পড়ে, চিরদিনের চেনা পৃথিবীকে অদেখা সৌন্দর্যের জগৎ বলিয়া মনে হয়, ফাগুন মাসের তেমনই এক উন্মনা দিনে তুলির প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। কলিকাতায় বিমলেন্দু একা, কাজেই মাতুলালয়ে প্রথম সন্তান হইবার অলিখিত একটা প্রথা থাকিলেও এক্ষেত্রে তাহা সম্ভব হইল না। হৈমন্তীর তত্ত্বাবধানে হেমন্তবাবুর হাতে কাজলের পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল।

কাজল একেবারে আশ্চর্য হইয়া গেল। গৃহস্থবাড়িতে মাঝেমধ্যে সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ইহা সত্য, কিন্তু সংবাদপত্রে পঠিত খবরের মতোই এ সত্যকে সে চিবকাল নৈর্ব্যক্তিক ভাবে গ্রহণ করিয়াছে। বড়ো বড়ো খবর সব অপরের জীবনেই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এ আবার কী! একটা সঠিক স্থানে হাত-পা-যুক্ত সত্যকারের মানবশিশু তাহাদের বাড়িতেই জন্মগ্রহণ করিল যে। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে কাদে, ঘুমায় এবং অত্যন্ত সরল উপায়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া থাকে। অদ্ভুত কথা বটে!

সেই সঙ্গে একটু ঈর্ষাও হইল। তুলি একান্তভাবে তাহার, তুলিকে পাশে বসাইয়া সে কবিতা পড়িয়া শুনাইবে, গল্প করিবে, বেড়াইতে লইয়া যাইবে–যেরূপ এতদিন হইয়া আসিতেছে। এ আবার কে একটা আসিয়া জুটিল, দিব্যি তুলির পাশে শুইয়া ঘুমাইয়া আছে। তাহার অধিকারবোধে ভয়ানক আঘাত লাগিল। ক্ষুদ্র মানবটির উপর প্রতিশোধ লইবার কোনো উপায় নাই, প্রতিহিংসার ইচ্ছাটা সে তুলির উপর অকারণ অভিমান করিয়া পূরণ করিতে লাগিল। ঘবে বেশি আসে না, আসিলেও কাঠকাঠ কথা বলে, কিছুক্ষণ উসখুস করিয়া উঠিয়া চলিয়া যায়। তুলি বুদ্ধিমতী বটে, কিন্তু সরল। তার বুদ্ধি সহজ

বুদ্ধি, কোনো বিশ্লেষণ বা মারপ্যাচের ধার দিয়া যায় না। সে কাজলের আচরণের তারতম্য অনুভব করিল বটে, কিন্তু কারণটা ঠিকঠাক ধরিতে পারিল না। নিজের সহজ বুদ্ধি অনুসারে ভাবিল ছেলেকে স্বামীব কোলে দিলে হয়তো মেঘ কিছুটা কাটিবে। একদিন সকালে জলখাবার খাইবার পর কাজল তুলির ঘরে গেল। সন্তান হইবার পর তুলির শরীর এখনও ভালো করিয়া সারিয়া ওঠে নাই, ডাক্তারবাবু বলিয়াছেন কিছুদিন টানা বিশ্রাম লইতে। সে ছেলেকে বুকের কাছে লইয়া শুইয়া আছে, হালকাভাবে ছেলের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছে।

আর ছেলেটা! নির্লজ্জ ছেলেটা সরল উপায়ে ক্ষুণ্নিবৃত্তি করিতেছে।

ইহাদের দুইজনের আহ্লাদী ভাব দেখিয়া কাজলের জ্বলিয়া গেল।

তাহাকে দেখিয়া তুলি বলিল-এসো, এইখানটায় বোসো। বাব্বাঃ, আজকাল তোমার কী হয়েছে, একেবারেই আসো না, কথা বলল না-কী এত কাজ তোমার?

কাজল কিছুটা অনিচ্ছুকভাবে সন্তর্পণে খাটের পাশে বসিল। তুলি বলিল-খোকনসোনাকে কোলে নাও না গো, কী রকম বাপ তুমি, হেলেকে আদর করতে ইচ্ছে করে না? নাও, কোলে নাও

কাজল চক্ষুলজার খাতিরে যথাসম্ভব সংস্পর্শ বাঁচাইয়া ছেলেকে কোলে লইয়া দু-একটা প্রথাগত আদরের মিষ্টবাক্য বলিল। তুলি খুশি হইয়া বলিল-বাঃ, বেশ দেখাচ্ছে।

কাজল রসিকতা করিবার চেষ্টায় বলিল-কাকে? আমাকে?

তুলি অম্লানবদনে বলিল-না না, আমি খোকনসোনার কথা বলছি-

www.bengaliebook.com

তিক্তরসে কাজলের মন ভরিয়া গেল। হায়, তাহার জীবনের আনন্দের দিনগুলি বোধহয় ফুরাইল!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কোলের কাছে একধরনের উষ্ণ এবং সান্দ্র অনুভূতি তাহাকে সচকিত করিল। দুই হাতে ছেলেকে তুলিয়া কোলের দিকে তাকাইয়া কাজল বুঝিল, এখনি তাহাকে কাপড় বদলাইতে হইবে।

প্রথমটা তাহার ভয়ানক রাগ হইল। সকালবেলা দিব্য ফিটফাট জামাকাপড় পরিয়া বসিয়া আছি, পাজি ছেলেটা সবকিছু ভিজাইয়া কী কাণ্ডই না বাধাইল! তাহার উপর ব্যাপার দেখিয়া তুলি মজা পাইয়া খুব হাসিতেছে। নাঃ, জীবনে আর সুখ রহিল না।

তাহার ঠিক পরেই সেই আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটিল। জীবনের দিকপবিবর্তনকারী ঘটনাটা।

তুলির কোলে ঝুপ করিয়া ছেলেকে নামাইতে গিয়া কাজলের চোখে পড়িল সন্তানের মুখ। যে উপলব্ধি ও মানসিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বহির্জগতের সঙ্গে শিশুর যোগাযোগ ক্রমে বাড়িয়া ওঠে, সেই পর্যায়ে তাহার সন্তান এখনও পৌঁছায় নাই, কিন্তু বাহিরের সংবেদনের প্রতি সে সচেতন হইয়া উঠিতেছে। বাপের হাতে উপর হইতে নিচে দুইবাব দোলা খাইয়া তাহার খুব মজা লাগিয়াছে, নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় নিজেকে সমর্পণ করিয়া কী অম্লান হাসিই না সে হাসিতেছে!

কাজলের বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। এই শিশুটির অম্লান হাসির সঙ্গে সৃষ্টির রহস্যময়তা মিশাইয়া আছে। সে ইহাব স্রষ্টা। সে এবং তুলি। অকস্মাৎ নিজেকে তাহার ঈশ্বরের মতো শক্তিমান বলিয়া মনে হইল, আর সেই সঙ্গে

অনুভব কবিল সন্তানের প্রতি সুগভীর মমতাব ও স্নেহের অনুভূতি কিংবা আরও বেশি কিছু, কী তাহা সে জানে না।

পিতৃত্বের অনুভূতির জোয়ার নিজস্ব তীব্রতায় কাজলকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল।

মায়ের কোলে না দিয়া ছেলেকে সে বুকের কাছে ধরিয়া বলিল–দেখেছ তোমার ছেলের কাণ্ড? কেবল দুষ্টুমি, ঠিক তোমার মতো–দুষ্টু মায়ের দুষ্টু ছা-

হৈমন্তী আনন্দে দিশাহারা হইয়া গেল। কাজলকে সে একেবারে শিশু অবস্থায় পায় নাই, একটি শিশুকে সম্পূর্ণ নিজের হাতে মানুষ করিয়া তুলিবার যে সুপ্ত কামনা নারীর মনে সেই পুতুলখেলার সময় হইতে লুকাইয়া থাকে, হৈমন্তীর সে কামনা পূর্ণ হয় নাই। পৌত্রে মধ্য দিয়া এইবার তাহা সার্থকতা লাভ করিল। দুইমাসের শিশুর ভিতর সে এমন সব গুণ আবিষ্কার করিতে লাগিল বাস্তবে যাহার মাথামুণ্ডু কিছুই নাই। পৃথিবীতে আর কোনো শিশু এমন করিয়া হাসে না, এমন করিয়া হাতপা নাড়ে না, এমন বুদ্ধিমানের মতো তাকায় না! তাহার নাতি ছাড়া দুনিয়ার আর সব শিশুকে মালক্ষ্মীর বাহনের মতো দেখিতে! যে এইসব মতের বিরোধিতা করবে, সে ঈর্ষায় জ্বলিতেছে বলিয়াই সেইরুপ করে! ব্যাপার দেখিয়া কাজলের হাসি পাইত। তাহার মা গল্প লেখে, বাবার একখানা বড়ো জীবনী লিখিতেছে, উপনিষদের শ্লোক আবৃত্তি করে, মা তো আর যে-সে লোক নয়–সেই মায়ের এমন কাণ্ড! নাঃ, স্নেহ সত্যই অতি বিষম বস্তু!

ছেলে একটু বড়ো হইবার সঙ্গে সঙ্গে কাজল তুলিকে আবার অনেকখানি ফিরিয়া পাইল, কারণ নাতির ভার প্রায় সবটাই হৈমন্তী নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছে। সকালবেলা ভালো করিয়া আলো ফুটিবার আগেই ছেলে জাগিয়া ভয়ানক চেঁচামেচি শুরু করে। পৃথিবী ভোরের আলোয় তখনও চোখ মেলে

নাই, তুলিকে জাগাইতে কাজলের মায়া হয়, সে নিজেই ছেলেকে কোলে লইয়া বারান্দায় পায়চারি করে, বলে—ওই দেখ কেমন একটা পাখি, ওই নিমগাছের ডালে। কি পাখি জানিস? ওটা হল কাক-

ছেলে বড়ো বড়ো চোখ করিয়া অবাক বিস্ময়ে কাক দেখে। এই আলো-পাখি-গানের জগতে সে সদ্য আগত। সবই তাহার ভালো লাগে। পাঁচিলের ওপর দিয়া বিড়াল হাঁটিতেছে, উঠানের মাটিতে গাছের পাতার ফাঁক দিয়া আলোছায়ার খেলা, ছেঁড়া খবরের কাগজের একটা টুকরা বাতাসে উড়িয়া কোথায় ভাসিয়া গেল—সবই বেশ কেমন সুন্দর!

নাতির কোলাহলে হৈমন্তী বারান্দায় আসিয়া বলে-দে, আমার কোলে দে। তুই ঘুমুবি আর একটু?

-না মা, উঠেই যখন পড়েছি, বরং লেখাটা একটু এগিয়ে রাখি।

হৈমন্তী নাতিকে কোলে লইয়া উঠানের ছোটো বাগানে নামিয়া পড়ে। একধারে একটা আমগাছ আছে। অল্পবয়েসে কাজল আম খাইয়া আঁটি পুঁতিয়া দিয়াছিল। তাহা হইতে বেশ বড়ো গাছ হইয়াছে, গত বৎসর হইতে ফলও ধরিতেছে। পৌষের শেষ হইতে মঞ্জরী আসে, ফার্মুনের প্রথমে বউলের মাতাল করা গন্ধ পরিবেশকে আকুল করিয়া তোলে। একটা মাঝারি ধরনের কৃষ্ণচূড়া আছে। আর আছে রঙ্গন, টগর, কলাবতী, হৈমন্তীর শখ করিয়া পোঁতা বড়ো এলাচের ঝাড়। মাধবীলতা বারান্দার থামকে আশ্রয় করিয়া প্রায় কুঞ্জবন সৃষ্টি করিয়াছে। নাতিকে কোলে লইয়া হৈমন্তী শিশিরে ভেজা ঘাসের ওপর দিয়া বেড়ায়, কতরকমের ছড়া বলে।

ঘরে ঢুকিয়া কাজল দেখে ইতিমধ্যে তুলির ঘুম ভাঙিয়াছে, চায়ের জল চড়ানো হইয়াছে। কাজল মুগ্ধ দৃষ্টিতে কর্মরতা স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া থাকে। কিছু কিছু

মেয়েকে ঘুম হইতে উঠিলে দেখিতে ভালো লাগে না, কেমন যেন বিশ্বস্ত আলুথালু চেহারা হইয়া থাকে, কিন্তু তুলি সবসময়েই অপরূপা। বরং ঘুম ভাঙবার পর ঈষৎ নিদ্রা জড়াইয়া থাকা তাহার মুখের দিকে তাকাইলে অকস্মাৎ তাক লাগিয়া যায়। সদ্যনিদ্রোত্থিতা তুলিকে দেবীর মতো মনে হয়।

তুলি ঠোঁট টিপিয়া হাসিয়া বলিল কী দেখছ অমন করে শুনি?

-রাজকন্যা দেখছি। গরিব মানুষ, রাজকন্যে তো আগে কখনও দেখিনি-

-সাহস তো কম নয়। কোথাকার কে ঠিক নেই, লুকিয়ে রাজার মেয়ে দেখা হচ্ছে!

কাজল কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল—শুধু কি দেখা? একেবারে হরণ করে এনেছি।

—যাও, কী হচ্ছে! মা এক্ষুনি আসবে ঘরে।

জীবন বেশ সুন্দর। রোজ পোলাওকালিয়া-মাংস খাইতে হয় না, ভালো ভালো জামাকাপড় পরিয়া গাড়িতে চড়িয়া বেড়াইতেও হয় না, ডাল-ভাত খাইয়া সাধারণভাবে জীবনযাপন করাটাই বড়ো আনন্দের। রোজ সকালে যে সূর্য উঠিতেছে, পাখি ডাকিতেছে, কষ্ট দুঃখ উল্লাস মিলাইয়া জীবনের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে, তাহা আশ্চর্যের নয়? শোক দুঃখ বঞ্চনা আছেই, বাঁচিতে গেলে তাহার বিরুদ্ধে লড়াইও করিতে হইবে, কিন্তু সমস্ত আঘাত আর বিরুদ্ধতার মধ্যেও জীবন আনন্দের। জীবনের জন্য লড়াই, যেন লড়াইটাই প্রধান হইয়া না দাঁড়ায়—তাহা হইলে গৃহকোণের এই সরল সুখ, শিশুর গায়ের ঘ্রাণ, প্রিয়ার উষ্ণ সান্নিধ্য সব মিথ্যা হইয়া যাইবে।

তুলি তাহাকে সেই সরল সুখের সন্ধান দিয়াছে।

www.bengaliebook.com

চা আসিল। সকালের প্রথম চায়ের কাপটির গভীর প্রারম্ভিক মূল্য আছে। ধূমায়িত কাপ হাতে লইয়া কাজল বলিল–বোসো তুলি, চা খেতে খেতে গল্প করা যাক–

কাজের পৃথিবীটা তাহার বাস্তব চেহারা সইয়া পুরোপুরি জাগিয়া উঠিবার আগে যে একটা স্নিগ্ধ অবকাশ থাকে, এখন সেই দৈবী সময়। কত কী মনে পড়ে, সারাদিন ধরিয়া অয়নপথে সূর্যের পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দিক হইতে রৌদ্র আসিয়া পৃথিবীর গায়ে এলাইয়া থাকে, বুকের মধ্যে অদ্ভুত এক আনন্দের জন্ম দেয়–সে কথা কাহাকেও ঠিকমত বুঝাইয়া বলা যায় না।

কোথায় যেন যাইবার কথা ছিল। সেখানে গেলে মনে শান্তি আসিয়ে, পরিপূর্ণতা ফিরিবে।

কাজল বলিল-চল, একবার নিশ্চিন্দিপুর থেকে ঘুরে আসি। সেই বিয়ের পরপরই যা গিয়েছিলে, আর তো যাওয়া হয়নি। যাবে? বড় মন কেমন করছে দেশের জন্য তুলি বলিল-তুমি বল কবে যাবে। ভালোই তো, অনেকদিন কোথাও বেরুনো হয়নি। কিন্তু সেদিনই তো আর ফেরা যাবে না, খোকা কি মায়ের কাছে থাকতে পারবে?

-কেন পারবে না? ও আমাদের চাইতে ঠাকুমার কাছে থাকাই বেশি পছন্দ করে-

হৈমন্তীও মত দিল, বলিল–যা, ঘুরেই আয়। খোকন আমার কাছে বেশ থাকবে। তাছাড়া ঊষা রয়েছে, ওকে আমার ঘরে বিছানা পেতে শুতে বলব এখন। একদিনের তো ব্যাপার–

–হ্যাঁ মা, আমরা পরের দিন সন্ধের মধ্যেই ফিরে আসব।

www.bengaliebook.com

হৈমন্তীর শরীর ইদানীং আগের চাইতেও ভাঙিয়া পড়িয়াছে। তুলি তাহাকে সংসারের সব কাজে সহায়তা করে, কিন্তু কাজও তো বাড়িয়া গিয়াছে অনেক, বিশেষ করিয়া কাজলের সন্তান হইবার পর। পরিচিত এক প্রতিবেশীর মাধ্যমে ঊষা নামে একটি মেয়েকে পাওয়া গিয়াছে, সে ঘরের কাজকর্ম দেখে, খোকাকে দেখাশুনা করে, প্রয়োজন হইলে কোলে লইয়া ঘুম পাড়ায়। হৈমন্তীকে একেবারে একা থাকিতে হইবে না।

পরের সোমবার কী একটা পর্ব উপলক্ষে ইস্কুল ছুটি ছিল। রবিবার সকালে কাজল তুলিকে লইয়া নিশ্চিন্দিপুর রওনা হইল। সঙ্গে রানুর জন্য একটা ভালো শাড়ি লইয়াছে। গতবার রানুর সহিত দেখা হয় নাই, সে কোন এক অসুস্থ আত্মীয়াকে দেখিতে কৃষ্ণনগর গিযাছিল। বৌ দেখিতে পায় নাই বলিয়া অনেক দুঃখ করিয়া তাহার পর তিন-চারখানা চিঠি দিয়াছে। রানুপিসির সঙ্গে দেখা করাও কাজলের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

নিশ্চিন্দিপুরের সহিত বহু, বহুদিনের সঞ্চিত নানা স্মৃতি জড়াইয়া আছে। বসন্তের প্রথমে নাগরম না-ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে আরম্ভ করিলে, শুষ্কপত্রে গাছের তলা ভরিয়া থাকিলে মনের মধ্যে যে একটা কেমন করা ভাব জাগিয়া ওঠে, যাহার ঠিক কোনো ব্যাখ্যা হয় না, সেই রহস্যময় অনুভূতির সহিত প্রত্যেকবার নিশ্চিন্দিপুর যাইবার সময় তাহার যে মনোভাব হয় তার মিল আছে। ঠাকুরদা হরিহর, তাহার বাবা, পিসি দুর্গা, ঠাকুমা সর্বজয়া—সবার হাসিকান্না মাখানো জীবনযাত্রার ইতিহাস দিয়া গ্রামখানি যেন এক রূপকথার জালে জড়ানো। বাস্তব নিশ্চিন্দিপুরের চাইতে এই ভাবরাজ্যের গ্রামটিই তাহার বেশি পরিচিত। চারিদিকে জীবন দ্রুত বদলাইতেছে। কিছুই আর আগের মতো থাকিবে না। কিন্তু তাহাদের এই গ্রাম, যে গ্রামকে তাহার বাবা ভালোবাসিয়া বিশ্বসাহিত্যে অমর করিয়া গিয়াছে, তাহা থাকিবে। বাহিরে যতই পরিবর্তন ঘটুক না কেন, মনের ভিতরের একটি শান্তিপূর্ণ গহন, গভীর

কেন্দ্রে নিশ্চিন্দিপুর এক অপরিবর্তনীয় আশ্রয়ের প্রতীক হিসাবে বিরাজমান। এ যুগে সেখানে আর পৌঁছানো যায় না, তবু জীবনের সকল পদযাত্রার শেষে নিশ্চিন্দিপুর অপেক্ষা করিয়া থাকে।

তুলিকে দেখিয়া রানু আনন্দে অস্থির হইল। এটা করে, সেটা করে, কীভাবে যত্ন করিবে ভাবিয়া পায় না। তাহার অবস্থা এখন একটু ভালো, সংসারের কর্তৃত্ব অনেকখানি তাহারই হাতে। ছেলে বড়ো হইয়া কী যেন ব্যবসায় ভালোই উপার্জন করিতেছে, কাজেই ভাইয়ের সংসারে আগের মতো জুজু হইয়া থাকিবার প্রয়োজন হয় না। ছেলের বিবাহ দিবার কথাও ভাবিতেছে। সতুরও আগের সে দাপট নাই, ব্যবসায় ক্রমাগত লোকসান দিয়া সে এখন দিদির মুখাপেক্ষী। ভাগ্যচক্র এইভাবেই আরর্তিত হয় বটে!

দুপুরবেলা রানু তুলিকে লইয়া প্রতিবেশীদের বাড়ি বেড়াইতে যায়। কাজল একা গ্রামের পথে ঘুরিতে বাহির হয়। নীল আকাশের পটভূমিতে থোকা থোকা সাদা সজিনার ফুল ফুটিয়া আছে, ছোটবেলায় মতোই বিন্দুবৎ চিল ওড়ে। পথের পাশের জঙ্গল হইতে বন্য সুঘ্রাণ বাহির হয়। পৃথিবীটা একইরকম থাকে, কেবল মানুষ চলিয়া যায় কোথায়।

এই গ্রামের মাটিতে একজন জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার বাবা, যে নশ্বর দেহে না থাকিয়াও অনেকের অপেক্ষাই বেশি করিয়া বাছিয়া আছে। কাজল নিজে সাহিত্যের ছাত্র, সে নির্ভুলভাবে উপলব্ধি করিতে পারে একটু একটু করিয়া দেশের মানুষের হৃদয়ে তাহার বাবার আসন আরও পাকা হইয়া আসিতেছে। আজ হইতে অনেক বছর কাটিয়া যাইবে, শতাব্দী অতিক্রান্ত হইবে, তখনও তাহার বাবার লেখা লোকে পড়িবে।

কেন?

না, তা সে জানে না। শুধু এইটুকু জানে যে, বাবার লেখা পড়িলে গঙ্গাস্নানের পবিত্রতা এবং তৃপ্তিলাভ হয়। কীভাবে লেখক এই অমরত্বের জাদু সৃষ্টি করেন তাহা কেহ বলিতে পারে কি? লেখে তো অনেকেই, অমর হয় কয়জন? দক্ষতা ও প্রতিভার রহস্য চিরঅভেদ্য।

একটা জিনিস সে উপলব্ধি করিতে শুরু করিয়াছে।

তাহার খুব বড়ো রকমের কিছু হওয়া ঘটিয়া উঠিবে না। লেখকের সন্তানের পক্ষে লেখক হওয়া নিতান্ত কঠিন। এমন কোনো আইন যে কোথাও লিপিবদ্ধ আছে তাহা নহে, কিন্তু সাধারণত ইহাই ঘটিয়া থাকে। সে পাহাড়ে চড়িতে পারিত, ফিলম তুলিতে, গান গাহিতে বা অভিনয় করিতে পারিত। কিন্তু সাহিত্যরচনার চেষ্টা করিলে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সে উদ্যোগ নিভিয়া যাইবে। কাহারও দোষ নাই, দোষ বিশ্বের নিয়মের।

অথবা তাহার দুমুখ বন্ধু সঞ্জয়ের কথাই কি ঠিক? সঞ্জয় বলিয়াছিল—ওহে, লেখা ছেড়ে দিয়ে অন্য কিছু করো। তোমার মধ্যে চেষ্টা বা প্রতিভা নেই তা বলছিনে, কিন্তু ইউ জাস্ট ডোন্ট হ্যাভ দি ফায়ার উইদিন ইউ। তোমার জীবনটা সফ। বিশেষ সংগ্রাম নেই, ক্ষোভ নেই, সামনের বড়ো কোনো প্রতিবন্ধকতা জয় করার দায় নেইমোটামুটি খেয়ে পড়ে ভালোই আছ। ইউ হ্যাভ গন সফ্ট। তুমি বইয়ের জগতে, ভাবের জগতে বাস করো। কোনো সমস্যা থাকলেও তা ওই ভাবজগতেরই সমস্যা। আমি একথা বলছি বলে আমাকে শত্রু ভেবো না, নিজের মনের মতো কথা না বললেই মানুষ সচরাচর বক্তাকে শত্রু ভাবে। আমি এ কথা বলছি যাতে ভবিষ্যতে তোমার হতাশা না আসে।

সবটা না হইলেও সঞ্জয়ের কথা কিছুটা হয়তো ঠিক।

www.bengaliebook.com

কী আসে যায়? অনেক লেখা প্রকাশিত হইতেই হইবে, খ্যাতি পাইতেই হইবে এমন কোনো মাথার দিব্য কেহ দেয় নাই। ভালো লাগে বলিয়া লিখিতেছে, না ভালো লাগিলে বা কেহ না ছাপিলে আর লিখিবে না। বিশ্বনিকষের প্রেক্ষাপটে তাহার চেতনার আলোকবিন্দু ফুটিয়া উঠিয়াছে, যতদিন তাহা স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যে জ্বলে, জ্বলুক না।

সে জানে এই জীবনদর্শন বিরূপ সমালোচনা আমন্ত্রণ করিয়া আনিবে, সঞ্জয় আবার হাসিয়া বলিবে–সফট, সফট লাইফ। তাহাতে দুঃখ নাই। এমন নিজের মতো করিয়া বাঁচিবার সুযোগই বা কজন পায়? বিশেষ করিয়া সে তো অন্য কাহারও ক্ষতি কবিতেছে না। অনন্তপ্রবাহে কেবলমাত্র ভাসিয়া চলিবারই যে কী আনন্দ!

বিকালে চা খাইবার সময় বাড়ি ফিরিয়া কাজল দেখিল রানুপিসিদের বসিবার ঘরে বেশ কয়েকজন লোক তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ব্যাপার কী? তাহাদের মধ্যে একজন বলিল– আমরা আজই সকালে খবর পেয়েছি আপনি এসেছেন। আমাদের পল্লীমঙ্গল সমিতির ঘরে আজ সন্ধেবেলা অপূর্বাবুকে স্মরণ করার একটু ব্যবস্থা করেছি, মানে–আপনি এসেছেন শুনে সকাল থেকে লোকজনকে খবর দিয়ে সব আয়োজন করে ফেলুলম। আপনাকে কিন্তু আসতেই হবে। শুনলাম বউদিও এসেহেন, ওঁকেও আনবেন সঙ্গে দয়া করে।

দুদিনের জন্য নিজগ্রামে আসিয়া একটা সম্পূর্ণ সন্ধ্যা আটকাইয়া পড়িবারাই কাজলের ছিল, কিন্তু তাহার জীবনে বাবার নাম সঞ্জীবনী মন্ত্রের মতো কাজ করে। তাহার বাবার জন্য একদল লোক সভার আয়োজন করিয়াছে আর সে যাইবে না? নিশ্চয়ই যাইবে। সে বলিল–আপনারা রানুপিসিকেও যেতে বলুন, উনি বাবাকে খুব কান্থ থেকে দেখেছেন–

--হ্যাঁ, হ্যা-নিশ্চয়। আমরা ওঁকে বলে যাচ্ছি-

www.bengaliebook.com

সন্ধ্যাবেলা তুলি আর রানুকে সঙ্গে লইয়া কাজল পল্লীমঙ্গল সমিতিতে উপস্থিত হইল। ওপরে লাল টালির ছাদ দেওয়া লম্বামতো ঘর। মেঝেতে শতরঞ্চি পাতিয়া বসিবার জায়গা করা হইয়াছে, বেশ কিছু মানুষ ইতিমধ্যেই জমা হইয়াছে। উদ্যোক্তা ভদ্রলোক, সকালে যাঁহার সঙ্গে কথা হইয়াছিল, বলিলেন—আসুন অমিতাভবাবু, আসুন বউদি। পিসিমাও এসেছেন তো? বসুন, বসুন এইখানে-

বাহিরে হেমন্তের শিশিরা সন্ধ্যা নিবিড় হইয়া আসিতেছে। বক্তাদের কথা শুনিতে শুনিতে কাজল মাঝে মাঝে বাহিরে তাকাইয়া দেখিতেছিল। জীবনটা কী অদ্ভুত! এই গ্রামের পথে পথে শৈশবে খেলা করিয়া বেড়াইবার সময় তাহার বাবা কখনও কি ভাবিয়াছে যে, একদিন ভবিষ্যতের এক হেমন্ত সন্ধ্যায় এই গ্রামেই তাহার স্মরণে সভা হইবে? বাবার, ঠাকুরদার সাহিত্যচর্চা আজ সার্থক হইল।

মায়ের কাছে রাখিয়া আসা সন্তানের কথা মনে পড়িল। খোকাকে নিশ্চিন্দিপুরে আনিয়া কিছুদিন রাখিতে হইবে। এই গ্রাম তাহার সন্তানের ন্যায্য উত্তরাধিকার, ইহা হইতে সে ছেলেকে বঞ্চিত করিবে না। যদিও সে গ্রাম আর নাই, তবু-

বক্তারা বেশিরভাগই এলোমেলো কথা বলিতেছে, তাহাদের উচ্ছ্বাস যতটা, গুছাইয়া বলিবার ক্ষমতা ততটা নহে। তবু কাজলের খারাপ লাগিল না। যাহাই হউক, ইহারা তাহার বাবাকে ভালোবাসিয়াই তো সভার আয়োজন করিয়াছে।

সভা শেষ হইলে অন্ধকার গ্রাম্য পথ দিয়া তাহারা বাড়ি ফেরে। চালতা আর জামরুল গাছের ফাঁক দিয়া অসংখ্য নক্ষত্রখচিত আকাশ চোখে পড়ে। বর্ষাকাল চলিয়া গিয়াছে, ধূলিমুক্ত আকাশ বিপুল বিস্তারে প্রসারিত হইয়া

আছে। দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্যন্ত আলোর নদীর মতো ছায়াপথ, যাহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অবধি আলোর গতিতে যাইতে সময় লাগে ত্রিশ হাজার বৎসর। এই দুর্বোধ্য বিশালত্বের মধ্যে সে, তাহার বাবা, তুলি, সাহিত্য-সংস্কৃতি-সভ্যতা-বিজ্ঞান এবং জীবনের আর যা যা কাম্য সার্থকতা। মানবসভ্যতা বাঁচিলেই বা কী, না বাঁচিলেই বা কী? এই অনাদ্যন্ত বিশ্বজগক্টা একইভাবে নৈর্ব্যক্তিক ঔদাসীন্যের সঙ্গে বর্তমান থাকিবে।

পরের দিন খুব ভোরে তুলিকে লইয়া সে নদীর ধারে গেল।

তখনও সূর্য ওঠে নাই। প্রভাতের দৈবী আলো পৃথিবীতে ছড়াইয়া আছে। নদীর জলে স্রোতের মৃদু টান। স্রোতাভিমুখী সরু সরু লম্বা জলজ শ্যাওলা জলের টানে সামান্য কাঁপিতেছে। যদি মানুষ লোভের বশে, হিংসা, ক্ষমতা বা হঠকারিতার বশে পৃথিবীটাকে বসবাসের অযোগ্য করিয়া না ফেলে, তাহা হইলে এই শান্ত, সুন্দর সকাল আরও অনেক আসিবে। সে যখন পাঁচশত বৎসর অতীত ইতিহাসের গর্ভে, তখনও আসিবে।

খেয়া পারাপার এখনও শুরু হয় নাই। পারের নৌকা জলের কিনারে নদীতে পোঁতা বাঁশের খুঁটির সঙ্গে বাঁধা আছে। জলের উপর দিয়া বহিয়া আসা বাতাস সমস্ত শরীর কেমন জুড়াইয়া দেয়। ওই যে ওখানে প্রায় জল ছুঁইয়া একটা পাখি ওপারের দিকে উড়িয়া গেল। কী পাখি ওটা?

আজ একটু পরেই স্ত্রীকে লইয়া তাহাকে শহরে ফিরিয়া যাইতে হইবে, কিন্তু তাহার সমস্ত চেতনা আর ভালোবাসা থাকিয়া যাইবে এই গ্রামের পথের বাঁকে। চিরদিন বসবাসের জন্য আর ফিরিয়া আসা হয়তো ঘটিবে না, কিন্তু মহীরুহ যত ঊর্ধ্বে মাথা তুলুক, তাহার শিকড় থাকিয়া যায় মৃত্তিকার গভীরে।

তুলি বলিল–কী সুন্দর, না?

www.bengaliebook.com

–ভালো লাগছে তোমার?

–হুঁ।

-তাহলে এ সবই তোমাকে উপহার দিলাম।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

সময় কাটিতে থাকে। যে জীবনে নাটকীয়তা থাকে, দুর্যোগ, উত্থান-পতন কিংবা তীব্র গতি থাকে, তেমন জীবন কাজল বাছিয়া লয় নাই। এই বিশ্বকে সে ভালোবাসিয়াছে, দুর্বোধ্য রহস্যে ভরা এই বিশ্বজগৎটার দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টি লইয়া তাকাইয়াছে, তাহাতেই সে তৃপ্ত। লোকে অবশ্য কবির ভাষায় তাহার সম্বন্ধে বলিতে পারে—অল্প একটু হেসে-খেলেই ভরে যায় এর মনের জঠর, বলুক—তাতে কিছু আসে যায় না। বিশুদ্ধ আনন্দলাভ জীবনের পরম উদ্দেশ্য, বিস্ময় মনের সবচেয়ে পুষ্টিকর খাদ্য।

র‍্যান্ডম হাউস প্রকাশিত একখানি প্রবন্ধের সংকলন পড়িতে পড়িতে চার্লস ল্যাম-এর জীবনীর এক জায়গায় তাহার চোখ আটকাইয়া গেল। নিজের জীবনের সাদামাটা অকিঞ্চিৎকর সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ল্যাম লিখিতেছেন যে, উল্লেখ করিবার মতো কিছুই তাঁহার জীবনে ঘটে নাই। কেবলমাত্র একবার এক পার্কে বসিয়া থাকিবার সময় খপ করিয়া হাত বাড়াইয়া একটি উড়ন্ত চড়াই পাখি ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহাকে যদি ঘটনা বা সাফল্য বলা যায়, বলা যাইতে পারে।

সুন্দর কথা। মনের মতো কথা। ভূমাতে আনন্দ নাই, সারল্যেই আনন্দ।

খোকা বড়ো হইতেছে। এখন সে গুট গুট করিয়া সারাবাড়ি হাঁটিয়া বেড়ায়, ঠাকুমার কোলে হেলান দিয়ে রূপকথার গল্প শোনে। রাত্রিতে বিছানায় বসিয়া বই পড়িতে পড়িতে কাজল ঘুমন্ত ছেলের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখে। ঠিক যেন তুলির মুখের আদল। ঠোঁটের চমৎকার ভঙ্গি, রেশমের মত চুল, বড়ো বড়ো চোখের নিষ্পাপ দৃষ্টি। শেক্সপীয়ারের সনেটগুলির কথা মনে পড়িল, সন্তানের ভিতর দিয়াই তো জীবনের প্রবাহ আর ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন থাকে। আজ হইতে অর্ধশতাব্দী পরে সে থাকিবে না, খোকা থাকিবে।

প্রথম যৌবনের তারল্য কাটিয়া তাহার জীবনে একটা সুসংবদ্ধ স্থিতির ভাব আসিতেছে। এখন মনে হয় হৈ চৈ, আনন্দ, অর্থ, খ্যাতি কিংবা ক্ষমতাই সার্থকতার নামান্তর নয়। নাটক-নভেল আর পড়িতে ভালো লাগে না, ইতিহাস, ভূতত্ত্ব, জ্যোতির্বিজ্ঞান বা মহাপুরুষদের স্মৃতিকথা পড়িতে ইচ্ছা করে। সে মধ্যবয়সে পৌঁছাইল নাকি?

একটা ভয়ের ব্যাপার হইয়াছে।

আগে সে নদীর ধারে গিয়া বসিলে জলের শব্দের মধ্যে অনন্তের বাঁশি শুনিতে পাইত, তারাভরা আকাশের দিকে তাকাইলে অসীম শূন্যের পথহীন গভীরতায় সে কবিতার পংক্তি খুঁজিয়া পাইত। এখন জল শুধুই জল, রাত্রির কালো আকাশ কেবলমাত্রই খানিকটা আলোকহীনতা। জীবনের দম ফুরাইয়া গেল নাকি?

কিছুই জানা হইল না। ইস্কুল জীবনের শেষের দিকে বা কলেজে পড়ার সময় যখন জীবন আর অস্তিত্ব সম্বন্ধে যাবতীয় প্রশ্ন ধীরে ধীরে জন্ম লইতেছিল, সে সময় মনে হইয়াছিল বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত রহস্য সে ভেদ করিয়া ফেলিবে। সামনে এত বড়ো জীবনটা পড়িয়া আছে, সে কত পড়িবে, জানিবে, হয়তো তাহারই জন্য সবকিছু অপেক্ষা করিয়া আছে। এখন সে বুঝিতে পারিয়াছে খুব জোরে দৌড়াইলেই দিগন্তকে স্পর্শ করা যায় না।

কাজল ভূতের গল্প পড়িতে ভালোবাসে। অ্যালজারনন ব্ল্যাকউডের লেখা তাহার খুব প্রিয়। ব্ল্যাকউডের একটি গল্প পড়িতে গিয়া একজায়গায় লেখকের বক্তব্য তাহার মনে হ এক শিক্ষকের মুখ দিয়া লেখক বলাইতেছেন—What was the use of al this? What in the world was the good of all the labour and drudgery one

www.bengaliebook.com

goes through? Wherein lay the value of so much uncertain toil when the ultimate secrets of life were hidden and no one knew the final goal? How foolish was effort, discipline, work! How vain was pleasure! How trivial the noblest life!

অদ্ভুত ব্যাপার। আজ কয়েকদিন ধরিয়া যে অনির্দেশ্যতা তাহাকে কষ্ট দিতেছে, তাহারই নির্যাস যেন ব্ল্যাকউড চোখের সামনে তুলিয়া ধরিলেন। সত্যই তো, কী লাভ পরিশ্রম করিয়া? কী লাভ খ্যাতিতে, প্রতিষ্ঠায়, অধ্যয়নে? সব তো অন্ধকারই থাকিয়া যাবে। মৃত্যু সমস্ত উদ্যোগের অবশ্যম্ভাবী সমাপ্তি।

নদীর স্রোতে আর কোনো গান নাই। দিগন্তের ওপারে কোনো দেশ নাই।

বছরখানেক আগে পুরানো বইয়ের দোকান হইতে নীটশের দাস স্পেক জরথুস্ট পাঁচসিকা দামে কিনিয়াছিল। ভালো লাগে নাই বলিয়া পড়া বেশিদূর অগ্রসর হয় নাই। একদিন রাত্রিবেলা বইখানা লইয়া বিছানায় শুইল। পাশে তুলি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ওপাশে থোকা। মধ্যরাত্রির জীবন্ত স্তব্ধতা থমথম করিতেছে। তাহারই ভিতরে নীটশে আসিয়া বিছানার পাশে বসিলেন। বলিলেন, সুপারম্যান থিয়োরির কথা, ঈশ্বরের অনস্তিত্বের কথা। কোনো উদ্যোগেরই কোনো মূল্য নাই, কারণ পৃথিবীতে কিছুই নতুন ঘটিতেছে না। ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি করিতেছে মাত্র। বিশ্বে মানুষের অস্তিত্ব, দেশ ও কালের মধ্যে বস্তুবিশ্বের অস্তিত্ব, সমস্ত অর্থহীন। তাৎপর্যহীন বিশ্বে সে একটা তাৎপর্যহীন, ক্লান্তিকর জীবন বহন করিয়া চলিতেছে।

নীটশে পড়িতে পড়িতে রাগ হয়, আজন্মলালিত বিশ্বাস এবং সংস্কার একেবারে ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইতেছে দেখিয়া মনে ত্রাসের সঞ্চার

www.bengaliebook.com

হয়, কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রের নিরেট যুক্তির বিরুদ্ধে কিছুই করিবার থাকে না। পণ্ডিতের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না বলিয়াই ভয়টা আরও চাপিয়া বসে।

অন্ধকারে ডুবিয়া যাইবার অসহায় মুহূর্তে একটি তুচ্ছ ঘটনা তাহাকে রক্ষা করিল।

একদিন বিকালে তুলির ঘরে ঢুকিয়া কাজল দেখিল কোলের কাছে একরাশ বকুল ফুল লইয়া তুলি মালা গাঁথিতেছে। কাজল বলিল-কী ব্যাপার, হঠাৎ মালা গাঁথছো যে?

তুলি হাসিয়া বলিল–উষার মা দিয়ে গিয়েছে। সকালে মেয়েকে দেখতে এসেছিল, বলল-বৌমা, এই নাও, আমাদের উঠোনের গাছের ফুল–তোমার জন্য এনেছি। বাবা বকুলফুল খুব ভালোবাসতেন, তাই না? মালা গেঁথে বাবার ছবিতে পরিয়ে দেব

তুলি একটি একটি করিয়া ফুল লইয়া ছুঁচের মাথায় গাথিয়া সূতায় পরাইতেছে। তাহার মুখে নিবিষ্ট মনোযোগ। কাজল কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিল।

এমনিতে বেশ সুন্দর পরিচিত একটি গার্হস্থ্য দৃশ্য। একজন গৃহবধু আপনমনে বসিয়া ফুলের মালা গাঁথিতেছে। এই দৃশ্য লইয়া কত কবিতা লেখা হইয়াছে, কত শিল্পী ছবি আঁকিয়াছে, কত তরুণ এই দৃশ্য দেখিয়া অজানা নায়িকাকে প্রাণমন সমর্পণ করিযাছে।

কিন্তু রোম্যান্টিক অস্বচ্ছতা সরাইয়া ভিতরে তাকাও। সব মিথ্যা। অর্থহীন।

চরাচরব্যাপী কিছু না-র মধ্যে কেন বস্তুর আবির্ভাব? ঈশ্বরের পরিকল্পনা? বেশ, কে ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তা? কারণ অনুপস্থিত, কিন্তু কার্য ঘটিতেছে এমন তো মানা যায় না।

তুলি মুখ তুলিয়া কাজলকে দেখিতে পাইয়া বলিল—একটু এসো না, এইখানে বসে আমাকে একটা করে ফুল এগিয়ে দাও।

কাজল অন্যমনস্কভাবে খাটের একপাশে বসিল। একটি করিয়া বকুলফুল সে তুলির হাতে দেয়, তুলি সেটিকে ছুঁচে গাঁথিয়া আবার হাত বাড়ায়। দেখিতে দেখিতে সুন্দর একটি মালা গড়িয়া উঠিতে লাগিল।

একটু পরে কাজল অবাক হইয়া দেখিল বসিয়া বসিয়া ফুল হাতে তুলিয়া দেওয়ার মতো আপাত নীরস এবং একঘেয়ে কাজও তেমন খারাপ লাগিতেছে না। বরং মালাটি ক্রমে বড়ো হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে এক ধরনের নিবিড় তৃপ্তি চেতনার মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ফুল ছিল, ছুঁচ ও সূতা ছিল, কিন্তু মালাটি এই বিশ্বে কোথাও ছিল না। সেটি মানুষের নির্মাণ, রিক্তহস্ত মানুষের সবচেয়ে বড়ো গৌরব।

যখন আলো কমিয়া আসিয়াছে, তখনও দুজনে বসিয়া শেষ কয়েকটি ফুল সূতায় পরাইতেছে। দুজনের মাথা প্রায় এক হইয়া গিয়াছে।

অজস্র বকুলের বেশ বড়ো একটা মালা হইল। তুলি বলিল—চল তো, চেয়ারে দাঁড়িয়ে বাবার ছবিতে পরিয়ে দেবে। আমি হাত পাই নে—

রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়া মিটিলে হৈমন্তী খোকাকে তাহার কাছে লইয়া গেল। তুলি মশারির একটা কোণ খুলিয়া ওদিকে সরাইয়া দিয়া বলিল—আজ কিন্তু এখনি ঘুমোব না। এসো, দুজনে মিলে সুডো খেলি—

www.bengaliebook.com

লুডো জিনিসটা কাজল মোটেই ভালোবাসে না, কিন্তু তুলির আগ্রহ দেখিয়া সে রাজি হইল। তুলির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা তাহার পক্ষে কঠিন।

খেলা আরম্ভ হইল। তুলির লাল খুঁটি, তাহার সবুজ। কাজল তুলির হইয়া তাহার খুঁটি চালিয়া দিতে লাগিল। তুলি কৌটা নাড়িয়া চাল দেয়, কতর দান পড়িয়াছে দেখিয়া কাজল তুলির খুঁটি আগাইয়া দেয়। তুলি সরল ও সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, দান চালিয়া সে স্বামীর দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকে, কতক্ষণে সে খুঁটি চালিবে।

একবার কাজলের ছয় পড়িল, আর একবার চালিতেই দুই। মোট আট। কাজল দেখিল যে খুঁটি তাহার মধ্যপথে আছে তাহা আটঘর অগ্রসর হইলে তুলির প্রায় পাকা একটি খুঁটি মারা পড়ে। সে দ্রুত ভাবিয়া নতুন একটি খুঁটি ঘর হইতে ছযেব দানে বাহিব করিয়া মধ্যপথে থাকা খুঁটিখানা দুইঘর আগাইয়া দিল। তুলির খেলা কি নষ্ট করা যায়?

তুলি এই সূক্ষ্ম আত্মদানের মহিমা কিছুই বুঝিল না, বলিল-যাক, তোমার একটা খুঁটি বের হল। তোমার এত কম ছয় পড়ে কেন বল তো?

কয়েকদান পরে তুলির পাঁচ পড়িল। ছয় পড়িলে একটি খুঁটি ঘবে উঠিতে পারিত। কাজল খুঁটি হাতে লইয়া একঘর আগাইয়া সুনিল-এক, দুই, দুই, তিন, চাব আর এই হল পাঁচ। বাঃ উঠে গেল।

তুলি ভারি খুশি হইল। পরক্ষণেই তাহার মনে হইল সে জিতিতেছে মানেই স্বামী হারিতেছে। স্বামীব পবাজয়ে এতটা খুশি হওয়া বোধহয় ভালো দেখাইতেছে না। সে বলিল—লুডো খুব সোজা খেলা। তুমি একটু মনোযোগ দিয়ে খেললেই জিততে পারবে—

গভীর রাত্রিতে একবার ঘুম ভাঙিয়া কাজল দেখিল মাথাব কাছের জানালা দিয়া বিছানায় মৃদু জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। খোকা ঘুমের মধ্যে একবার হাসিয়া উঠিল। তুলির নিঃশ্বাসের শব্দ।

বিশ্ব নিবর্থক, দেশ-কাল স্বপ্নমাত্র, বাঁচা মানে বুদ্ধিহীন কালযাপন। কিন্তু তাহারই ভিতর মানুষ খেলা করে। খেলাই আসল। মানুষের নিজস্ব নির্মাণ। বকুলফুলের মালাটির মতো।

মমতাহীন যান্ত্রিক বিশ্বের উদ্দেশে প্রতিস্পর্ধী মানুষের নান্দনিক উত্তর।

সেদিন কলিকাতায় কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে স্কুলজীবনের এক বন্ধুর সহিত কাজলের দেখা হইয়া গেল। বন্ধু সামনে ঝুঁকিয়া ফুটপাতের এক পুস্তক-বিক্রেতার সাজাইয়া রাখা বইয়ের স্তূপের মধ্যে কী খুঁজিতেছিল। কাজল তাহার পিঠে চাপড় মারিয়া বলিল–কী রে রাখাল, কী খবর? আর যাতায়াত করিস না, এক্কেবারে ডুব দিয়ে বসে আছিস কেন?

রাখাল চাপড় খাইয়া প্রথমে অবাক হইয়া পেছন ফিরিয়া তাকাইল, তাহার পর খুশি হইয়া বলিল–আরে অমিতাভ! কেমন আছিস? এখানে কী করছিস?

-বাবার পাবলিশারের কাছে এসেছিলাম। মাঝে মাঝে আসি। তুই?

-ছেলের বই কিনছি রে ভাই। সব নতুন বই কেনার রেস্ত নেই, আমার উপার্জন তো জানিস।

–ছেলে কোন ক্লাসে পড়ে?

–এইটে। আর মেয়ে থ্রি-তে।

-মেয়েও আছে বুঝি?

রাখাল অবাক হইয়া তাকাইল, বলিল—তুই তো শালা দেখছি বুধূই রয়ে গেলি। মেয়ে না থাকলে সে ক্লাস থ্রি-তে পড়ছে কী করে?

যুক্তির সারবত্তা কাজলকে স্বীকার করিতে হইল।

রাখালের চরিত্র বিশেষ বদলায় নাই। সে এখনও হৈ-হৈ করিয়া কথা বলে, অনর্গল ভুল ইংরাজিতে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জানা গেল সে এখনও বড়ো লেখক হইবার আসা পোষণ করে, রোজ একটি করিয়া কবিতা লেখে এবং তিন-চারপাতা করিয়া গদ্যরচনা করে। একখানি উপন্যাস নাকি শেষ হইয়া আসিল বলিয়া।

কাজল বলিল—বাঃ, সাহিত্যসাধনা চালিয়ে যাচ্ছিস শুনে ভালো লাগছে-

রাখাল উৎসাহ পাইয়া বলিল—ভালো না? তুই বন্ধু মানুষ তাই অ্যাপ্রিসিয়েট করলি। পাড়ার লোক আমাকে পাগল বলে। অন্তত পনেরো কুড়িটা ভালো গল্প লেখা হয়ে গিয়েছে। এবার সেগুলো এক এক করে কাগজে পাঠাতে আরম্ভ করব। ওরা গল্প ছাপলে টাকা দেয়, জানিস? টাকাটা জমিয়ে রাখব, বিপদের সময় হ্যান্ডস ফাইভ থাকবে।

হা ঈশ্বর! সরল বন্ধুকে সে বাস্তব পৃথিবীর জটিলতা কী বোঝাইবে? লেখা ছাপানো কি অত সহজ? নাকি লিখিয়া উপার্জন করা কেবলমাত্র লেখকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে? কিন্তু যুক্তির আঘাতে রাখালের স্বপ্নের স্বর্গ ভাঙিয়া দিতে তাহার ইচ্ছা করিল না।

সে বলিল-চল, কিছু খাওয়া যাক। অনেকদিন একসঙ্গে বসে খাওয়া হয়নি-

বন্ধুকে লইয়া কাজল মির্জাপুর স্ট্রীটের পুঁটিরামের দোকানে ঢুকিল। ভিতরের রান্নাঘর হইতে রাধাবল্পভি ভাজিবার সুঘ্রাণ ভাসিয়া আসিতেছে। কাজল চারখানা করিয়া রাধাবল্লভি দিতে বলিযা কোণের একটা টেবিলে বসিল। রাখাল হুসহাস্‌ শব্দ করিয়া গরম রাধাবল্পভি নিমেষে খাইয়া ফেলিল, দুইবার বাড়তি ডাল চাহিয়া লইল।

কাজল বলিল–তোকে আর চারখানা দিক?

রাখাল সাগ্রহে সম্মতি জানাইল। বলিল–একেবারে হাতে গরম, যাকে বলে খোলা টু নো্েলো। বেশ লাগছে খেতে। আসলে এ সময়ে কোনোদিন এত জমিয়ে খাওয়া হয় না, বুঝলি? কাজ থেকে ফেরবার সময় সামান্য মুড়ি আর সস্কুইটো-ব্যস!

কাজল অবাক হইয়া বলিল–সকুইটো আবার কী?

–বাঃ, তুই যেন কী! মশা মসকুইটো হলে শশা সসকুইটো নয়?

এ যুক্তিও কাজল বিনা আপত্তিতে মানিয়া লইল।

পুঁটিরাম হইতে বাহির হইয়া রাখাল বলিল–তুই এত ভালো খাওয়ালি, আমার তো কিছু প্রতিদান দেওয়া উচিত। চল, গোলদীঘির বেঞ্চিতে বসে, তোকে কবিতা শোনাই–

সর্বনাশ! কাজল ব্যস্ত হইয়া রাখালকে বোঝাইতে লাগিল যে, বন্ধুত্বের নিঃস্বার্থ শুভ্রতার মধ্যে দান-প্রতিদানের কালিমা ডাকিয়া আনা কোনো কাজের কথা নহে, রাখালের কিছুমাত্র সংকোচের কারণ নাই। বিশেষ করিয়া তাহাকে পৌনে পাঁচটার লোকাল ধরিতেই হইবে।

দেখা গেল রাখাল সরল বাংলা বোঝে না। কাজলের আপত্তিতে কিছুমাত্র কান না দিয়া সে তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে গোলদীঘিতে আনিয়া বসাইল। জীর্ণ ব্যাগ খুলিয়া মার্বেল কাগজ দিয়া বাঁধানো একটা খাতা বাহির করিয়া একের পর এক কবিতা পড়িয়া যাইতে লাগিল। কবিতাগুলির ভাব বাষ্পবৎ, বিষয়ের মাথামুণ্ড কিছুই নাই, ছন্দ তদব। একটি কবিতা স্বদেশপ্রেম দিয়া শুরু হইয়া দুর্গাপূজা দিয়া শেষ হইয়াছে। পর্যদস্ত, হতাশ কাজল মুখে একধরনের স্থায়ী উদ্ভাস ফুটাইয়া মনে মনে অন্য কথা ভাবিতে লাগিল।

দশ-বারোটা কবিতা পড়িবার পর রাখাল থামিল। বলিল—আজ এই পর্যন্ত থাক। আজ সঙ্গে গল্প নেই বলে শোনাতে পারলাম না। তুই দুঃখ করিস না, একদিন তোর বাড়িতে গিয়ে সকাল থেকে—বেশ হবে, না?

কাজলের মুখের ভাব অত্যন্ত করুণ হইয়া আসিয়াছিল, আরছা গলায় সে কী বলিল ভালো বোঝা গেল না। তাহাকেই সম্মতি ধরিয়া লইয়া রাখাল বলিল—তাহলে ওই কথাই ঠিক থাকল। যাব শিগগীরই, বিলম্বে আর দেরি কেন, বল? চলি ভাই, গিয়ে লিখতে বসব

যাইবার আগে হঠাৎ থামিয়া রাখাল কাজলের দিকে তাকাইয়া একটা অদ্ভুত কথা বলিল। রোগা, অনটনে ভোগা, সামান্য মানুষ রাখাল বলিল-জানিস অমিতাভ, খুব আনন্দে আছি, খুব মজায়। এমনিতে আমি কেমনভাবে বেঁচে আছি তা তো দেখছিস, টেনেটুনে সেলাই করে চালাই। সবার কাছে ছোট হয়ে থাকি। কিন্তু যখন লিখি, কিংবা লেখার কথা ভাবি—তখন মনের ভেতর কেমন যে একটা ভালো লাগা-সে তোকে বোোঝাতে পারব না। তখন কে মনে রাখে কাল বাজার খরচ কোথা থেকে আসবে। বাড়িওয়ালা ভাড়ার তাগাদায় এলে তাকে কী বলব, এসব লেখা সত্যিই কোনদিন ছাপা হবে কী না, হলেও নাম হবে কী না। দূর! তখন শুধু লিখতেই ভালো লাগে, কী লিখব তাই ভাবতে ভালো লাগে। নইলে কী করে যে বাঁচতাম!

www.bengaliebook.com

পিছন ফিরিয়া রাখাল ওই হাঁটিয়া চলিয়া যাইতেছে। কাজল তাকাইয়া রহিল। অনেক তথাকথিত বড়োমানুষ অপেক্ষা, দাম্ভিক ধনী অপেক্ষা বড়ো তাহার বন্ধু। আহা, রাখাল ভালো থাকুক, তাহার স্বপ্ন আর শান্তি চিরজীবী হউক।

পৃথিবীতে মানুষ বড়ো কষ্টে আছে। বাসনার আগুনে ইন্ধন নিক্ষেপ করিয়া সে শান্তিব আশা করিতেছে। কাজল নিজের শরীরের ভিতর টের পায় নাই চারিদিকে দুনিয়া বদলাইয়া যাইতেছে। হাসিমুখে মানুষ বন্দীত্বের খাঁচার দিকে অগ্রসরমান। খাঁচাটা সোনার, তবু খাঁচাই।

আহা মানুষ! প্রিয় মানুষ, বোকা মানুষ!

পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্য শান্তি চিরজীবী হউক।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

সেদিন স্নান করিয়া আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া চুল আঁচড়াইতে গিয়া কাজলের চোখে পড়িল একটি রুপালি সূতা।

আশ্চর্য! পাকাচুল নাকি?

হ্যাঁ, তাই বটে। ডানদিকে, কানের একটু ওপরে। পাকা চুল।

কাজল প্রথমে একটু অবাক হইল। তাহার পর হাসি পাইল। একটু ভয়ও করিল।

বাবার সঙ্গে সেই জাদুঘর দেখিতে যাওয়া। কলিকাতার বাড়িতে বাবার জ্বর, বারান্দার কোণে ঝুড়িতে বাবার প্রিয় পালং শাকের গোড়া শুকাইয়া যাইতে দেখিয়া বুকের ভিতর হুঁ হুঁ করিয়া ওঠা। মামাবাড়ির ঘাটে বাবাকে নৌকা হইতে নামিতে দেখিয়া সে কেমন দৌড়াইয়া গিয়া বাবার কোমর জড়াইয়া ধরিয়াছিল। শৈশব-কৈশোর-যৌবনের কত মায়াময় প্রভাত, প্রিয়জনের মুখ, কত হলুদ আলোয় ভরা অপরাই। সব তো এই সেদিনের কথা। সেসব আর ফিরিবে না বুঝি? সে প্রৌঢ়ত্বের প্রথম ধাপে পৌঁছাইল তবে?

প্রকৃতির এই স্বাভাবিক নিয়ম। ক্রমে একদিন তাহার পায়ে বাত ধরিবে, দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া আসিবে, আশৈশব স্মৃতির উজ্জ্বল শরীরকে জড়াইয়া ধরিবে বিস্মৃতির ধূসর জাল। কিন্তু মনের মধ্যে যে শিশু বাস করে সে মানিতে চায় না। জীবনের প্রথম চশমাখানি হাতে লইয়া কমলাকান্তের যেমন মনোভাব হইয়াছিল, তাহারও তেমন হয়। যৌবনের উৎসবে আর তাহার নিমন্ত্রণ নাই। সূর্য পশ্চিম দিগন্তের দিকে নামিতেছে।

নাঃ, সে খামোকাই ভাবিয়া মরিতেছে। মানুষের গড় আয়ু আশি ধরিলে অবশ্য সে মধ্যবয়স পার হইয়াছে, কিন্তু তেতাল্লিশ বছব এমন কিছু বয়েস নহে। বার্ধক্য আসিতে এখনও অনেক দেরি। তবে হ্যাঁ, সেইসব হারানো দিন আর ফিরিবে না।

খোকা বড়ো হইয়া উঠিতেছে। বাড়িতে তাহার লেখাপড়া শুরু হইয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় ভাগ শেষ হইবার মুখে। স্লেট পেনসিল ধারাপাত লইয়া সকাল-বিকাল সে গম্ভীর মুখে ঠাকুমার কাছে পড়িতে বসে। ঘণ্টাখানেক পাঠাভ্যাস চলিবার পর দেখা যায় বইপত্র বিছানার একদিকে পড়িয়া আছে, খোকা ঠাকুমার কোলে হেলান দিয়া পা ছড়াইয়া গল্প শুনিতেছে। গল্পই বা কতরকমের। রূপকথার কাহিনী তো আছেই, তাহার সঙ্গে আছে মধুসূদনদাদার দইয়ের হাঁড়ির গল্প, অমাবস্যার রাতে গ্রামের অন্ধকার পথে গোভভূতের গল্প-আর আছে খোকার ঠাকুরদার গল্প। সে গল্পই আসরের বেশিটা জুড়িয়া থাকে।

কাজল ছেলের নাম রাখিয়াছে সপ্তর্ষি। নামটা একটু প্রাচীন ভারতগন্ধী হইল বটে, কিন্তু কাজলের চিরদিনই ধ্রুপদী ব্যাপার পছন্দ। আজকাল সবাই কায়দা করিয়া নাম রাখা শুরু করিয়াছে– জয়, রাণা, কাবুল-এমন কী, এই নামই তাহাদের কর্মজীবনেও স্থায়ী হইতেছে। আলাদাভাবে পোশাকি নাম অনেক ক্ষেত্রেই আর ব্যবহৃত হয় না।

পরিবর্তন সর্বত্র আসিতেছে। বদল ভালো, স্থাণুত্ব জীবনের পরিপন্থী। কিন্তু সে কি এই বদল? মানুষ লঘু হইয়া যাইতেছে, অন্নময় হইয়া যাইতেছে। যদি আরও খারাপের দিকে অবস্থা যায়? অন্ধকার যদি আরও ঘনাইয়া আসে? তাহা হইলে এ কোন পৃথিবীতে সে তাহার সন্তানকে রাখিয়া যাইবে?

তাহার এবং তুলির দ্বিতীয় সন্তান আসিতেছে। অপুর নিঃসঙ্গ জীবন সংগ্রাম আর বঞ্চনা পরিপূর্ণতা লাভ করিতে চলিয়াছে উত্তবাধিকারীর সমাগমে। এখন

www.bengaliebook.com

নিজের কথা আর ততটা ভাবিতে ইচ্ছা করে না, কেবল মনে হয় যাহারা থাকিয়া যাইবে তাহাদের সমকাল সুগম হউক।

পৃথিবীটা কেমন যেন দুভাগ হইয়া গিয়াছে। একভাগে উজ্জ্বল আলো, নীল আকাশ, সৌরচরাচরে ব্যাপ্ত বাঁচিয়া থাকিবার সহজ আনন্দ। আর একদিকে অবকাশহীন, নীর পাষাণময় কারাকক্ষের শতাব্দী সঞ্চিত অন্ধকার, পরশ্রীকাতরতা, অশিক্ষা, ঈর্ষার বিষময় প্রকাশ। মৃদু পরিবেশে মানুষ হইয়া সে জগতের বাস্তব রূপ ততটা দেখে নাই, ভাবিয়াছিল জীবনের সবটাই গোলাপী রঙের আলোয় উদ্ভাসিত, সকলেই এখানে রবীন্দ্রনাথের গান গায, চাঁদ উঠিলে সকলেই বনে যাইবার জন্য ব্যস্ত হয়।

না, জীবন ঠিক তেমন নয়। অপুর একটি ছোটগল্প হইতে ফিলম কবিবার জন্য এক পরিচালক ভদ্রলোক কিছুদিন ঘোরাফেরা করিতেছিলেন। একদিন তিনি কাজলকে লইয়া প্রোডিউসারের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিলেন। বড়োবাজারের কাছে দোতলায় একটা খুপরিমতো ঘর, টেবিল আর খানকতক চেয়ার ছাড়া ঘরে বিশেষ কোনো আসবাব নাই। ভদ্রলোকের কীসের ব্যবসা কাজল তাহা বুঝিতে পারিল না। ছবি তুলিতে অনেক টাকা লাগে, এইটুকু ঘরে কী ব্যবসা করিয়া অত টাকা রোজগার হয়?

প্রোডিউসার মাঝবয়েসী, পরনে শার্ট ও প্যান্ট। একটু শিথিল, থলথলে চেহারা। মুখে কুটিল বৈষয়িক বুদ্ধি এবং জীবনের অপরাপর ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্বুদ্ধিতার ছাপ। তিনি কাজলকে বলিলেন-বসুন, বসুন। মিঃ সেন বললেন আপনি আজ আসবেন—খুব ভালো হয়েছে। বাংলা গল্প আমি খুব ভালোবাসি। আপনার তো বয়স বেশি নয়, এত সুন্দর গল্প আপনি লিখেছেন? কতদিন লিখছেন আপনি?

www.bengaliebook.com

একটু কাশিয়া মিঃ সেন, অর্থাৎ পরিচালক বলিলেন—শর্মাজী, গল্প এর নয়, এর বাবার লেখা। অবশ্য ইনিও ভালো লেখেন—

শর্মাজী বলিলেন—ও হো হো, সরি, আপনি অপূর্বচাঁদ বাবুর ছেলে?

কাজল বলিল—অপূর্বকুমার।

-সরি, সরি। কুমার। তা, উনি এলেন না? একটু আলাপ হয়ে যেত-

মিঃ সেনকে তাসের গোলামের মতো দেখাইতেছিল। বিবর্ণ হাসিয়া তিনি বলিলেন—শর্মাজী, অপূর্ববাবু মারা গিয়েছেন। আমি বলেছিলাম আপনাকে-

শর্মা একটুও বিব্রত হইলেন বলিয়া মনে হইল না। মুখে দুঃখসূচক চুক্ চুক্ শব্দ করিয়া বলিলেন—ও, মারা গিয়েছেন। হাঁ, শুনেছিলাম বটে। এত কাজের চাপ, কিছু আর মাথায় থাকে না। সরি।

কাজল অস্বস্তিকর প্রসঙ্গ এড়াইবার জন্য বলিল—কী কাজ আপনার?

শর্মা মিটমিট করিয়া হাসিলেন, বলিলেন—আপনি নিজের লোক, বলতে আপত্তি নেই। আমি একটু টাকাপয়সার কারবার করি—

কাজল ঠিক বুঝিল না। কারবারে টাকাপয়সা লাগে বটে, কিন্তু টাকাপয়সার কারবার কী?

কাজলের মুখের ভাব দেখিয়া শর্মা বলিলেন-বুঝলেন না? আমি যা করি তাকে বলে ফান্ড ম্যানেজমেন্ট। ধরুন রাম আমার কাছে মাসখানেকের জন্য দুলাখ টাকা চাইল, আমি শ্যামের কাছ থেকে টাকাটা ধার করে রামকে দিলাম। দশদিন পরে যদুর কাছ থেকে দুলাখ ধার করে শ্যামের টাকা মিটিয়ে দিলাম।

www.bengaliebook.com

সামান্য কিছু সুদ লাগল। পনেরো দিন পরে মধুর থেকে দুলাখ নিয়ে যদুর টাকা মিটিয়ে দিলাম। আবার সামান্য সুদ লাগল। একমাস পরে রাম সাড়ে বারো পার্সেন্ট সুদ আর টাকা ফেরত দিল। তার থেকে মধুর টাকা দিয়ে দিলাম। এই হাত ফেরতে আমার ছয় পার্সেন্ট সুদ অন্যদের দিতে হল, বাকি সাড়ে-ছয় আমার। সবচেয়ে বড়ো ব্যাপার এই যে, বিজনেসটায় আমার নিজের কোনো টাকা লগ্নী হল না। এর টাকা ওকে দিয়ে মুফতে প্রফিট–

কাজল বলিল–আপনার মাধ্যমে না করে ওরা তো ডিরেকট ধার করতে পারে–

-না পারে না। কেউ দেবে না ওদের। আমার একটা গুডউইল আছে। তাছাড়া বিজনেসের চেন বলে একটা ব্যাপার আছে। বিজনেস চেন কেউ নষ্ট করবে না, সে বদনাম হয়ে যাবে-

--চেনের মাঝখানে কেউ যদি টাকা মেরে পালিয়ে যায়? কী করবেন তখন?

শর্মা আবার মিটমিট করিয়া হাসিলেন, বলিলেন–সেদিকে নো রিসক, আমি কোল্যাটেরাল কিছু রেখে টাকা দিই, শুধু হাতে দিই না।

কাজল এ ব্যবসার কিছুই জানে না। সে জিজ্ঞাসা করিল–কোল্যাটেরাল কী?

–মানে সিকিউরিটি। গোল্ড। কিংবা বাড়ির বা জমির দলিল। কারখানা বা বিজনেসের মালিকানার কাগজ। সময়মতো টাকা না মেটালে বাড়ি জমি বিজনেস আমার-

–এমন হয়েছে?

www.bengaliebook.com

–বেশি না? দুবার। টাকা ফেরত পেলে সাড়ে-ছয় কী সাত পার্সেন্ট কত, এতে থেকে গেল টুয়েন্টি সেভেন পার্সেন্ট। তবে কী জানেন, এ বিজনেসে পয়সা আছে, নাম নেই। সিনেমা করলে লোকে বলবে ওই দেখ শর্মা যাচ্ছে, ও একটা ভালো সিনেমা প্রোডিউস করেছে। নাম হবে, প্রেস্টিজ বাড়বে। তবে হাঁ, সিনেমায় রিস বেশি। যদি ফ্লপ করল, বাজারে চলল না, তাহলে তামাম ডুবল। সেইজন্যে তো মিঃ সেনকে বেছেছি, মিঃ সেনের সিনেমা বাজারে খুব চলে। লোকে খুব দেখে।

কাজের সময় কিন্তু দেখা গেল খ্যাতির অভিলাষী শর্মা লেখককে বেশি পয়সা দিতে একেবারে রাজি নহেন। অমায়িক হাসিয়া বলিলেন নিয়ে নিন। আপনার তো কোনো ইনভেস্টমেন্ট নেই, আটআনার কাগজ আর চারপয়সার কালি। ধরুন যদি পিকচার লেগে যায়, তাহলে আরও কত সিনেমা তৈরি হবে আপনার বাবার–

রাস্তায় বাহির হইয়া পরিচালক ভদ্রলোক লজ্জামিশ্রিত গলায় কাজলকে বলিলেন–কিছু মনে করবেন না, এরা শিল্প-সংস্কৃতির ধার ধারে না তো-নেহাত আমার লাস্ট ছবিটা বাজারে ভালো চলেছে, এক নাম হয়েছে, তাই আমাকে দিয়ে ছবি করাতে চাইছে। যাতে টাকা না ডোবে। নইলে ও কি আমাকেই পাত্তা দেবার লোক?

কাজলের মন কেমন সংকুচিত হইয়া গিয়াছিল। মনে পড়িতেছিল–তবু যেন হেসে যাই যেমন হেসেছি বারেবারে, পণ্ডিতেব মূঢ়তায় ধনীর দৈনন্যব অত্যাচাবে, সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে–

স্থূল বৈষয়িকতার কী নির্লজ্জ বহিঃপ্রকাশ! কেমন হাসিয়া লোকটা বলিল–বিজনেস আর আমি কী করলাম বলুন, ও তো করলেন আপনি। সব মিলিয়ে আমি লাগাব আড়াই লাখ, তিন লাখ। ঝুঁকি নেব, ফিলম চলবে কী চলবে না

www.bengaliebook.com

ভগবান জানে। তারপর হল তো খুব বেশি বিশ-পঁচিশ পার্সেন্ট। আপনার ইনভেস্টমেন্ট আটআনা, প্রফিট টু থাউজ্যান্ড টাইমস্! হাঃ হাঃ হাঃ–

কাজল বলিল–আর ইনটেলেকচুয়াল ইনভেস্টমেন্ট? সেটাব দাম?

অবাক হইয়া শর্মা বলিলেন–সেটা কী?

হাসিয়া কাজল বলিল–কিছু না। ওটা একটা নন-কমার্শিয়াল টার্ম।

শর্মা নিশ্চিন্ত হইলেন।

কোথায় কাব্য-সাহিত্য, কোথায় তাহার দরিদ্র বাবাব চালভাজা খাইযা আনন্দ কবিবাব ইতিহাস। অর্থই সব। অর্থনীতিব নিয়মের ওপর ভিত্তি করিয়াই মানবসভ্যতার অধিষ্ঠান। বাকি সব কথার কথা। মূল্যহীন।

তখনই আবার কে মনের মধ্যে কথা বলিয়া ওঠে। আশার বাণী শোনায়, প্রলোভনে স্থিব থাকিতে বলে। যাঁর হাতে কাল অন্তহীন, সেই দেবতাব বিচাবে আস্থা বাখিতে বলে। সমসামযিকত্বে ঊর্ধ্বে শাশ্বত জীবন বিদ্যমান। তাহার ছবি আঁকে।

বাড়ি ফিরিতে সন্ধ্যা। বারান্দায় আলো জ্বলিতেছে, জানালায় তুলিব পছন্দ করা হালকা বঙেব পর্দা। ওই তাহার গৃহ। সারাদিন অচেনা, বিষয়োন্মত্ত পৃথিবীর সঙ্গে নিদাবুণ পবিচযেব পর ওইখানে তাহার শান্তির আশ্রয়।

দরজার কাছেই ছেলে বসিয়া কয়েকটা রঙ-চটা টিনেব খেলনা আর মাটিব পুতুল লইযা খেলা করিতেছে। সারাদিন পর বাবাকে দেখিয়া সে একগাল হাসিল।

কাজল বলিল—কী খেলছিস রে খোকা? ওঃ, সব খেলনা বেব কবেছিস।

খোকা বলিল—এটা জঙ্গল। এখানে-এই দেখ হাতি, বাঘ, হরিণ সব আছে। বাঘ আর হবিণ এদিকে থাকে, এদিকে থাকে হাতি আর জিরাফ

—সে কী রে! বাঘ আর হরিণ একসঙ্গে থাকবে। বাঘ হবিণকে খেয়ে ফেলবে তো

খোকা এতটা ভাবিয়া দেখে নাই। তাহার জগতে হিংসা থাকিবার কথা নয়। একটু ভাবিয়া সে বলিল—আচ্ছা, আমি বারণ করে দেব। ওরা লক্ষ্মী হয়ে থাকবে।

কাজল মনে মনে বলিল—আশীর্বাদ কবি বাবা, তুই যেন তাই পাবিস। পৃথিবীর বড়ো কষ্ট, তোর বেঁধে দেওয়া নিয়মে যেন শান্তি নেমে আসে-

কাজলের গলা শুনিয়া হৈমন্তী আসিয়া দাঁড়াইল, পেছনে পেছনে তুলি।

কাজল কাঁধের ঝোলা ব্যাগ হইতে টাকাভবা খামটা বাহির করিয়া মায়ের হাতে দিয়া বলিল-আজ বাবার সিনেমার কনট্রাকটটা হয়ে গেল মা। টাকাটা রেখে দাও। একশো টাকা আমি নিয়েছি। বই কিনেছি, তোমার জন্য বালুসাই আর অমৃতি কিনেছি-

হৈমন্তী বলিল-বৌমার জন্য কিছু কিনিস নি?

কাজল একটু কাশিয়া বলিল-সে আছে। সে এমন কিছু না-ওকে পরে দেব এখন—

হৈমন্তীর পেছন হইতে তুলি মুখ টিপিয়া হাসিল।

হাতমুখ ধুইবার জন্য ঘরে ঢুকিতে গিয়া কাজল দেখিল খোকন তাহার সামান্য খেলনার ভাণ্ডার লইয়া তন্ময় হইয়া খেলা করিতেছে। তাহার মুখে সরল আনন্দ।

সার্থকতা আর আনন্দ পাইবার জন্য শর্মাকে লক্ষ টাকা নিয়োগ করিতে হয়। তাহার খোকার মূলধন মাটির পুতুল। মুনাফা শতকরা একশো ভাগ।

www.bengaliebook.com

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রাবণমাসের প্রথম সপ্তাহে তুলির দ্বিতীয় পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। কাজল আশা করিয়াছিল এবার মেয়ে হইবে। তুলির কাছে একদিন সেকথা বলিতে তুলি বলিল–না, আমার মেয়ে ভালো লাগে না। তুমি যেন কী!

-কেন, মেয়ে হলে কেমন সাজিয়ে মজা! ভালো ভালো ফ্রক, শাড়ি, ফিতে, স্নাে-পাউডার, গয়না সব কিনে দেব। ভালো করে লেখাপড়া শেখাব। তাছাড়া মেয়েরা বাপ-মায়ের যেমন সেবা করে ছেলেরা তেমন পারে না–

তুলি অবুঝ জেদের গলায় বলিল—না, মেয়ে না। আমি ছেলে চাই–

কাজল জিনিসটাকে মেয়েদের স্বাভাবিক পুত্রসন্তান কামনা মনে করিয়া কী একটা রসিকতা করিতে যাইতেছিল। হঠাৎ তাহার চোখ পড়িল স্ত্রীর দিকে। তুলি বিবর্ণমুখে কেমন যেন শক্ত হইয়া বসিয়া আছে। সচরাচর যে কোন বিষয়ে জেদ করে না, তাহার স্বভাবে তিক্ততাও নাই। সে এমন স্বরে কথা বলিতেছে কেন?

হঠাৎ সে বুঝিতে পারিল।

নিজের বঞ্চিতা মায়ের কষ্ট, অপমান আর পরাধীনতার কথা তুলির মনে পড়িয়াছে। সে নিজে মেয়ে, বিবাহিত জীবনে সে সুখীও বটে, কিন্তু তবু তুলি কন্যাসন্তান চায় না।

বাংলাদেশের চিরকালের অভিশাপ। তবে দিন বদলাইতেছে। বদল সব যেমন ভালো নয় আবার সব খারাপও নয়। নারী পূর্ণ মর্যাদা পাইবে এমন দিন আসিতেছে। সবটা সে দেখিয়া যাইতে পারিবে না। তাহার ছেলেরা দেখিবে।

অপুর খ্যাতি ক্রমে পাঠকদের মধ্যে সকালের আলোর মতো ছড়াইয়া পড়িতেছে। বড়ো বড়ো সমালোচক, সম্পাদক আর অধ্যাপকেরা তাহাকে চিরকালের ধ্রুপদী সাহিত্যিক বলিয়া প্রবন্ধ লিখিতেছেন, ক্লাসে বক্তৃতা দিতেছেন! স্বাধীনতার পরে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় সাহিত্যের প্রচারের জন্য সংস্থা করিয়াছেন, সেখান হইতে অপুর বই বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ হইয়া বাহির হইতেছে। স্কুলের, কলেজের আর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে উঠিয়াছে। স্টপ গ্যাপে কখনও স্কুলে বাংলার ক্লাস লইতে গেলে ছাত্ররা বলে- স্যার, আপনার বাবার পিসটা পড়ান। পড়ানো শেষ হইলে বলে–বাবার গল্প বলুন স্যার, আমরা শুনবো-কাহারও সঙ্গে নতুন আলাপ হইলে মানুষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তাকায়।

কাজল মনে মনে হাসিয়া ভাবে আমি হলাম চাদের মতে, অন্য জ্যোতিষ্কের আলোয় উজ্জ্বল। লোকে আমাকে সম্মান দেয়, আমার বাবার খাতিরে। আমার বোধহয় আর কিছু হল না–

মনের মধ্যে একটু কষ্ট হয় কি? হয় বোধহয়। কিন্তু গৌরব আর আনন্দ তুলনায় এত বেশি। যে, বিষণ্নতা সেখানে কোনো দাগ ফেলিতে পারে না।

বাবার প্রতি তাহার মনোভাব সে কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে পারিবে না। পারিবাহিক সম্পর্কের ঘনিষ্ট-মধুর অনুভূতি তো আছেই, কিন্তু তাহা অপেক্ষাও অনেক বড় কিছু মনকে পরিপূর্ণ করিয়া তোলে। বাবা কেবল শৈশবের জয়গান গায় নাই, কিংবা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে নিমগ্ন থাকে নাই–যেমন অনেক পাঠক মনে করে। অস্তিত্ব আর জীবনের গৃঢ়তম রহস্যের দিকে বাবা পুলকিত বিস্ময় লইয়া তাকাইয়াছে। চেষ্টা করিয়াছে, তাহার সঙ্গে সকলকে সেই আনন্দময় জগতের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাইয়া দিতে। আগামী বহু শতাব্দীতেও তাহার বাবার মতো সাহিত্যিক আর আসিবে না।

গেলই না হয় একটা জীবন বড়ো একজন লেখকের ছায়ায় ছায়ায়। সে তাহার বলিবাব কথা লিখিয়া রাখিয়া যাইবে, সে পাঠকেরা গ্রহণ করুক আর নাই বুক। কিন্তু একথা সত্য যে, শত বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও জীবন বড় সুন্দর। বড় আনন্দের।

একদিন স্কুল হইতে ফিরিয়া কাজল দ্বিজেনবাবুর একখানা চিঠি পাইল। তিনি অবিলম্বে একবার দেখা করিতে বলিযাছেন। জরুবি প্রয়োজন।

পরের দিনই কাজল কলকাতায় গেল। বসু ও গুহ পাবলিশার্সের ঘরে আরামকেদাবায আজ প্রমথবাবু আসীন। পাশেব চেয়ারে দ্বিজেনবাবু বসিয়া সুযোগের অপেক্ষায় আছেন। কাজল ঢুকিতে ঢুকিতে শুনিল দ্বিজেনবাবু বলিতেছেন–যাও না প্রমথ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে কী কিনতে যাবে বলছিলে। দেরি না করে এইবেলা ঘুরে এস–

কথায় ভুলিয়া বন্ধু একবার বাহির হইলেই হয়! অমনি সন্ধ্যার মতো কেদারা দখল।

কিন্তু প্রমথবাবু বন্ধুকে আশৈশব চেনেন। তিনি উদাস গলায় বলিলেন–যাবখন। পবে যাব-

কৌশল বিফল হওয়ায় দ্বিজেনবাবু চটিয়া পা নাচাইতে লাগিলেন। ঠিক এই সময়েই কাজল ঘরে ঢুকিল। দ্বিজেনবাবু বলিলেন–এই যে তুমি এসেছ, আমার চিঠি পেয়েছ তো?

কাজল দুজনকে প্রণাম কবিযা বলিল–চিঠি পেয়েই তো আসছি। কী ব্যাপার কাকাবাবু?

-বোসো, বলছি। অপূর্ববাবুর দিনলিপির প্রোডাকশন কেমন লাগল?

–খুব ভালো কাকাবাবু। কভার, ছাপা সবই ভালো। কেমন চলছে বইখানা?

–ভালো। কিছুটা সেইজন্যই তোমাকে ডাকা। তোমার বাবাব ডায়েবি আমরা একটু দ্বিধা নিয়ে ছেপেছিলাম সেকথা স্বীকার করছি। প্রমথ ছাড়া সবাই ভয় দেখিয়েছিল। কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে। অপূর্ববাবু সম্বন্ধে আমাদের ধারণাই সঠিক।

কাজল চুপ করিয়া রহিল।

মাথার উপরে পুরানো ডিসি পাখাটা শব্দ করিয়া ঘুরিতেছে।

দ্বিজেনবাবু বলিলেন–আমরা তোমার বাবার রচনাবলী প্রকাশ করতে চাই।

কাজল অবাক হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইল। সে ঠিক শুনিতেছে তো? রচনাবলী! তাহার বাবার! রচনাবলী তো রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র এঁদের বাহির হয়। মানে, যাঁদের ছবি ক্যালেন্ডারে থাকে। বাবা সেইখানে পৌঁছাইয়া গেল নাকি?

প্রমথবাবু বলিলেন–আমরা মোটামুটি একটা স্কীমও করে ফেলেছি। সমস্ত সেটটা দশ ভলমে কমপ্লিট হবে। তোমার মা রাজি হলেই আমরা গ্রাহকভুক্তির জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দেব

কাজল বলিল–বাবার রচনাবলী! দশ ভলমে। খুব আনন্দের কথা কাকাবাবু, কিন্তু জিনিসটা কমার্সিয়ালি ভায়েবল হবে তো? বাবার বই এমনিতে ভালোই বিক্রি হয় জানি, পাঠকেরা বাবাকে ভালোবাসে। কিন্তু রচনাবলী অন্য জিনিস। আপনারা কিন্তু ভেবে দেখুন–

www.bengaliebook.com

দ্বিজেনবাবু বলিলেন—আমরা ভেবে দেখেছি। অপূর্বাবুকে আমরা ভালোবাসি ঠিকই কিন্তু এই ব্যবসাটাও আমাদের চালাতে হয়। বাজারে চলবে না এমন বই আমরা ছাপাই না। তোমার বাবার যুগ এসে গিয়েছে কাজল। আধুনিক লেখকদের মধ্যে ওঁরই প্রথম রচনাবলী হবে-

প্রমথবাবু বলিলেন—দশ খণ্ডে কী থাকবে তা আমরা ছকে ফেলেছি। দেখাচ্ছি তোমাকে-

দেয়ালের গায়ে বইয়ের তাকে রাখা ব্যাগ হইতে কাগজখানি বাহির করিবার জন্য তিনি উঠিতেই টুক করিয়া দ্বিজেনবাবু চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। কাগজ বাহির করিয়া পেছন ফিরিয়া প্রমথবাবু বলিলেন—এই যে, দেখ—উপন্যাসগুলো ক্রোনোলজি ফলো করে—এ কী! এ তো ভারি-যাঃ!

দ্বিজেনবাবু নির্বিকার। পৃথিবীতে কোথাও কোনো অশান্তি নাই। তিনি কাগজ পড়িতেছেন।

সমস্ত পরিকল্পনাটা কাজল বুঝিয়া লইল। মা কখনওই আপত্তি করিবে না। তবু সে বলিল মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে সামনের সপ্তাহেই আবার আসিবে।

মাসখানেকের মধ্যে সমস্ত বাংলা সংবাদপত্র আর সাময়িকপত্রে অপূর্বকুমার রায়-এর রচনাবলীর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইল। সকলেই যে খুশি হইল এমন নহে, তবে কাজল পৃথিবীর আসল রূপ অনেকটা দেখিয়া ফেলিয়াছে, সে অবাক হইল না।

বিজ্ঞাপন বাহির হইবার কিছুদিন পরে কাজল বসু ও গুহ পাবলিশার্সে গেল। তাহাকে দেখিয়া দ্বিজেনবাবু খুশি হইয়া বলিলেন—এই যে, এসো এসো। আবার তোমাকে একটা চিঠি দেব ভাবছিলাম। তা তুমি এসেই পড়েছ

–কেন কাকাবাবু?

দ্বিজেনবাবু আনন্দের হাসি হাসিয়া বলিলেন–আমাদের ধারণাই ঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। সবাই বলেছিল অপুর্ববাবুর রচনাবলী ছাপছেন, আপনাদের কি পয়সা বেশি হয়েছে? কী দেখেছেন মশাই ও লেখকের মধ্যে? হ্যাঁ, একটা দুটো বই দাঁড়িয়ে গিয়েছে তা স্বীকার করি। কিন্তু তা বলে রচনাবলী? ও জিনিস বাজারে কাটবে না–

কাজল ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল বিজ্ঞাপনের ফিডব্যাক কী রকম কাকাবাবু?

-ভালো। খুব ভালো। এর মধ্যেই আমরা পাঁচহাজার গ্রাহক পেয়েছি। শুধু মুখে নয়, রীতিমত টাকা জমা দিয়ে নাম লিখিয়েছে। প্রথম খণ্ড বেবুবার আগে আরও কিছু পাব আশা রাখি। এইবাব বুঝলে এই সবজান্তা পণ্ডিতেরা কত মূখ? দু একজন এসে গ্রাহকদের লাইন দেখে পালিয়ে গিয়েছে, আমাদের সঙ্গে আর দেখা করেনি।

অপুর রচনাবলীর প্রথম খণ্ড বাহির হইবার দিন বসু ও গুহ পাবলিশার্স একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করিলেন। বাংলা সাহিত্যের নামি লেখকেরা ছাড়াও অনেক সাধারণ পাঠকের দল আসিয়া ভিড় জমাইল। কাজল হৈমন্তী আর তুলিকেও সঙ্গে আনিয়াছিল। মানুষের ভিড় দেখিয়া তুলি চুপি চুপি স্বামীকে বলিল–উঃ! অনেক লোক হয়েছে, তাই না?

হৈমন্তীর চোখে জল। সে সভা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। এতটা সে আশা করে নাই।

অপুর একটা ভালো ছবি দ্বিজেনবাবু কাজলের কাছে চাহিয়া লইয়াছিলেন। সেটি বড়ো করিয়া বাঁধাইয়া মঞ্চে রাখা হইয়াছে। সভাপতি একজন প্রবীণ

www.bengaliebook.com

সাহিত্যিক, তিনি অর ছবিতে মালা দিয়া পাশে রাখা প্রদীপ জ্বালাইয়া সভার উদ্বোধন করিলেন।

কাজলের মনে হইল মালা পরিয়া বাবা যেন হাসিতেছে। কী সুন্দর দেখাইতেছে বাবাকে। কত লোক তো সে জীবনে দেখিল, তাহার বাবার মতো কি কেহ দেখিতে সুন্দর

একের পর এক বক্তা উঠিয়া অপুর সাহিত্য সম্বন্ধে বলিতেছেন। শনিতে শুনিতে কাজলের যেমন ভালো লাগিতেছিল, আবার এ কথাও মনে হইতেছিল-সবটা এরা ঠিক বুঝতে পারেন নি। বাবার ব্যক্তিগত জীবনকেও আলোচনার মধ্যে ধরতে হবে। এঁরা যা বলছেন বাবা তার চেয়েও অনেক বড়ো। যাক, একজন সাহিত্যিকের যথার্থ মূল্যায়ন হতে তো সময় লাগেই-

তবে এ কথা সে বুঝিল যে, বাংলা সাহিত্যের জগতে তাহার বাবার আসন পাকা হইয়া গিয়াছে। আলোচনা হয়তো অনেক হইবে, কিন্তু তাহার বাবার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন তুলিবে না।

সভা শেষ হইলে লেখকেরা অনেকেই আসিয়া হৈমন্তীর সঙ্গে আলাপ করিলেন। দ্বিজেনবাবু বলিলেন–বৌদি, একটা কথা আপনাকে বলব ভাবছিলাম। আজ দেখা হয়ে ভালো হল। আপনি অপূর্ববাবুর একটা স্মৃতিকথা লিখুন না, সমালোচনা বা মূল্যায়ন নয়, কীভাবে আপনাদের পরিচয়, জীবনের ছোট ছোট ঘটনা–এই আর কী। অনেক খদ্দের কাউন্টারে জিজ্ঞাসা করে–অপূর্বকুমার রায়ের কোনো জীবনী পাওয়া যায় না? বাজার তৈরি আছে বৌদি, আপনি লিখুন–

হৈমন্তী বলিল-আমি কি পারব ঠাকুরপো? উনি অনেক বড়ো মানুষ ছিলেন-

www.bengaliebook.com

—আপনিই পারবেন, আর কেউ এ কাজ পারবে না। পাঠক অধ্যাপকের তাত্ত্বিক আলোচনা চায় না, মানুষটার জীবনের গল্প জানতে চায়। সে আর আপনি ছাড়া কে পারবে?

অপুর জীবনী হৈমন্তী এমনিতেই একখানা লিখিতেছিল, এইবার উৎসাহ পাইয়া দ্রুত শেষ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আগে সে গল্প-কবিতা লিখিয়াছে, লিখিয়া উপার্জনও করিয়াছে, কিন্তু নিজের সহজ বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া সে বুঝিতে পারিল এইবার কাজ অনেক কঠিন। যাহার জীবনকাহিনী সে লিখিতে বসিয়াছে তাহার কথা সম্ভবত আগামী অনেক শতাব্দী মনে রাখিবে। কিন্তু বাদ দিলে চলিবে না। যতই তুচ্ছ হোক, সবকিছু লিখিয়া রাখিতে হইবে। তাহার চাইতে ভালো করিয়া তাহার স্বামীকে কেহ চেনে না, একদিন হয়তো তাহার লেখা হইতেই গবেষকরা উপাদান সংগ্রহ করিবে।

সাদা পটভূমিতে হালকা জলরঙের কাজ যেমন একটু একটু করিয়া শিল্পীর তুলির স্পর্শে ফুটিয়া ওঠে, তেমনি হৈমন্তীর কলমে মূর্ত হইয়া উঠিল পেছনে ফেলিয়া আসা বাসন্তী দুপুর, দিনের কাজের ফাঁকে অকারণ চকিত চাহনি, ঘন বর্ষার দিনে জানালার পাশে চেয়ার পাতিয়া কবিতা পড়া, গান গাওয়া। লিখিতে লিখিতে মনে পড়িয়া গেল স্বামীর পাশে ঘুম ভাঙিয়া জানালার পাশে ছোট রাধাচূড়া গাছটার দিকে তাকাইয়া থাকিবার কথা। সূর্য ওঠে নাই, মেঘলা আকাশের পটে লাল ফুলের গুচ্ছ। তাকাইয়া থাকিতে থাকিতেই একটা টুনটুনি পাখি আসিয়া গাছের ডালে বসিয়াছিল। জানালার তিন হাতের মধ্যে গাছটা। অত কাছ হইতে সে আর কখনও টুনটুনি দেখে নাই। অসম্ভব রকমের ছোট আর ক্ষিপ্র পাখিটা। সকালবেলা জাগিয়া উঠিবার আনন্দে কী কবিবে ভাবিয়া পাইতেছে না।

কত-কতদিন হইয়া গেল তারপর। সে পাখি আর বাঁচিয়া নাই।

www.bengaliebook.com

পথের ধারে ফুটিয়া থাকা হলুদ রঙের বুনোফুল তুলিয়া স্বামী তাহার চুলে পরাইয়া দিয়াছিল। পর্বতসানুর অরণ্যে জ্যোৎস্নারাত্রে দাঁড়াইয়া তাহাকে বলিযাছিল—শক্তিমতী হও, এই বিশ্ব, এই প্রকৃতির প্রসাদ তোমার অন্তরে নেমে আসুক। স্রষ্টাকে জানো, আদিত্যবর্ণ সেই পুরুষকে, অন্ধকারের পরপাবে যার স্থিতি, ত্বমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি–

প্রতিদিনের আপাততুচ্ছতা দিয়া তৈরি জীবনের মহৎ স্থাপত্যের কথা সে বলিয়া যাইবে।

খুব জেদের সঙ্গে কোনো কাজ করিবার সময় মানুষ নিজেকে ভুলিয়া তাহা করে। হৈমন্তী অপুর জীবনী সেই জেদ লইয়া লিখিতেছিল। লেখা শেষ হইতে কাজল যেদিন পাণ্ডুলিপি দ্বিজেনবাবুর কাছে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল, তাহার দিন সাতেক পরেই হৈমন্তী গুরুতর অসুখে পড়িল। আগে হইতেই তাহার শরীর ভালো যাইতেছিল না, কেবল মনের জোরে সে আসন্ন অসুস্থতাকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। এবার সে শয্যা নিল। ক্ষুধা নাই, শরীরে শক্তি নাই, চোখে কেমন একটা উদাসীন নিস্পৃহ দৃষ্টি। কলিকাতা হইতে বড়ো ডাক্তার আসিয়াও দেখিলেন। বিশেষ কিছু উপকার হইল না। ডাক্তারকে কাজল জিজ্ঞাসা করিল—কেমন বুঝছেন ডাক্তারবাবু? কী হয়েছে মায়ের?

চিকিৎসক বলিলেন-ইন ফ্যাক্ট, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। ওঁর শরীরের যন্ত্রপাতি সবই ঠিকঠাক ফাংশান করছে। প্রেশার নেই, ব্লাড সুগার নেই, হার্ট এই বয়েসের তুলনায় মোটামুটি ভালো। আসলে আমার মনে হয় ওঁর বাঁচার ইচ্ছেটাই যেন কমে গিয়েছে। এ রকম হয়। ইনভলভমেন্ট নেই, কিছুর সঙ্গে উনি আর তেমন যোগাযোগ অনুভব করছেন না–

-এর চিকিৎসা কী? কিছু নিশ্চয় করার আছে?

-পেসেন্টকে আনন্দে রাখুন, কাছে বসে গল্পগুজব করুন। আমি একটা বলকারক ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি, তাতে হয়তো কিছুটা কাজ হবে। অবশ্য আপনি আরও সিনিয়র কারও মত নিতেই পারেন-

বাহিরে আসিয়া কাজল বলিল—ডাক্তারবাবু, আপনার দক্ষিণা কত ঠিক জানি না। একটু যদি-

ডাক্তার বলিলেন—দক্ষিণা দিতে হবে না। আপনার বাবা আমাদের দেশের গর্ব। অপূর্ব রায়েব স্ত্রীর চিকিৎসা করে পয়সা নিতে পারব না। যে যাই বলুক, ডাক্তাররা একেবারে চামার নয়-

কাজলের চোখে জল আসিল। কত শ্রদ্ধা করে মানুষ তাহার বাবাকে! ধরা গলায় সে বলিল—ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু, অনেক ধন্যবাদ

ঘরে আসিয়া সে হৈমন্তীর পাশে বসিল। বলিল-মা, ডাক্তারবাবু তো বললেন তোমার কোনো অসুখই নেই। একটু দুর্বলতা আছে, তার জন্য ওষুধ দিয়েছেন, সেটা খেলে দুর্বলতা কেটে যাবে। এবার মনে জোর এনে উঠে পড় দেখি, আমাদের আর চিন্তায় রেখো না

হৈমন্তী ম্লানভাবে হাসিল। ছেলের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল—তুই কিন্তু বড়ো বোগা হয়ে যাচ্ছিস-

কাজল বলিল—মা না দেখলে ছেলে তো রোগা হবেই।

হৈমন্তী বলিল-তা কেন, মা কি কারও চিরদিন থাকে? কেমন লক্ষ্মীর মতো বৌমা এসেছে, বৌমার হাতে সব ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি

–সে ছেলেমানুষ। তোমাকেই সব আবার বুঝে নিতে হবে। আমি বুঝতে পেরেছি, তোমার হচ্ছে আমার আর বৌমার ঘাড়ে কাজ চাপিয়ে দেবার ফন্দি। ওসব চলবে না, চটপট সেরে ওঠো-

হৈমন্তী কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া তাকাইয়া থাকিল।

মায়ের বইখানা তাড়াতাড়ি প্রকাশ কবিবার জন্য কাজল খুব খাঁটিতে লাগিল। প্রায়দিনই বিকালে দ্বিজেনবাবুর দোকানে গিয়া প্রুফ দেখিয়া দেয়, প্রচ্ছদ সম্বন্ধে পরামর্শ করে। ছবি থাকিবে কী না সে বিষয়ে আলোচনা হয়।

সে ডাক্তার নয়, চিকিৎসাশাস্ত্রের কিছু বোঝেও না। কিন্তু মায়ের চোখের দিকে তাকাইয়া সে বুঝিতে পারিয়াছে মা আর বাঁচিবে না। সংসার হইতে মায়ের মন উঠিয়া গিয়াছে। বড় সাধের বই মায়ের, বইখানা যেন মা দেখিয়া যাইতে পারে-

বইখানা যেদিন প্রকাশ হইবার কথা সেদিন কাজল স্কুল কামাই করিয়া প্রায় সকাল হইতে দ্বিজেনবাবুর দোকানে গিয়া বসিয়া থাকিল। বেলা একটা কী দেড়টা নাগাদ দপ্তরীখানা হইতে প্রথম লট বাঁধাইয়া আসিল। দপ্তরীর লোক ঝাকাটা মাথা হইতে নামাইয়া রাখিতেই দ্বিজেনবাবু এককপি বই হাতে তুলিয়া লইয়া বলিলেন-বাঃ, বেশ হয়েছে। নাও, দেখ–

প্রখ্যাত এক শিল্পীর আঁকা অপুর ছবি দিয়া কভার ইয়াছে। বিস্কু রঙের জমির ওপর গাঢ় খয়েরি রঙ দিয়া আঁকা রেখাচিত্র। বেশ হইয়াছে বই।

পাঁচকপি বই লইয়া বিকালে কাজল বাড়ি ফিরিল। তাহার অপেক্ষায় তুলি বারান্দায় বসিয়াছিল, তাহাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল–কী হল? বেরিয়েছে বই? কই, দেখি–

www.bengaliebook.com

তাহার পর দুইজনে হৈমন্তীর ঘরে গিয়া তাহার বিছানার পাশে দাঁড়াইল। কাজল বলিল–মা, এই দেখ, তোমার লেখা বই বেরিয়েছে। দেশ–

হৈমন্তী বইখানা হাতে লইল। কাজল গিয়া ঘরের আলো জ্বালিয়া দিল। তুলি একটু আগে ঘরে ধূপকাঠি জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছে। মা চন্দন ধূপ ভালোবাসে। ঘরের বাতাসে চন্দনের মৃদু সৌরভ।

হৈমন্তী বইয়ের প্রচ্ছদের দিকে অনেকক্ষণ তাকাইয়া থাকিল। তারপর বই খুলিয়া উৎসর্গপত্রটা ভালো করিয়া পড়িল। জীবনের প্রথম এবং সম্ভবত শেষ বইখানি সে স্বামীকে উৎসর্গ করিয়াছে। যাহার জীবনী তাহাকেই।

বই মুড়িয়া বালিশের পাশে রাখিয়া হৈমন্তী বলিল–সুন্দর বই হয়েছে। মলাটে তোর বাবার ছবি কে এঁকেছে রে? আমার নাম করে বলিস–ছবি ঠিকঠাক আঁকা হয়েছে। বৌমা, ওকে কিছু খেতে দাও। সেই সকালে খেয়ে বেরিয়েছে–

www.bengaliebook.com

পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ

বিসর্জনের বাজনা বাজিতে শুরু করিয়াছে, কাজল জানে। জন্মের পরে উজ্জ্বলভাবে বহুদিন জ্বলিয়া একটা নক্ষত্র যেমন ক্রমে ম্লান আর হলুদ হইয়া আসে, তেমনি মানুষের জীবনও। স্রোতে এবার ভাটার টান। সবাই মিলিয়া আনন্দ করিয়া বাঁচিবার দিনগুলি ফুরাইয়া আসিল। এখনও আনন্দ থাকিবে, জীবন থাকিবে, চারদিকে পৃথিবী তেমন করিয়াই চলিতে থাকিবে, কিন্তু তেমন করিয়া আর সকাল হইবে না, কী যেন একটা থাকিবে না। মা চলিয়া গেলে তাহার জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্ব শেষ হইয়া যাইবে। কে আর বাবার গল্প শোনাইবে, কালো মেঘ ঘনাইলে দেখিবার জন্য ডাকিয়া আকুল হইবে।

পৃথিবী কত বদলাইয়া গেল। এমন সে কখনও দেখে নাই। মানুষ হাসে কম, ভালোবাসে কম। হাসিলে তাহার অনেকরকম অর্থ হয়, ভালোবাসিলে তাহার পেছনে অনেক কারণ থাকে। কাহারও আড্ডা দিবার সময় নাই, দু দণ্ড শান্ত হইয়া বসিয়া মানবিক গল্প করিবার সময় নাই। প্রত্যেকে আখের গুছাইবার জন্য ব্যস্ত। প্রত্যেকেই টাকা জমাইতেছে, বাড়ি করিতেছে, ছেলেকে ডাক্তার আর ইঞ্জিনীয়ার করিতেছে। এমনভাবে আর কিছুদিন চলিলে দেশে আর শিক্ষক, কবি, দার্শনিক কিংবা শিল্পী থাকিবে না। একটা জাতি একেবারে মরিয়া যাইবে।

তাহার সন্তানদের সে এ কোথায় আনিল? এ কোন উপলব্ধিহীন, মননহীন, অসুস্থ ঘোলাটে আলোয় স্তিমিত পৃথিবীতে সে তাহাদের রাখিয়া যাইবে?

পিতার কর্তব্য সন্তানকে প্রকৃত আনন্দ লাভ কবিবার পথের সন্ধান দিয়া যাওয়া। যুগ যতই পরিবর্তিত হোক, শৈশবে পিতামাতার কাছ হইতে লাভ করা শিক্ষা বুকের মধ্যে থাকিয়া যাইবে। ছোট ছেলে এখনও খুবই ছোট, কাজল সপ্তর্ষিকে মনের মতো করিয়া গড়িবার চেষ্টা লাগিয়া পড়িল।

www.bengaliebook.com

সকালবেলা সে ছেলেকে লইয়া শিশিরভেজা ঘাসের ওপর হাঁটে, উবু হইয়া বসিয়া ঘাসফুল দেখায়। নিজের ছোটবেলার গল্প শোনায়, ঠাকুরদার কথা বলে। মাঝে মাঝে ছেলে আর হাঁটিতে চায় না, দুই হাত উঁচু করিয়া বাবার দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। কাজল তখন ছেলেকে কোলে নেয়। সপ্তর্ষি বাবার গালে গাল ঠেকাইয়া অবাক চোখে সব কিছু দেখে। ওই একটা পাখি আসিয়া গাছেব ডালে বসিল। ওই একটা বাছুর কোথা হইতে আসিয়া মাঠের মধ্যে খুব খানিকটা দৌড়াইয়া বেড়াইল। বাবার বুকের গরমে থাকা কী আরামের। বাবা কী একটা গান গুনগুন করিয়া গাহিতেছে। বেশ সুন্দর গানটা।

তুলি তাহার জীবনকে ধন্য করিয়াছে। সুন্দরী স্ত্রী অনেকেরই থাকে, সুন্দর স্বভাবের মেয়েও পৃথিবীতে বিরল নয়। কিন্তু তুলি অনন্যা, জগতে একমাত্র। জীবন সুন্দর, কারণ সে জীবনে তুলি আছে।

কেন যেন ফেলিয়া আসা দিনগুলির কথা মনে পড়ে, অনেকদিন যাহাদের দেখে নাই তাহাদের কথা মনে পড়ে। ভবঘুরে মামা প্রণব কোথায় চলিয়া গিয়াছে কে জানে। রামদাস কাকা বোধহয় আর বাঁচিয়া নাই, বাঁচিয়া থাকিলে একবার অবশ্যই আসিত। ব্যোমকেশ নিজের গ্রামে বিবাহ করিয়া শেকড় গাড়িয়া বসিয়াছে। মা অসুস্থ, খুবই অসুস্থ। হয়তো আর উঠিবে না। থাকিবার মধ্যে আছে আকাশ, বাতাস, প্রান্তর, গাছপালা। অনেকদিন আখের আলির খবর লওয়া হয় নাই। কেমন আছে মানুষটা? একবার গেলে মন্দ হয় না।

সেই বাঁশবন, বরতি বিল, দিগন্তস্পশী প্রান্তর-সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে বাঁশবনের মাথা হইতে আকাশে শয়তান উড়িয়া যায়, তাহাদের মুখ দিয়া আগুনের শিখা বাহির হয়, আখের আলি গল্প করিয়াছিল। কেমন আছে আখেরের বৌ রাবেয়া? এতদিন কেন তাহাদের কথা মনে পড়ে নাই? কিন্তু মনে পড়িতেই বুঝিতে পারিল ওই মুক্ত প্রকৃতির প্রসারেই তাহার অস্তিত্বের

www.bengaliebook.com

আসল সার্থকতা লুকাইয়া আছে। খ্যাতিতে বা অর্থে নয়, সভা-সমিতি কিংবা সামাজিক প্রতিষ্ঠায় নয়। মাঠের পারে অলৌকিক সূর্যাস্তের সৌন্দর্যে মহাজীবনের যে সংবাদ আলোর সংকেতে ফুটিয়া ওঠে, সঠিকভাবে তাহা পাঠ করিতে পারার আনন্দই জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ।

বাতাসে মাটির গন্ধ বহিয়া আসে। শুষ্ক খড়ের গন্ধ, জলের শব্দ, পাখির ডাক। মাঝখানের দশবারোটা বছর মুছিয়া যায়, আশা-আকাঙ্খায় উদগ্রীব অল্প বয়সের জীবনটা আবার ফিরিয়া আসে। অনেক দেরি হইয়াছে, আর নয়। কালই সে যাইবে, ছেলেকে লইয়া।

পরের দিন দুপুর গড়াইয়া গেলে কাজল ছেলেকে লইয়া বাহির হইল। রাস্তায় বেশ লোকের ভিড়, অনেক গাড়িঘোড়া চলিতেছে। আজকাল সারাদিনই বহু লোক বিভিন্ন কাজে কোথা হইতে কোথায় যাতায়াত করে। এত ব্যস্ততা কীসের? কাহারও এতটুকু সময় নাই। সকলেই জীবনযাত্রার মান আর একটু বাড়াইয়া লইবার জন্য দিশাহীন ছুট লাগাইয়াছে। ডায়োজিনিসের কথা মনে পড়ে। সামান্য ডালসিদ্ধ খাইয়া সারাদিন পড়াশুনা করিতেন। শিষ্যদেব উপদেশ দিতেন। স্টোইক দর্শনের মূল কথাটাই মানুষ ভুলিয়া গেল। বিশাল বাড়ি, দামি পোশাক, সুখাদ্যের দীর্ঘ তালিকা, ক্ষমতার মাদকতা—সব হইতেছে, কিন্তু জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা কীসে পূর্ণ হইবে?

বাবার সঙ্গে বাহির হইতে পাইয়া সপ্তর্ষি খুব খুশি। সে বলিল—আমরা কোথায় যাব বাবা?

-চল না, দেখবি এখন। আমার অল্পবয়েসে যেখানে বেড়াতে যেতাম, সেখানে নিয়ে যাব। দেখবি কত পাখি, বড়ো বড়ো মাঠ, বাঁশবন। তুই ফিঙে পাখি দেখেছিস? মাছরাঙা?

-হুঁউ-উ। মা চিনিয়ে দিয়েছে। যেখানে যাচ্ছি সেখানে ফিঙে আছে?

—আছে তো। তালচড়াই আছে, দোয়েল ছাতারে বসন্তবৌরি আছে—

সপ্তর্ষি বলিল—প্যাঁচা নেই?

—তাও আছে। তবে প্যাঁচা তো দিনে বেরোয় না। ফেরার সময় সন্ধে হয়ে গেলে দেখা যাবে হয়তো। তুই প্যাঁচা দেখেছিস?

-হুঁ। মা দেখিয়েছে।

-মা! তোর মা প্যাঁচা পেল কোথায়?

—ছবির বইতে। দু রকম প্যাঁচা আছে, ভূতুম প্যাঁচা আর লক্ষ্মী প্যাঁচা।

-আচ্ছা দেখি, আজ তোকে জ্যান্ত প্যাঁচা দেখানো যায় কি না।

প্রথম বাসায় বড়ো ভিড়। ছেলের কষ্ট হইবে ভাবিয়া সেটা ছাড়িয়া দিল। পরের বাস আসিল মিনিট দশেক পরেই। এটায় তত ভিড় নাই। এমন কী উঠিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দু জন লোক নামিয়া যাওয়ায় কাজল ছেলেকে লইয়া বসিবার জায়গাও পাইয়া গেল।

অনেক, অনেকদিন পরে আবার সে এই পথে বেড়াইতে যাইতেছে। প্রথম যৌবনের সেই আশ্চর্য জীবনানুভূতি, রোভরা দুপুর, সামনে বিস্তৃত না-দেখা সমগ্র জীবনটা, সমস্ত আবার মনে পড়িয়া যায়। ছেলেকে সে এই বিস্তারের মধ্যে মুক্তি দিয়া যাইবে। এইভাবেই উত্তরাধিকারের হস্তান্তর।

বাসের দরজায় দাঁড়ানো সহিসটা হাঁকিল-মোহনপুর, মোহনপুর মোড়!

কাজল বলিল–খোকা, এরপরেই আমরা নামব। চল, এগুই–

পরের স্টপেই সহিস চেঁচাইল-কাঁঠালিয়া! কাঁঠালিয়া!

নামিতে গিয়া কাজল অবাক হইয়া থামিয়া গেল।

কাঁঠালিয়া গ্রামটা কোথায় গেল? মাঠ, বাঁশবন আর ধানক্ষেত? এ তো দেখা যাইতেছে চারদিকেই নিবিড় বসতি, গায়ে গায়ে লাগা বাড়ি, ইটের পয়েন্টিং করা বাঁধানো রাস্তা পাড়ার মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছে। রীতিমত শহর জমিয়া উঠিবার উপক্রম। একজন আধুনিক চেহারার যুবক আবার একটা বিলাতি কুকুর চেনে বাঁধিয়া বেড়াইতেছে। কলিকাতা হইতে আর বাকি কী?

পেছন হইতে কে বলিল–দাদা, না নামলে সরে দাঁড়ান, দরজা আটকাবেন না–

ছেলেকে লইয়া কাজল সরিয়া আসিল।

সপ্তর্ষি বলিল-নামলে না যে বাবা?

-হ্যাঁ, ইয়ে–আমরা একটু গাছপালা আছে এমন জায়গায় নামব। এখানে খালি বাড়িঘর–

–তুমি যে বলেছিলে কাঁঠালিয়ায় গাছপালা আর মাঠ আছে?

কাজল ইতস্তত করিয়া বলিল–ছিল তো। একটু এগিয়ে পাওয়া যাবে এখন। দেখা যাক–

www.bengaliebook.com

পরের দুইটা স্টপেও নামা গেল না। শিউলি, তেলিনিপাড়া চলিয়া গেল। কোথায় নামিবে সে? সভ্যতার অগ্রগতির প্রতীক হিসাবে জনপদ প্রসারিত হইয়াছে। এখানে বসিবার মতো ঘাস নাই, দেখিবার মতো দিগন্ত নাই, ভাবিবার মতো সময় নাই। পুত্রকে লইয়া সে এখন কোথায় যায়?

দেবপুকুরে গিয়া কাজল বাস হইতে নামিল। এখানে রাস্তার ধারে এখনও মাঠ, ঝোপজঙ্গল। দেবপুকুরে সে আগেও আসিয়াছে। তখন এসব জায়গা অজ পাড়াগাঁ ছিল। এখন দুই-একটা বাড়ি উঠিতে শুরু করিয়াছে। এখানেও শহর গ্রামকে স্পর্শ করিল বলিয়া। কাজল মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিল– ভালোই তো, দেশের উন্নতি হইতেছে, ভালোই তো। কিন্তু মনের নিভৃতে গোপন কান্না বাজিতে থাকে। পরিচিত, প্রিয় সবকিছু হারাইবার কান্না।

তাহার হাত ছাড়াইয়া সপ্তর্ষি মাঠের মধ্যে দৌড়াইয়া বেড়াইতেছে। পড়ন্ত রৌদ্রে পৃথিবী মায়াময়। সে আর কিছু চায় না, শুধু এই পৃথিবীর মাটিতে মাটি হইয়া মিশিয়া থাকিতে চায়। গাছের গুড়িতে হেলান দিয়া দুরে তাকাইয়া দেখিতে চায় কীভাবে সন্ধ্যা নামে, আকাশে প্রথম তারাটি ফুটিয়া ওঠে, পাখির ডানায় দিনের আলো মুছিয়া যায়। মাটিতে কান পাতিয়া সে চলমান জগতের স্পন্দন শুনিতে চায়।

তারপর একদিন আসিবে, আসিবেই, যখন সে এই মাটিতে, আলো আর বাতাসে নিঃশেষে মিশিয়া যাইবে। আর সে ঘুম হইতে উঠিবে না, কুলের অম্বল দিয়া ভাত মাখিয়া খাইবে না, প্রিয় বইয়ের সন্ধানে পুরোনো বইয়ের দোকানে ঘুরিয়া বেড়াইবে না।

অনেক বই না-পড়া থাকিয়া যাইবে, অনেক লেখা বাকি থাকিবে।

www.bengaliebook.com

তবু সে তো চেষ্টা করিল। সে ফাঁকি দেয় নাই, নিজের বিশ্বাসের কথা, মানুষকে ভালোবাসিবার কথা, ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি কণার মধ্য দিয়া বহমান বিশ্বসংগীতের কথা লিখিয়াছে। মানুষ নেয় ভালো, নহিলে সে আর কী করিবে?

আলের পথ দিয়া একজন হাঁটিয়া আসিতেছিল। সাধারণ গ্রামের মানুষ। কাজলকে দেখিয়া সে বলিল–বাবু কী করছেন এখানে? জমি কিনবেন নাকি?

-না, এমনি একটু ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে এসেছি–

–ও, ওই যে খোকাটা, ওটা বুঝি আপনার?

-হ্যাঁ ভাই। আচ্ছা, আমি জমি কিনতে এসেছি মনে হল কেন তোমার? জমি বিক্রি হচ্ছে বুঝি খুব?

লোকটি সোসাহে বলিল–নয় তো কী! আর একবছরের মধ্যে এতটুকু জমি আর পড়ে থাকবে না বাবু। দেখেছেন তো কাঠালিয়া মোহনপুরের অবস্থা? সব বিক্কিরি হয়ে গেল বলে। রোজ দলে দলে লোক আসছে–

আঞ্চলিক উন্নতিতে তৃপ্ত মানুষটি আলপথ ধরিয়া চলিয়া গেল।

সারাটা বিকেল ছেলের সঙ্গে মাঠে মাঠে খেলিয়া বেড়াইল কাজল। দেখিল শেয়ালকাঁটার ফুলে হলুদ প্রজাপতি আসিয়া বসিতেছে। ঘাসের ডগা হইতে উড়িয়া যাইতেছে ফড়িং।

যখন আলো কমিয়া আসিল, সন্ধ্যা নামিবার উপক্রম হইল, কাজল ছেলেকে ডাকিয়া বলিলচলো বাবা, এইবার বাড়ি যাই–

www.bengaliebook.com

নক্ষত্রভরা আকাশের নিচে ছেলের হাত ধরিয়া বাসরাস্তার দিকে হাঁটিয়া ফিরিতে ফিরিতে কাজল বলিল-বাবাই, তোকে একটা কথা বলব। এখন হয়তো যা বলব তার মানে বুঝতে পারবি না, কিন্তু ভালো কবে শুনে রাখ। বড়ো হয়ে তোকে একটা কাজ করতে হবে-

সপ্তর্ষি বাবার গলার স্বরে অবাক হইয়া বলিল—কী বাবা?

কাজল হাঁটু গাড়িয়া ছেলের সামনে বসিল, ছেলের দুই কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল—তোর ঠাকুরদা বই লিখতেন জানিস তো?

–হুঁ-। দাদু লেখক ছিলেন।

-হ্যাঁ বাবা! দাদুর প্রথম বইটার দ্বিতীয় পর্ব আমি লিখেছি। দাদু যেখানে শেষ করেছিলেন সেখান থেকে আমি শুরু করেছিলাম। এটা আমাদের পরিবারের গল্প, মানুষের গল্প। এই বইখানার তিন নম্বর পর্ব তুই লিখবি। কেমন? আমি যেখানে শেষ করেছি সেখান থেকে ধরবি। মনে থাকবে?

—তুমি লিখবে না?

—না বাবাই, আমায় একজায়গায় যেতে হবে যে—

—কবে ফিরবে?

ছেলেকে বুকে জড়াইয়া ধবিয়া কাজল বলিল—ফিরব। তোর ছেলে হয়ে ফিবব।

সপ্তর্ষি সবটা বুঝিল না। কিন্তু বাবা ফিরিবে শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইল। বলিল—আমি লিখব বাবা। তোমার মতো, ঠাকুরদার মতো।

www.bengaliebook.com

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল–তোমার কলমটা আমাকে দিয়ে যেয়ো।

[অপুর সংসার সমগ্র সমাপ্ত]

www.bengaliebook.com